বোবা কাহিনী

জসীম উদ্দীন

সূচিপত্র

উৎসর্গ..........2
আজাহেরের কাহিনী..........3
সা-জী মশায়..........49
খাকি রঙের জামা..........83
আজাহেরের ছেলে বছির..........116
পাঠশালার কথা..........157
এক কোচ বেথুন..........203
গ্রীষ্মের ছুটি..........272
আরজান ফকিরের বাড়ি..........316

উৎসর্গ

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান পরিচালক অধ্যাপক নূরউদ্দীন আহম্মদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে। আমার আদরের ছোট ভাই নূরু! গত ১লা জুলাই তোমাকে কবরের ঘরে শোয়াইয়া আসিলাম। তুমি দেশের জনগণকে ভালবাসিতে। অধ্যাপক হইয়াও তুমি নিজ হাতে কৃষিকাজ করিয়া দেশের মজলুম জনগণের সঙ্গে একত্র হইতে প্রয়াস পাইয়াছ। তাই আমার এই বোবা কাহিনী তোমারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

তোমার মেঝোভাই
১০ নং কবি জসীমউদ্দীন রোড
পলাশ বাড়ি
কমলাপুর, ঢাকা-১৪
১-৮-৬৪

.

আজাহেরের কাহিনী

০১.

আজাহেরের কাহিনী কে শুনিবে?

কবে কোন্ চাষার ঘরে তার জন্ম হইয়াছিল, কেবা তার মাতা ছিল, কেবা তার পিতা ছিল, সে কথা আজাহের নিজেও জানে না। তার জীবনের অতীতের দিকে যতদূর সে চাহে, শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের এক কোণে আধো আলো আধো ছায়া এক নারী-মূর্তি তার নয়নে উদয় হয়। তার সঙ্গে আজাহেরের কি সম্পর্ক তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না কিন্তু সেই নারী-মূর্তিটি বড়ই করুণ, বড়ই মমতাময়ী। তার কথা ভাবিতে আজাহেরের বড়ই ভাল লাগে। তার মনে বলে সেই করুণ নারী-মূর্তিটি অবলম্বন করিয়া সে যেন অনেক স্নেহের,অনেক মমতার সম্পর্ক পাতাইতে পারে। কিন্তু দিন উপার্জন করিয়া যাহাকে পেটের অন্ন জোগাইতে হয়, এ সব ভাবিবার অবসর তার কোথায়? সংসারে নানা কাজের নিষ্পেষণে সেই নারী-মূর্তিটি কোন্ অনন্ত অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

গ্রামের ফকির সারিন্দা বাজাইয়া গান করে :

নাইকা মাতা, নাইকা পিতা, নাইকা সোদ্দের ভাই,
সেঁতের শেহলা হয়া ভাসিয়া বেড়াই।

তেমনই স্রোতের শেহলার মত সে ভাসিয়া আসিয়াছে। এক ঘাট হইতে আর এক ঘাটে, এক নদী হইতে আর এক নদীতে। যতদূর তার মনে পড়ে সে কেবলই জানে, এর বাড়ি হইতে ওর বাড়িতে সে আসিয়াছে; ওর বাড়ি হইতে আর একজনের বাড়িতে সে গিয়াছে। কেহ তাহাকে আদর করিয়াছে–কেহ তাহাকে অনাদর করিয়াছে, কিন্তু সবাই তাহাকে ঠকাইয়াছে। খেত-খামারের কাজ করাইয়া, গরু বাছুরের তদারক করাইয়া মনের ইচ্ছামত সবাই তাহাকে খাটাইয়া লইয়াছে। সে যখন বেতন চাহিয়াছে তখন গলাধাক্কা দিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া নানা লোকের কাছে ঠকিতে ঠকিতে এখন তার বয়স পঁচিশের কোঠায়। আর সে কাহারো কাছে ঠকিবে না। নিজের বেতন ভালমত চুকাইয়া না লইয়া সে কারো বাড়িতে কাজ করিবে না–কিছুতেই না। এই তার প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু নিজের বেতন চুকাইয়া লইয়া সে কি করিবে? তার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, ছোট একটি বোনও নাই। বেতনের টাকা লইয়া সে কার হাতে দিবে?

সবারই বাড়ি আছে–ঘর আছে। ঘরে বউ আছে। আচ্ছা এমন হইতে পারে না? মাঠটির মাঝখান দিয়া পথটি চলিয়া গিয়াছে–সেই পথের শেষে, ওই যে গ্রামখানা, তারই এক কোণে ছোট্ট একখানা ঘর,নল-খাগড়ার বেড়া। চার ধারের মাঠে সরিষার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে–সেই ছোট্ট ঘরখানিতে ঘোমটা পরা একটি বউ। ভাবিতে আজাহেরের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হইয়া যায়। ঘোমটা পরা একটি বউ, না-ফর্সা, না-কালো, না-সুন্দর, না-কুৎসিত। এ সকল সে চিন্তাও করে না। একটি বউ–সমস্ত সংসারে যে শুধু তাকেই আপন বলিয়া জানে। বিপদে আপদে যে শুধু তাকেই আশ্রয়দাতা বলিয়া মনে করে;

এমনই একটি বউ যদি তার হয়! ভাবিতে ভাবিতে তার দেহ-মন উৎসাহে ভরিয়া উঠে। যেমন করিয়াই হোক সে তিনকুড়ি টাকা জোগাড় করিবেই। টাকা জোগাড় হইলেই সে মিনাজদী মাতব্বরের বাড়ি যাইবে। মাতব্বর টাকা দেখিলেই তার একটি বিবাহের। বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তিনকুড়ি টাকার আড়াই কুড়ি টাকা সে ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে, আর দশ টাকা হইলেই তিনকুড়ি টাকা হয়।

গ্রামের চাষীদের যখন কাজের বাড়াবাড়ি তখন তাহারা বেতন দিয়া পৈড়াত বা জন খাটায়। আজাহের এইরূপ পৈড়াত বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। সারাদিন গৃহস্থ বাড়ি কাজ করে, তাহাতে চার আনা করিয়া সে পায়। এমনই করিয়া যদি তাহার উপার্জন চলে তাহা হইলে আর চল্লিশ দিন পরে তাহার হাতে দশ টাকা হইবে। আড়াইকুড়ি আর দশ,–তিনকুড়ি। কিন্তু আরও চল্লিশ দিন পরে–আরও একমাস দশদিন পরে–সে কত দূর? দুই হাতে টানিয়া টানিয়া সে যদি দিনগুলিকে আরও আগাইয়া আনিতে পারিত?

সারারাত জাগিয়া জাগিয়া আজাহের পাটের দড়ি পাকায়। বাঁশের কঞ্চি দিয়া ঝুড়ি তৈয়ার করে। এ সব বিক্রি করিয়া সে যদি আরও চার পাঁচ টাকা বেশী জমাইতে পারে; তবে মাতব্বরের নির্দিষ্ট তিনকুড়ি টাকা জমাইতে তাহার আরো কয়েকদিন কম সময় লাগিবে।

আজাহের দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে। কাজকর্মের মধ্যে যখন একটু ফুরসৎ পায়– সামনের তাঁতীপাড়ার রহিমদ্দী কারিকরের বাড়িতে যাইয়া সে বসে। লাল, হলুদ, নীল, কত রঙের শাড়ীই না কারিকরেরা বুনাইয়া চলিয়াছে। কোথাও গাছের গোড়ার সঙ্গে নানা রঙের তেনা বাধিয়া মাজন দিতেছে। ফজরের রঙীন মেঘ আনিয়া এখানে কে যেন মেলিয়া ধরিয়াছে। বেহেস্ত হইতে লাল মোরগেরা যেন এখানে আসিয়া পাখা মেলিয়া

দাঁড়াইয়া আছে। চাষার ছেলে আজাহের–সে অত শত ভাবিতে পারে না। শাড়ীগুলির দিকে সে চাহিয়া থাকে–আর মনে মনে ভাবে এর কোন্ শাড়ীখানা তার বউকে মানাইবে ভাল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে তার মনটি শাড়ীরই মত রাঙা হইয়া ওঠে।

রহিমদ্দী কারিকর তার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আরে কি মনে কইরা, আজাহের? বইস, বইস। তামুক খাও।"

ঘরের বেড়ার সঙ্গে লটকান কোটি লইয়া কলিকার উপরে ফুঁ দিয়া প্রথমে আজাহের কলিকার ছাইগুলি উড়াইয়া দেয়। তারপর কলিকার গুলটুকু ভাল জায়গায় ঢালিয়া রাখিয়া কলিকার মধ্যে খানিকটা তামাক ভরিয়া অতি সন্তর্পণে সেই গুলটুকু নিপুণ হস্তে তাহার উপর সাজাইয়া দেয়, যেন এতটুকুও নষ্ট না হইতে পারে। তাহার উপরে সুন্দর করিয়া আগুন ধরাইয়া রহিমদ্দী কারিকরের দিকে কোটি বাড়াইয়া ধরে।

কারিকর বলে–"আরে না, না, তুমি আগে টাইনা ধূমা বাইর কর।"

কারিকর যে তাকে এতটা খাতির করিয়াছে, আগে তাকে তামাক টানিতে বলিয়াছে এ যে কত বড় সম্মান! আজাহেরের সমস্ত অন্তর গলিয়া যায়। সে রহিমদ্দীর দিকে কোটি আরও বাড়াইয়া বলে, "কারিকরের পো, তা কি অয়? মুরব্বি মানুষ। তুমি আগে টাইনা দাও।"

খুশী হইয়া কারিকর হুঁকোটি হাতে লইয়া টানিতে আরম্ভ করে, তার তত চলা বন্ধ হয়। তামাক টানিতে টানিতে রহিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে, "তা কি মনে কইরা আজাহের?"

যে কথা মনে করিয়া সে আসিয়াছিল লজ্জায় সে কথা আজাহের কিছুতেই বলিতে পারে না। অন্য কথা পাড়ে, "তা চাচা, একটা গীদ-টীদ গাও না শুনি? অনেক দিন গীদ শুনি না, তাই তুমার কাছে আইলাম।"

রহিমদ্দী খুশী হয়। তার গান শোনার জন্য ওই ও-পাড়া হইতে একজন এ-পাড়ায় আসিয়াছে, একি কম সম্মানের কথা! থাক না হয় আজ তাঁতের কাজ বন্ধ। রহিমদ্দী গান আরম্ভ করে। আমির সাধুর সারিন্দার গান। নদীর ঘাটে স্নানে যাইতে আমির সাধুর বউ বেলোয়া-সুন্দরীকে মগ জলদস্যুরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পাগলের বেশে আমির সাধু তার সন্ধান করিয়া দেশে দেশে ফিরিতেছে। আমির সাধু সারিন্দা বানাইল–ছাইতানের কাঠ, নীলা ঘোড়ার বাগ। অপূর্ব সারিন্দা। নীলা ঘোড়ার বাগ বাকাইয়া সে সুর ধরিল?

"প্রথমে বাজিলরে সারিন্দা আমির সাধুর নামরে;
হারে তারিয়া নারে।"

আমির সাধু সেই সারিন্দা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আবার সে নতুন করিয়া সারিন্দা গড়িয়া তাহাতে সুর দিল ।

"তারপর বাজিলরে সারিন্দা–দেশের রাজার নামরে;
হারে তারিয়া নারে।"

তবু সেই সারিন্দা ও আমির সাধু ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এবার আরো সুন্দর করিয়া অতি নিপুণ হস্তে ধনষ্টরী পাখির হাড় তাহাতে বসাইয়া, নীলা ঘোড়ার বাগ আরো বাঁকাইয়া সেই সারিন্দায় আবার সুর ধরিল। হেলিয়া দুলিয়া সারিন্দা বাজিয়া উঠিল,

“তারপর বাজিলরে সারিন্দা বেলোয়া সুন্দরীরে!
হারে তারিয়া নারে।”

এবার আমির সাধু খুশী হইল। সেই সারিন্দা বাজাইয়া আমির সাধু নদীর কিনারা দিয়া চলে। এ-দেশে সে-দেশে নানান দেশে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। তার হাতের সারিন্দা গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে,–

“আজ কোথায় রইল আমার বেলোয়া সুন্দরীরে–”

গানের পর গান চলিতে থাকে। দুপুরের বেলা গড়াইয়া পড়ে। স্নানের বেলা যায়। তবু তাদের নেশা থামে না। আজাহের মনে মনে ভাবে সে নিজেই যেন আমির সাধু, তার সেই অনাগত বউ-এর খোঁজে সে যেন এমনি করিয়া সারিন্দা বাজাইয়া বাজাইয়া ফিরিতেছে।

রহিমদ্দীর বউ ঘরের আড়াল হইতে কয়, “বলি আমাগো বাড়ির উনি কি আইজ দিন ভইরা গীদই গাবি নাকি? ওদিক যে বাত জুড়ায়া গ্যালো!”

রহিমদ্দী তাড়াতাড়ি স্নান করিতে রওয়ানা হয়। স্নানের ঘাট পর্যন্ত আজাহের তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। কিছুতেই কথাটা সে ভালমত করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারে না। কোথাকার লজ্জা আসিয়া সমস্ত মুখখানা চাপিয়া ধরে। রহিমদ্দী পিছন ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করে, “কিরে আজাহের, আর কুনু কতা আছে নাকি?”

আজাহের বলে,–"তুমি যে ওই লালে আর নীলে মিশায়া একখানা শাড়ী বুনাইছাও না? পাইড়ে দিছাও সোনালী সূতা, ওখানার দাম কতো?"

"তা তুই কাপড় দ্যা করবি কি? বিয়া ত করিস নাই?"

লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়াই আজাহের বলে, "বিয়া ত একদিন করবই।"

রহিমদ্দী হাসিয়া উত্তর করে, "তা যহন তোর বিয়া অবি, কাপড় নিয়া যাইস। তোর কাপড়ের দামে আট আনা কম নিব।" কৃতজ্ঞতায় আজাহেরের সমস্ত অন্তর ভরিয়া ওঠে।

রহিমদ্দী স্নান করিতে নদীতে নামে। তাঁতীপাড়া এখন নিস্তব্ধ। তাঁতীরা কেহ স্নান করিতে গিয়াছে, কেহ স্নান করিয়া কাঠের চিরুণী দিয়া মাথা আঁচড়াইতেছে। কেহ খাইতে বসিয়াছে। বাড়ির বাহিরে রঙ বেরঙের কাপড় মাড় লাগাইয়া গাছের ডালে বাধিয়া রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হইয়াছে।

আজাহের কাপড়গুলির পানে চায়, আর মনে মনে চিন্তা করে, কোন্ কাপড়খানা তার বউকে মানাইবে ভাল। তার বউ যদি ফর্সা হয়, একেবারে সরষে ফুলের মতো ফর্সা, তবে ওই নীলের উপর হলুদের ডোরাকাটা শাড়ীখানা সে তার জন্য কিনিয়া লইবে। কিন্তু বউ যদি তার কালো হয়, তা হোক, ওই যে কালোর ওপর লাল আর আছা হলুদের। ফুল-কাটা পাড়ের শাড়ীখানা, ওইখানা নিশ্চয় তার বউকে মানাবে ভাল। আচ্ছা, বরান খার মেয়ে আসমানীর মত পাতলা ছিপছিপে যদি তার গায়ের গড়ন হয়, তবে ওই যে পাড়ের উপর কলমীফুল আঁকা শাড়ীখানা, ওইখানা তার বউ-এর জন্য কিনিলে হয় না? কিন্তু তার বউ যদি দেখিতে খারাপ হয়? তা যেমন কেন হোক না, তাঁতীপাড়ার সব

চাইতে সুন্দর শাড়ীখানা সে তার বউ এর জন্য কিনিয়া লইবে। একটা বউ তার হইলেই হয়। রাঙা শাড়ীর ঘোমটার আড়ালে সে তার মুখখানা ঢাকিয়া বাড়ির উঠানে ঘুরিবে ফিরিবে। কি মজাই না হইবে! শিস দিয়া গান গাহিতে গাহিতে আজাহের তাঁতীপাড়া ছাড়িয়া চাষীপাড়ার দিকে যায়।

.

০২.

সত্য সত্যই আজাহেরের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বউঘাটা ছাড়িয়া গাছবাইড়ার চক। তাহারই দক্ষিণে ভাটপাড়া গ্রামে আলিমদ্দীর মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। গ্রামের মোড়ল তিনকুড়ি টাকাতেই বিবাহের খরচ সারিয়া দিবে। কিন্তু তিনকুড়ি টাকাতেই বিবাহের সমস্ত খরচ কুলাইয়া উঠিল না। আলিপুর গ্রামের শরৎ সাহার বাড়ি হইতে আজাহেরকে আরো পনর টাকা কর্জ করিতে হইল। টাকা প্রতি মাসে মাত্র এক আনা করিয়া সুদ দিতে হইবে। তা হোক; শরীর যদি ভালো থাকে আজাহের পৈড়াত বেচিয়া দুই মাসের মধ্যেই। দেনাটা শোধ করিয়া দিবে।

গরীবের বিবাহ–তবু গরীবানা মতে তাহারই মধ্যে যতটা আনন্দ করা যায় কেউ সে। বিষয়ে কম করিল না। মেনাজদ্দী মাতব্বরের উৎসাহই এ বিষয়ে সকলের চাইতে বেশী। সে ফরিদপুরের খলিফাপট্টী হইতে তাহার জন্য লাল ফোঁটা দেওয়া একটি পিরান (জামা)। কিনিয়া আনিল। নিজের যে চাদরখানা একদিন তেলে ও ঘামে সিক্ত হইয়া নানা দরবারের সাক্ষ্য হইয়া তাহার কাঁধের উপর ঘুরিয়া বিরাজ করিত, তাহা সে আজ বেশ

সুন্দর করিয়া পাকাইয়া পাগড়ীর মত করিয়া আজাহেরের মাথায় পরাইয়া দিল। একজোড়া বার্নিশ জুতাও। মোড়ল আজাহেরের জন্য সংগ্রহ করিল। এ সব পরিয়া নতুন “নওশা” সাজিয়া আজাহের বিবাহ করিতে রওয়ানা হইল। তখন তাহার ইচ্ছা হইল এই নতুন পোশাকে সে একবার। সমস্ত গ্রামখানি ঘুরিয়া আসে। গাঁয়ের লোকদের সে অবাক করিয়া দিয়া আসে। সবার। বাড়িতে যে এতদিন পৈড়াত বেচিয়া আসিয়াছে, সে অতটা তুচ্ছ নয়। কিন্তু তখন রাত অনেকটা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে। বউঘাটা ছাড়াইয়া গাছবাইড়ার মাঠ পারাইয়া। যাইতে হইবে, সে ত সোজা কথা নয়।

অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া পাঁচ ছয়জন গাঁয়ের লোক বর লইয়া রওয়ানা হইল। যেমন ভাবে গাঁয়ের আরো দশজন বিবাহে রওয়ানা হয় আজাহেরের বিবাহে তেমন জাঁকজমক কিছুই ছিল না। গাঁয়ের বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলেরা নতুন নওশার সাজ পরিয়া পাল্কিতে অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া কনের বাড়িতে যায়। মশালচি আগে আগে মশাল জ্বালাইয়া পথ রোশনাই করে। গ্রামের মালাকর বরের জন্য শোলা দিয়া সুন্দর কারুকার্য খচিত একটি ছাতা তৈয়ার করিয়া দেয়। সেই ছাতা বরের মাথায় মেলিলে সুন্দর সুন্দর শোলার পাখি, নৌকা, ভ্রমর, প্রজাপতিগুলি বাতাসে দুলিতে থাকে। আজাহেরের বিবাহে এত সব : বন্দোবস্ত কিছুই হয় নাই। তবু আজাহেরের মন আজ খুশীতে যেন আসমানে উড়িয়া। বেড়াইতে চাহে। নিজের মনের খুশী দিয়াই সে তার বিবাহের সকল দৈন্য ভরাইয়া লইবে।

নওশার দল রওয়ানা হইল। নিস্তব্ধ গ্রাম্য-পথ। দু’ধারে ঝি ঝি পোকা ডাকিতেছে। গ্রামের কুকুরগুলি ঘেউঘেউ করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইতেছে। দূরের বন হইতে

শিয়ালগুলি ডাকিয়া উঠিতেছে। নওশার দল ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া যায়।

বউঘাটা পার হইয়া তাহারা গাছবাইড়ার মাঠে আসিয়া পড়িল। সদ্য কেনা বার্নিশ জুতাজোড়া পায়ে লাগাইয়া চলিতে আজাহেরের পা ছুলিয়া যাইতেছিল। তবু সে জুতাজোড়া খুলিল না। এমনি নওশার সাজে, এমনই জুতা-জামা পরিয়া সে তাহার কনের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইবে। তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া খুশীর ঝঝর যেন আজ বাজিয়া ঝুম ঝুম করিয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

যাইতে যাইতে তাহারা কনের বাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বরযাত্রীর দল সকলে একস্থানে দাঁড়াইল। সবাই ভালমত করিয়া কাপড়-চোপড় পরিতে লাগিল। দশ বার বৎসর আগে মোড়ল সেই কবে এক জোড়া জুতা কিনিয়া রাখিয়াছিল–সে কথা আজ। ভাল করিয়া মনেও পড়ে না,–কিন্তু জুতাজোড়ার রঙ সেই প্রথম কেনার দিনের মত। আজো চকচক করিতেছে। এতদিনে রৌদ্রে জুতাজোড়া খড়ির মত শুখাইয়া কোচকাইয়া গিয়াছে। এমনই কোন বিশেষ দিনে কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাইতে মোড়ল অল্প কয়েক মিনিটের জন্য সেই জুতাজোড়া পরিধান করিয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মীয় বাড়ির। কাছে যাইয়া জুতাজোড়া পায়ে দেয় এবং সে বাড়িতে পৌঁছা মাত্রই জুতাজোড়া পা হইতে খুলিয়া ঘরের চালের সঙ্গে লটকাইয়া রাখে। ফেরার পথে জুতাজোড়া হাতে করিয়াই ফেরে। আজো মোড়ল জুতাজোড়া হাতে করিয়াই আনিয়াছিল। এখন বিবাহ-বাড়ির নিকটে আসিয়া জুতাজোড়া কাঁধের গামছা দিয়া মুছিয়া তাহার মধ্যে অবাধ্য পা দুটি ঢুকাইয়া দিল। এই কার্যটি করিতে বলিষ্ঠ-দেহ মোড়লকেও সেই জুতাজোড়ার সঙ্গে প্রায় পনর মিনিট যুদ্ধ করিতে হইল।

আজাহের তার রঙীন গামছাখানি অর্ধেকটা বুকপকেটে পুরিয়া দিল, বাকি অর্ধেক কাঁধের উপর ঝুলিতে লাগিল।

লোকে বলে,–”যেইনা বিয়া তার আবার চিতারি বাজনা।” কনের বাড়ির সামনের পথে গ্রামের ছেলেরা কলাগাছ পুঁতিয়া গেট বানাইয়াছে। সেই গেটের সামনে দারোয়ান হইয়া কলাপাতার টোপর মাথায় দিয়া কাঁধে গোড়ালী-লাঠি লইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের দেখিয়া আজাহেরের গা কাঁপিতে লাগিল। মোড়ল কিন্তু কোনই ভয় করিল না। সে দলের আগে যাইয়া দাঁড়াইল। বরযাত্রীর দল আস্তে আস্তে বলাবলি করিল–”তোরা। কেউ কথা কবি না। যা কয় আমাগো মোড়ল কবি।”

মোড়ল এমনই করিয়া সকলের আগে যাইয়া দাঁড়াইল; দেখিয়া আজাহেরের মন মোড়লের প্রতি শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে একেবারে ভরিয়া গেল। আজীবন তার বাড়িতে বিনা। বেতনে খাঁটিলেও বুঝি ইহার শোধ হইবে না।

মোড়ল সকলের আগে যাইয়া বলিল, “বুলি, তুমরা দারোয়ানী দরছাও ক্যান?”

ছেলেরা সমস্বরে উত্তর করিল, “বিবির হুকুম আছে, কেউরে দরজার মদ্দি যাইতে দিব । তবে যদি বাদশা আমাগো কিছু বকশিশ দ্যান তয় আমরা যাইতে দিতি পারি!”

মোড়ল বলিল, “কত বকশিশ চাও?”

তারা উত্তর করিল, “দশ টাহা।”

মোড়ল উত্তর করিল, “আরে বাপুরা ছাইড়া দাও। গরীব মানুষির বিয়া, কিছু কমটম কর।”

“আচ্ছা তয় পাঁচ টাহা।”

“আরে না, অত দিবার পারবনা।”

“তবে এক টাকা দেন।”

“আরো কম কর।”

“তবে আট আনা।”

“আরে গরীব মানষির বিয়া, আরো কিছু কমাও। মোটে চাইর আনা দিমু।”

ছেলের দল তাহাতেই খুশী হইয়া দরজা ছাড়িয়া দিল। আজাহেরের কিন্তু ভাল লাগিল না। কথায় বলে,–বিবাহের দিনে সকলেই আড়াই দিনের বাদশাই করে। আজ তার বাদশাইর দিন। না হয় মোড়ল আরো চার আনা ধরিয়া দিত। জন খাঁটিয়া ত খাইতে হয়ই। না হয় আজাহের আরো একদিন বেশী খাঁটিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিত। ছেলেদের কাছে। এতটা গরীব সাজা মোড়লের উচিত হয় নাই।

আজাহেরের শ্বশুরের নাম আলিমদ্দী। সে বড়ই গরীব। বাড়িতে কাছারী ঘর নাই। গোয়াল ঘরখানা পরিষ্কার করিয়া গোটা কতক খেজুর পাতার পাটি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেই বরযাত্রীর দলটিকে অতি আদরের সহিত আনিয়া বসান হইল।

আজাহেরের বড়ই ভাল লাগিল। আজ বিবাহ বাড়ির সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে। বরযাত্রীর দলের সবার চাইতে সে বেশী আদর পাইতেছে। খাইবার সময় তারই পাতে সব চাইতে ভাল ভাল জিনিসগুলি পড়িতেছে। গাঁয়ের মাত্র পাঁচজন লোক সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সবাই যদি আসিত, আজ দেখিয়া যাইত, আজাহের একেবারে কেউকেটা নয়। তাকেও লোকে খাতির করে।

বরযাত্রীদের খাওয়া দাওয়া সারা হইল। এবার বিবাহ পড়ানোর পালা। ভাটপাড়া গ্রামের বচন মোল্লাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে বিবাহ পড়াইতে। সাক্ষী উকিল ঠিক করিয়া বাড়ির ভিতর পাঠান হইল। উকিল যাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে কনের কাছে, "অমুক গ্রামের অমুকের ছেলে অমুক, তার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে। দুইশত টাকা দেনমোহর, পঁচিশ টাকা আদায়–একশত পঁচাত্তর টাকা বাকি; এই শর্তে কবুল ত?" তিনবার এইভাবে কনেকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। উহার উত্তরে কনে কি বলে তাহা জানিয়া দুইজন সাক্ষী বিবাহ সভায় সকলকে তাহা জানাইয়া দিবে। কিন্তু সাক্ষী উকিলেরা মজা করিবার জন্য বাড়ির মধ্যে কনের কাছে না যাইয়া বাহির হইতে একটু ঘুরিয়া বিবাহ সভায় আসিয়া বলিল, "কনে এই বিবাহে রাজি অয় নাই।"

বচন মোল্লা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রাজি অয় নাই।"

"কনের একটি কতা জিগাইবার আছে।"

"কি কতা জিগাইবার আছে?"

“বচ্ছরকে দুইটা পাখি আসে। তার একটা সাদা আর একটা কালা। আপনারা কালাডা খাইবেন না ধলাডা খাইবেন। কোনভা আপনাগো জন্যি আনবো?”

শুনিয়া আজাহেরের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে গরীব মানুষ, কারো বিবাহে কোন দিন যায়। নাই–গেলে সহজেই বুঝিতে পারিত এমনই প্রশ্নের বাদ-প্রতিবাদ প্রত্যেক বিবাহেই হইয়া থাকে। আজাহের ভাবিল এইবারই বুঝি তার বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। এই প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারিবে না, বিবাহও হইবে না। মোড়ল কিন্তু একটুও দমিল না। সে সামনে আগাইয়া আসিয়া একটু হাসিয়া উত্তর করিল, “মিঞারা, বুঝতি পারলাম ঠকাইবার চাও। বচ্ছরকে দুইডা পাখি আসে রোজার মাসে, কালা পাখি ঐল রাইত আর ধলা পাখি ঐল দিন। তা আমি কালা পাখিই খাইলাম। রোজার মাসে ত কালা রাত্তিরেই ভাত খাইতে হয়।”

“পারছেরে, পারছে” বলিয়া কনে পক্ষের লোকেরা হাসিয়া উঠিল। এইবার মোড়ল গায়ের চাদরখানা মাজার সঙ্গে জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা মিঞারা! আপনাগো কতার জবাব আপনারা পাইলেন। এইবার আমি একটা কতা জিজ্ঞাস কইরা দেহি :

“মাইটা হাতুন কাঠের গাই–
বছর বছর দুয়ায়া খাই।”

কওত মিঞারা ইয়ার মানে কি?”

কনে পক্ষের সাক্ষী উকিলদের মাথা ঘুরিয়া গেল। বর পক্ষের মাতব্বর যে এমন পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে ইহা তাহারা ভাবিতেই পারে নাই।

তাহাদিগকে মুখ কাচুমাচু করিতে দেখিয়া বর পক্ষের লোকদের মুখে ঈষৎ বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কনে পক্ষের মোড়ল বরান খ তখন উঠিয়া দাঁড়াইল চীৎকার করিয়া উঠিল –”আরে খার বিটা! পুলাপানের কাছে ওসব কথা জিজ্ঞাসা করেন ক্যান? আমার কাছে আসেন।

মাইটা হাতুন কাঠের গাই,
বছর বছর দুয়ায়া খাই।

মানে খেজুর গাছ। এক বছর পরে খাজুইর গাছ কাটা হয়। মাটির হাঁড়ী গাছের আগায় বাইন্দা রস ধরা হয়, কি মাতব্বর সাব! ওইল? সেই জন্য কইছে বছর বছর দুয়ায়া খাই। আচ্ছা এইবার আমি একটা কতা জিজ্ঞাসা করি,–

নয় মন গোদা, নয় মন গুদি,
নয় মন তার ছাওয়াল দুটি।

নদী পার অইব। কিন্তুক নৌকায় নয় মনের বেশী মাল ধরে না। কেমন কইরা পার অবি? কন ত দেহি সোনার চানরা।”

মোড়ল এবার লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,–”তবে শোনেন, পেরতমে দুই ছাওয়াল পার হ’য়া ওপারে যাবি। এক ছাওয়াল ওপারে থাকপি, আর এক ছাওয়াল নাও বায়া এপারে আসপি। তারপর গোদা নৌকা বায়া ওপারে যাবি। গোদার যে ছাওয়াল ওপারে রইছে সে

নৌকা বায়া এপারে আসপি। আইসা দুই ভাই আবার ওপারে যাবি। ওপারত্যা এক ভাই নৌকা লয়া এপারে আসপি। এবার গোদার বউ নৌকা লয়া যাবি। ছাওয়ালডা এপারেই থাকপি। ওপার যে ছাওয়ালডা রইছে সে নৌকা নিয়া আইসা এপার ত্যা তার বাইরে লয়া যাবি। ওইল ত? আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি আবার।"

এবার কনের বাপ আসিয়া বলিল, "রাহেন মাতব্বরসাবরা, আপনারা কেউ কারো চাইতে কম না। এ তো আমরা সগলেই জানি। এবার বিয়ার জোগাড় কইরা দেন। হগল মানুষ বইসা আছে।" এ কথায় দুই মাতব্বরই খুশী হইল।

তখন সাক্ষী, উকিল, বাড়ীর ভিতরে যেখানে নতুন শাড়ী পরিয়া পুটলীর মত জড়সড় হইয়া দুই একজন সমবয়য়ী পরিবৃতা হইয়া বিবাহের কনে বসিয়া ছিল, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। উকিল জোরে জোরে বলিতে লাগিল,

"আলীপুর গ্রামের বছিরদ্দী মিঞার ছেলে আজাহের মিঞার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে। দুইশত টাকা দেনমোহর, পঁচিশ টাকা আদায়, একশত পঁচাত্তর টাকা বাকী। এই শর্তে কবুল ত?"

কনে লজ্জায় আর কোন কথাই বলিতে পারে না। একজন বর্ষিয়সী মহিলা কনের মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ, কনে কবুল আছে।" এইভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লওয়া শেষ হইলে সাক্ষী উকিলেরা বিবাহ সভায় যাইয়া বলিল, "বিয়ায় বিবি রাজি আছেন।"

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

তখন বচন মোল্লা বিবাহ পড়াইতে বসিলেন। প্রথমে কোরান শরিফ হইতে খানিকটা পড়িয়া মোল্লা সাহেব পূর্বের মত বলিতে লাগিলেন, “ভাটপাড়া গাঁয়ের আলিমদী মিঞার কন্যা আয়েসা বিবির সঙ্গে আপনার বিবাহ হইবে। দুইশত টাকা দেনমোহর, পঁচিশ টাকা আদায়, একশত পঁচাত্তর টাকা বাকী। এই শর্তে কবুল ত?” আজাহের লজ্জায় যেন মাটিতে লুটাইয়া পড়ে তবু বলে, “কবুল”।

এইভাবে তিনবার মোল্লা তাহাকে উপরোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনবার সে বলিল, “কবুল”। মোল্লা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিবি যখন তখন বাপের বাড়ীতে আসতি পারবি, তারে কুনু কারণে মাইর ধইর করতি পারবা না। তারে তুমি সাধ্যমত রোজা নামাজ শিখাইবা। তার ইজ্জত-হুঁরমত রক্ষা করবা। তোমার সঙ্গে বিবির যদি কোন কারণে বনিবনাও না অয়, হে আইসা বাপের বাড়ি থাকপি। তুমি তার খোরপোষ দিবা। এই শর্তে কবুল ত?”

আজাহের বলিল, “কবুল”।

মোল্লা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যদি বিদেশে সফরে যাও তবে রীতিমত বিবিকে খোরপোষ পাঠাইবা, সপ্তাহে একবার পত্র দিবা। যদি ছয়মাস একসঙ্গে বিবির তালাস না লও তবে ইচ্ছা করলি বিবি তোমার কাছ ঐতে তালাকনামা লইতি পারবি। এই সত্য কবুল?”

আজাহের বলিল, “কবুল”।

তখন মোল্লা কোরান শরিফ হইতে আর একটি আয়েত পড়িয়া মোনাজাত করিলেন। বিবাহের পান-শরবত আগেই আনা হইয়াছিল। বিবাহ পড়াইয়া মোল্লা আজহেরকে পান-শরবত খাওয়াইয়া দিলেন। এইভাবে রাত্রি ভোর হইয়া গেল। কাছারী ঘরে গাঁয়ের লোকেরা সারাদিন গুলজার করিয়া কেতাব পড়িতে লাগিল, কেহ গল্প-গুজব করিতে লাগিল।

বিকাল বেলা আজাহেরকে বাড়ির ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। নতুন দুলার (বরের) সঙ্গে কনের ক্ষীর-ভোজনী হইল। প্রথমে উঠানে কনেকে আনিয়া একখানা পিড়ির উপর। দাঁড় করান হইল। এয়োদের নির্দেশ অনুসারে আজাহের কনের সামনে আর একখানা পিড়ির উপর দাঁড়াইল। কনে আর বরের মাঝখানে একখানা চাদর টানান, সেই চাঁদরের দুই কানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে দুইটি কিশোরী মেয়ে। চাঁদরের সামনে দাঁড়াইয়া আজাহেরের বুক কপিতে লাগিল। কি জানি কেমন যেন তাহার লাগিতেছিল। এই কাপড়ের আড়ালে তাহার কনে রহিয়াছে! এই বউ তাহার সুন্দর হইবে কি কুৎসিত হইবে সে ভাবনা আজাহেরের মোটেই ছিল না। কিন্তু কেন জানি তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগিল। বাড়ির মেয়েরা কৌতূহলী দৃষ্টি লইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল।

আজাহেরের সঙ্গে মোড়লও বাড়ির ভিতরে গিয়াছিল। সাধারণতঃ এরূপ স্থানে বরের বোনের জামাই অথবা ইয়ার্কি ঠাট্টার সম্পর্ক জড়িত আত্মীয়েরাই বাড়ির ভিতরে যাইয়া থাকে। কিন্তু আজাহেরের কোন আত্মীয়-স্বজন নাই বলিয়াই মোড়ল তাহার সহিত বাড়ির মধ্যে আসিয়াছে। গ্রাম্য মুসলমান মেয়েরা পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলিতে পরদা প্রথার শাসন মানিয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে তাহারা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার অতটা

অনুশাসন মানিয়া চলে না। তাহারা সকলেই কলরবে বলিয়া উঠিল, “টাহা না অইলে কনের মুখ দেহাব না।”

মোড়ল তখন তার কোঁচার খুঁট হইতে অতি সন্তর্পণে বাধা আট আনা পয়সা বাহির করিয়া মেয়েদের কাছে দিল। মেয়েরা তাহাতে রাজী হইবে না,–কিছুতেই না। মোড়লও বেশী দিতে চাহে না, আজাহেরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইতেছিল। এমন শুভদৃষ্টির সময়ে মোড়ল কেন দরাদরি করে। এতগুলো মেয়ে তাহাকে কি মনে করিতেছে।

অবশেষে বার আনায় রফা হইল। বার আনা পয়সা পাইয়া মেয়েরা শা-নজর করাইতে রাজী হইল। মোড়ল আগেই আজাহেরকে শিখাইয়া দিয়াছিল, এই সব জায়গায় সহজে চোখ মেলিয়া চাহিবি না–লজ্জা লজ্জা ভাব দেখাইবি। কিন্তু কনের সামনের পরদা তুলিয়া দিতেই আজাহের মোড়লের সকল উপদেশ ভুলিয়া গেল। সে চোখ দুইটি সম্পূর্ণ মেলিয়া কনের দিকে একদৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া রহিল। তারপর মনের খুশীতে একবার হাসিয়া উঠিল। আজাহেরের হাসি দেখিয়া সমবেত মেয়ের দল একবারে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আজাহের ভাবিয়া পাইল না কেন তাহারা এত হাসে।

এবার ঘরের মধ্যে যাইয়া কনের সঙ্গে ক্ষীর-ভোজনী হইবে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে আজাহের তাহার কনে-বউকে কোল-পাথালী করিয়া কোলে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল। বউকে মাটিতে নামাইয়া দেওয়ার পরে বহুক্ষণ তাহার কোমল গায়ের উষ্ণতা আজাহেরের সমস্ত দেহে ঢেউ খেলিতে লাগিল।

www.bengaliebook.com

তাহার হাতের কানি আঙ্গুলে ক্ষীর জড়াইয়া এয়োরা বউয়ের মুখের কাছে ধরিল। বউ-এর কানি আঙ্গুলে ক্ষীর জড়াইয়া আবার আজাহেরের মুখের কাছে ধরিল। আশেপাশের মেয়েরা মিহি সুরে বিবাহের গান গাহিতে লাগিল :

ওদিকে সইরা বইস হারে দামান
আমার বেলোয়া বসপি তোমার বামেনারে।
কেমনে বসপি আমার বেলোয়া হারে দামান
তাহার সিন্তা রইছে খালি নারে।
দুলার মামু দৌড়াইয়া তখন বাইনা বাড়ি যায় নারে।
কেমনে বসপি আমার বেলোয়া হারে দামান
ও তার গায়েতে জেওর নাইরে।
দুলার চাচা দৌড়ায়া তখন
সোনারূ বাড়ি যায় নারে।

আজাহেরের মনের খুশীর নদীতে যেন সেই সুর তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

.

০৩.

নতুন বউ লইয়া আজাহের বাড়ি ফিরিল। বাড়ি বলিতে তাহার কিছু ছিল না। মোড়ল তাহার বাড়ির ধারেই একটি জায়গা আজাহেরকে ঘর তুলিতে অনুমতি দিয়াছিল। সেইখানে দো-চালা একখানা কুঁড়েঘর তৈরী করিয়া কোনমতে সে একটা থাকার জায়গা

করিয়া লইয়াছিল। তারই পাশে ছোট্ট একখানা রান্নাঘর। বউ আনিয়া আজাহের সেই বাড়িতে উঠিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বউ দেখিতে আসিয়া তার ছোট বাড়িখানা কলরবে মুখর করিয়া তুলিল। সেই কলরবে তরঙ্গে তরঙ্গে আজাহেরের অন্তরের খুশীর তুফান যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গ্রামের লোকজন সকলেই চলিয়া গেল।

আজাহের উঠানে বসিয়া নীরবে হুঁকা টানিতেছিল আর সেই কার ধুয়ার উপরে মনে মনে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের সুখকর ছবি অঙ্কিত করিতেছিল। সমস্ত বাড়িখানা নীরব। কিন্তু সকল নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন তাহার চারিদিক বেড়িয়া খুশীর ঝাঁঝর বাজাইতেছিল। ঘরের এক কোণে একটা পুটলীর মত জড়সড় হইয়া বউটি বসিয়াছিল। কি করিয়া সে বউটির সঙ্গে কথা বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

বেচারী আজাহের! কত মাঠের কঠিন বুক সে লাঙলের আঘাতে ফাড়িয়া চৌচির। করিয়াছে–কত দৌড়ের গরুকে সে হেলে-লাঠির আঘাতে বশে আনিয়াছে। কত দেশে-বিদেশে সে পৈড়াত বেচিয়া কত বড় বড় লোকের সঙ্গে কথা কহিয়াছে, কিন্তু যে তাহার সারা জীবনের সঙ্গী হইয়া তাহার ঘর করিতে আসিল, তাহার সঙ্গে কথা কহিতে আজাহেরের সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছে না, কি করিয়া সে কথা আরম্ভ করে কোন কথা সে আগে বলে কিছুই তাহার মনে আসিতেছে না। বিবাহের আগে সে কত ভাবিয়া রাখিয়াছিল–বউ আসিলে এইভাবে কথা আরম্ভ করিবে। এইভাবে রসিকতা করিয়া বউকে হাসাইয়া দিবে কিন্তু আজ সমস্তই তাহার কাছে কেমন যেন ঘুলাইয়া যাইতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে আজাহের ঘামিয়া গেল। উঠানের আমগাছটি হইতে একটা পাখি কেবলই ডাকিয়া উঠিতেছিল, বউ কথা কও, বউ কথা কও। এই সুর সমস্ত নীরব গ্রামখানির উপর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চারিধারের ঘনবনের অন্ধকার ভেদ করিয়া ঝি ঝি পোকাগুলি সহস্র সুরে গান গাহিতেছিল, তাহারই তালে তালে বনের অন্ধকার পথ ভরিয়া জোনাকীর আলোগুলি দুলিয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আজাহের উঠিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কেরোসিনের প্রদীপটি কতকটা মান হইয়া আসিয়াছিল। আজাহের তাহার সলিতা একটু উস্কাইয়া দিল। তারপর ঘরের মধ্যে ছেঁড়া মাদুরটি বিছাইয়া তাহার উপর শততালি দেওয়া কথাখানা অতি যত্নের সঙ্গে বিছাইল। রসুনের খোসায় তৈরী ময়লা তেল লাগান বালিশটি এক পাশে রাখিল। তারপর বউটিকে আস্তে কোলপাথালী করিয়া ধরিয়া আনিয়া সেই বিছানার এক পাশে শোয়াইয়া দিল।

এবার আজাহের কি যে করে ভাবিয়া পায় না। বিছানার একপাশে সেই শাড়ী-আবৃত বউটির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। শাড়ীর ফাঁক দিয়া বউ-এর মেহেদী মাখান সুন্দর। পা-দুটি দেখা যাইতেছিল। তারই দিকে চাহিয়া চাহিয়া আজাহেরের সাধ মিটিতেছিল না। ঘোমটার তল হইতে বউটি যেন বুঝিতে পারিল তাহার পা দুইটির পানে একজন চাহিয়া আছে। সে তখন ধীরে ধীরে পা দুইটি শাড়ীর আঁচলে ঢাকিয়া লইল। তাহাতে বউ-এর সুন্দর হাত দুটি বাহিরে আসিল। আজাহের আস্তে আস্তে নিজের দু'খানা হাতের মধ্যে। সেই রঙীন হাত দুখানা লইয়া নীরবে খেলা করিতে লাগিল। শাড়ীর অন্তরাল হইতে মেয়েটির মৃদু নিশ্বাস লওয়ার শব্দ শোনা যাইতেছিল, তাহা যেন আজাহেরের সমস্ত দেহমন গরম করিয়া তুলিতেছিল।

ধীরে ধীরে আজাহের বউএর মাথার ঘোমটাটি খুলিয়া ফেলিল। কেরোসিনের প্রদীপটি সামনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলিতেছে। তার আলোয় বউ-এর রাঙা টুকটুকে মুখখানা দেখিয়া দেখিয়া আজাহেরের সাধ মেটে না। বউ যেন ঘুমেই অচেতন। আজাহের মুখোনিকে একবার এদিকে উল্টাইয়া দেখে আবার ওদিকে উলটাইয়া দেখে। বাহুখানি লইয়া মালার মত করিয়া গলায় পরে। চারিদিকে মৃত্যুর মত নীথর স্তব্ধতা। সম্মুখের এই একটি নারীদেহ যেন সহস্র সুরে আজাহেরের মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। সেই দেহটি সারিন্দা, তাকে মনের খুশীতে নাড়িয়া চাড়িয়া আজাহের যেন মনে মনে কত শত ভাটিয়ালি সুরের গান আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছিল। সেই সুরে চারিদিকের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া আজাহেরের অন্তরে ছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার ছোট্ট উঠানটি ভরিয়া একটি রাঙা টুকটুকে বউ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তার রাঙা পায়ের ছাপের উপরে কে যেন কলমীর ফুল ছড়াইয়া যাইতেছে। পৌষ মাসের উতল বাতাসে বাড়ির কদম গাছটির তলায় একটি বউ ধান উড়াইতেছে। ঈষৎ বাঁকা হইয়া দুই হাতের উপর কুলাভরা ধানগুলিকে সে বাতাসে উড়াইয়া দিতেছে, হাতের চুড়ীগুলি টুং টুং করিয়া বাজিতেছে। চিটাগুলি উড়িয়া যাইতেছে, ধানগুলি লক্ষ্মীর মত বউ-এর পায়ের কাছে আসিয়া জড় হইতেছে! সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে আরো সুখের কথা মনে জাগিয়া ওঠে। প্রথম অঘ্রাণ মাসে নতুন ধানের গন্ধে গ্রাম ভরিয়া গিয়াছে। আঁটি ভরা গুচ্ছ গুচ্ছ লক্ষ্মী-শালি ধান মাথায় করিয়া আজাহের ঘরে ফিরিতেছে। বাড়ির বেকী বেড়াখানা ধরিয়া বউ তার পথের পানে চাহিয়া আছে। আজাহের আসিতেই বুকের আঁচল দিয়া বউ উঠানের কোণটি মুছিয়া দিল। সেইখানে ধানের আঁটি মাথা হইতে নামাইয়া

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে বউ-এর সঙ্গে দুই একটা সামান্য প্রয়োজনের কথা বলিতেছে।

এমনি ছবির পরে ছবি–তারপর ছবি। ভাবিতে ভাবিতে আজাহের কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল টেরও পাইল না। অনেক দেরীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া আজাহের দেখিতে পাইল বাড়িঘর সমস্ত ঝাট দেওয়া হইয়াছে। উঠানের একধারে তেঁতুল গাছটির তলায় ভাঙা চুলাটিকে পরিপাটি করিয়া লেপিয়া তাহার উপরে রান্না চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সামনের পালান। হইতে বেতে-শাক তুলিয়া আনিয়া কুলার উপর রাখা হইয়াছে। তারই পাশে একরাশ ঘোমটা মাথায় দিয়া বউটি হলুদ বাটিতেছে। রাঙা হাত দুটি হলুদের রঙে আরো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আজাহের দেখিল। তারপর তিন চারবার কাশিয়া গলাটাকে যথাসম্ভব মুলাম করিয়া কহিল, “বলি আইসাই তোমার এত কাম করনের কি দরকার ছিল? সকালে উইঠাই চুলা লেপতাছাও। তোমার ত কাল লাইগা জ্বর অবি।”

ঘোমটার তল হইতে কোন উত্তরই আসিল না। আজাহের কোলকেয় তামাক ভরিয়া যেন আগুন আনিতেই চুলার কাছে যাইয়া বসিল। এবার বউটির গায়ের সঙ্গে তাহার। ঘেঁসাঘেঁসি হইল। কোলকেয় আগুন দিয়া ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে আজাহেরের ইচ্ছা করে এইখানে এই উনানের ধারে বসিয়া বউ-এর সঙ্গে সে অনেক রকমের গল্প করে। খেত-খামারের কথা, তার ভবিষ্যৎ জীবনের ছোটখাট কথা, আরো কত কি।

আজাহের বলে, “সামনের ভাদ্র মাসে পাট বেইচা তোমার জন্যি পাছা পাইড়া শাড়ী কিন্যা আনব। খ্যাতের ধান পাকলি তুমি মনের মত কইরা পিঠা বানাইও, কেমন?”

বউ কোন কথাই বলে না। নিরুপায় হইয়া আজাহের এবার সোজাসুজি বউকে প্রশ্ন করে, “বলি তোমাগো বাড়ির বড় গরুড়া কেমন আছে! শুনছি তোমার বাপ তোমাগো ছোট বাছুরডা বেচপি? আমারে কিন্যা দিতি পার?”

তবু বউ কথা কহিল না। আজাহেরের মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। ওই ছোট্ট রাঙা টুকটুকে মুখখানা হইতে যদি কথা বাহির হইত। রাঙা টুকটুকে কথা। কেন সে কথা বলে না!

এই রঙীন শাড়ীর অন্তরালে কি যে অদ্ভুত রহস্য লুকাইয়া রহিয়াছে! কে যেন কুয়াপের মন্ত্র পড়িয়া আজাহেরকে সেই রহস্যের দিকে টানিতেছে। সে যতই বউটির কথা ভাবিতেছে ততই সে এই রহস্য জালে জড়াইয়া পড়িতেছে।

স্নান করিতে আজাহের নদীতে আসিল। এতদিন স্নান করিতে তার দুইমিনিটের বেশী লাগে নাই, আজ প্রায় একঘন্টা ধরিয়া আঠাল-মাটি দিয়া সমস্ত গা ঘসিয়া সে স্নান করিল। তবু মনে হয় গায়ের সমস্ত ময়লা যেন তার পরিষ্কার হয় নাই। মাথার উস্কখুস্কু চুলগুলিতে আজ ছমাস নাপিতের কচি পড়ে নাই। যদি সময় থাকিত আজাহের এখনই যাইয়া নাপিত বাড়ি হইতে সুন্দর করিয়া ঘাড়ের কাছে খাটো করিয়া চুল কাটাইয়া আসিত।

স্নান করিয়া ভালমত মাথা মুছিয়া থালার উপরে পানি লইয়া রৌদ্রে বসিয়া তাহারই ছায়ায় নিজের মুখখানা সে বার বার করিয়া দেখিল। তারপর ঘরের বেড়া হইতে একখানা কাঠের ভাঙা চিরুণী আনিয়া মাথার অবাধ্য চুলগুলির সঙ্গে কসরৎ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই চিরুণীখানা সে চার বৎসর আগে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। এতদিন তাহা কাজে লাগাইবার অবসর হয় নাই। আজ তাহা কাজে আসিল। অনেকক্ষণ চুলের সঙ্গে এই রকম কসরৎ করিয়া আজাহের বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বউ তার দিকে চহিয়া মৃদু হাসিতেছে। আজাহেরের চোখে চোখ পড়িতেই তাড়াতাড়ি বউ ঘোমটায় মুখখানা ঢাকিয়া ফেলিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে বিকাল বেলা রহিমদ্দী কারিকর আজাহেরের বাড়ি আসিল। আজাহের তাকে বড় আদর করিয়া বসাইল। নিজে তামাক সাজিতে যাইতেছিল। বউ তাড়াতাড়ি আজাহেরের হাত হইতে কলিকাটি লইয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। রহিমদ্দী তামাক টানিতে টানিতে বলিল, “বড় ভাল বউ পাইছসরে আজাহের। বউ বড় কামের অবি।”

রহিমদ্দীর মুখে বউ-এর তারিফ শুনিয়া আজাহের বড়ই খুশী হইল। রহিমদ্দী আস্তে আস্তে আজাহেরের কানের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বউ-এর সাথে কি কি কথা বার্তা ঐল তোর আজ?”

আজাহের রহিমদ্দীর গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফিসফিস করিয়া উত্তর দিল, “কি কব চাচা, বউ মোটেই কথা কয় না। বউর বুঝি আমারে পছন্দ অয় নাই।”

রহিমদ্দী বলিল, “দূর পাগলা, নতুন বউ, সরম করে না? একদিনেই কি তোর সঙ্গে কথা কবি?”

আজাহের যেন অকূলে কূল পাইল। সত্যই বউ তবে তাকে অপছন্দ করে না। নতুন বউ সরম করিয়াই তার সঙ্গে কথা বলে না। আজাহের এবার রহিমদ্দীকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিল। রহিমদ্দী বলিল, “নতুন বউকে গান শুনাইবার চা নাকি?”

‘দূর’ বলিয়া আজাহের রহিমদ্দীকে একটা মৃদু ধাক্কা দিল। হাসিতে হাসিতে রহিমদ্দী গান আরম্ভ করিল,

“মাগো মাগো কালো জামাই ভাল লাগে না,–”

গান শুনিয়া আজাহের হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে যদি লক্ষ্য করিত দেখিতে পাইত নতুন বউ-এর ঘোমটার তল হাসিতে ভরিয়া টুবুটুবু হইয়াছে।

চারিদিকে অন্ধকার করিয়া আবার রাত্রি আসিল। কেরোসিনের কুপিটি জ্বালাইয়া বউ নিজেই বিছানা পাতিল। আজাহের অবাক হইয়া দেখিল তার সেই সাত-তালি দেওয়া ময়লা কাঁথাখানি একদিনেই পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপরে রঙীন সূতার দুই তিনটি ফুল হাসিতেছে। সেই বিছানার ফুলগুলিরই যেন সঙ্গী হইয়া বউ একপাশে যাইয়া বসিয়া রহিল। বউটির দিকে বার বার করিয়া যতবার আজাহের তাকায় তার কেবলই মনে হয়, এমন রূপ তার গরীবের কুঁড়েঘরে মানায় না। ভরা মাঠের সরষে খেত কে আজ জীবন্ত করিয়া তার ঘরে ফেলিয়া গেল। কত কষ্টই না তার হইবে। গরীব

আজাহের এমন সুন্দর মেয়েটিকে সুখে রাখিতে সব কিছুই করিতে পারিবে। কিন্তু সে কি সুখী হইবে?

আজাহের বলে, “দেহ! আমার এহানে তোমার বড়ই কষ্ট অবি। কিন্তু জাইনো আমাগো দিন এই বাবেই যাবি না। আশ্বিন মাসে পাট বেইচা অনেক টাহা পাব। সেই টাহা দিয়া তোমার জন্য জেওর গড়ায়া দিব। তুমি দুক্ষু কইর না, আমি না খায়া তোমারে খাওয়াব, ঠোঁটের আধার দিয়া তোমারে পালব–তোমারে খুব ভাল জানব–আমার কলজার মধ্যে তোমারে ভইরা রাখপ।”

বউ একটু হাসিয়া আঁচলের বাতাসে কেরোসিনের কুপিটি নিবাইয়া আজাহেরের মুখে, একটি মৃদু ঠোক্কা মারিয়া বিছানার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। আজাহের বউ-এর সমস্ত দেহটি নিজের দেহের মধ্যে লুকাইয়া তার বুকে মুখে ঘাড়ে সমস্ত অঙ্গে মুখ রাখিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, “আমার একটা বউ ঐছে–সোনা বউ ঐছে–লক্ষী বউ ঐছে–মানিক বউ ঐছে। তোমারে আমি বুকে কইরা রাখপ–তোমারে আমি কলজার মধ্যে ভইরা রাখপ–আমার মানিক, আমার সোনা, তোমারে মাথায় কইরা আমি মাঠ ভইরা ঘুইরা আসপ নাকি? তোমারে বুকে কইরা পদ্মা গাঙ সঁতরাইয়া আসপ নাকি? আমার ধানের খ্যাতরে, আমার হালের লাঠিরে–আমার কোমরের গোটছড়ারে–আমার কান্ধের গামছারে। তোমারে আমি গলায় জড়ায়া রাখপ নাকি?”

আজাহের পাগলের মত এমনই আবল তাবল বকিয়া যাইতেছিল। বউটি হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছিল। মাঝে মাঝে আজাহেরের মুখে এক একটি মৃদু ঠোকনা দিতেছিল।

ভালবাসার অনেক কথা ওরা জানে না। বউ-এর হাতের মৃদু ঠোনায় আজাহেরের সমস্ত অঙ্গ পুলকে ভরিয়া যায়। আজাহের যেন আজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বউ এর সুন্দর নরম দেহটিকে সে যেন আজ লবঙ্গ এলাচির মত শুকিয়া শুকিয়া নিজের বুকে ভরিয়া লইবে।

এমনই করিয়া কখন যে রাত শেষ হইয়া গেল তাহারা টেরও পাইল না। প্রভাতের মোরগ ডাক দিতেই বউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া উঠান ঝাট দিতে আরম্ভ করিল। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়া আজাহের দেখিতে পাইল, পূব আকাশের কিনারায় পূব-ঘুমানীর বউ জাগিয়া উঠিয়াছে।

মুখ হাত ধুইতে ধুইতে সমস্ত আকাশ সোনালী রোদে ভরিয়া গেল। ঘর-গেরস্থালীর কাজে বউ এখানে সেখানে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। আজাহের ঘরের দরজার সামনে বসিয়া গান ধরিল

বাড়িতে নতুন বহু আসিয়া,
কথা কয় রাঙা মুখে হাসিয়া;
আমার বাঁশী বাজে তারিয়া নারিয়া নারিয়ারে।
পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায় বহু লাল শাড়ী পরিয়া,
লাল মোরগের রঙীন পাখা নাড়িয়া নাড়িয়া;
ও ভাইরে ঝলমল কি চলমল করিয়া।

সূচিপত্র

একাজ ওকাজে যাইতে চোখাচোখী হইতেই বউ-এর মুখখানা কৌতুক হাসিতে ভরিয়া যায়। আজাহের আরো উৎসাহের সঙ্গে গান ধরে–

বউ ত নয় সে হলদে পাখি এসেছে উড়িয়া
সরষে খেত নাড়িয়া
হয়ত বা পথ ভুলিয়া;
আমার মনে বলে রাখি তারে পিঞ্জিরায় ভরিয়া হৃদয়ে পুরিয়া
নইলে যাবে সে উড়িয়া।
ও ভাইরে ফুরপুর কি তুরতুর করিয়া।

গানের শেষ লাইনটি আজাহের বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিতে লাগিল। গান থামিলে ঘোমটার তল হইতে অতি মিহি সুরে বউ বলিল–”বাড়িতে আগুন নাই। ও-বাড়ির ত্যা আমাগো উনি আগুন আনুক গিয়া।”

এই কথা কয়টি আজাহেরের মনে সুধা বর্ষণ করিল। তার নিজের হাতে গড়া সারিন্দা যেন আজ প্রথম বোল বলিল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে মোড়লের বাড়িতে আগুন আনিতে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে বউ-এর সেই ছোট্ট কথা কয়টি যেন তাহার কানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতে লাগিল।

এমনই করিয়া আরো দুই তিনদিন কাটিয়া গেল। আজাহেরের নিকট তার বউকে যতই ভাল লাগিতেছিল, ততই সে মনে মনে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, কি করিয়া সে বেশী করিয়া উপার্জন করিবে? কি করিয়া সে বউকে আরো খুশী করিতে পারিবে?

দিনের বেলা আজাহের পৈড়াত বেচিতে ভিন গায়ে যায়। বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা পারাইয়া যায়। তখন বাঁশের কঞ্চি বাঁকাইয়া ঝুড়ি তৈরী করিতে বসে। প্রায় অর্ধেক রাত বসিয়া বসিয়া কাজ করে। বউ তার সঙ্গে সঙ্গে পাট দিয়া সরু তাইতা পাকাইতে থাকে। হাটের দিন এগুলি বিক্রি করিয়া তাহারা দুপয়সা জমা করিবে।

পৈড়াত বেচিয়া আজাহের যাহা উপার্জন করে, তাহাতে দুজনের খাওয়া খরচই কুলাইয়া উঠিতে চাহে না! আলীপুরের শরৎ সাহার কাছ হইতে আজাহের পনর টাকা কর্জ করিয়া আনিয়াছে। প্রতি টাকায় মাসে এক আনা করিয়া সুদ। যেমন করিয়াই হোক আজাহের ছয় মাসের মধ্যে সেই টাকা শোধ করিয়া দিবে। দুইজনে মুখামুখি বসিয়া পরামর্শ করে, কি করিয়া আরো বেশী উপার্জন করা যায়। মোড়লের কাছ হইতে আজাহের দুই বিঘা জমি বরগা লইয়াছে। বউ এর বাপের বাড়ি হইতে কয়েক দিনের জন্য বলদ দুইটি সে ধার করিয়া জমিটুকু চষিয়া ফেলিবে। সেই জমিতে আজাহের পাট বুনিবে। খোদা করিলে দুই বিঘা জমিতে যদি ভাল পাট জন্মে, তবে ভাদ্র মাসেই সে তার বরগা ভাগে। এক বিঘা জমির পাটের মালিক হইবে। এক বিঘা জমিতে কমসেকম পনর মণ পাট জমিতে পারে। আগামী বারে যদি পাটের দাম পাঁচ টাকা করিয়াও হয়, পনের মন পাটে সে পাঁচ কম চার কুড়ি টাকার মালিক হইবে! বউ তুমি অত ভাবিও না। শরৎ সাহার দেনাটা শোধ করিয়া যে টাকাটা থাকিবে সেই টাকা দিয়া আজাহের দুইটি ভালো বলদ কিনিবে, আর বউ এর জন্য একখানা পাছাপেড়ে শাড়ী কিনিয়া আনিবে।

বউ বলে, “শাড়ী কিন্যা কি অবি। শাড়ীর টাকা দিয়া তুমি একটা ছাগল কিন্যা আইন। কয় মাস পরে ছাগলের বাচ্চা অবিবাচ্চাগুলান বড় ঐলে বেইচা আরো কিছু জমি অবি।”

আজাহের বলে, “আইচ্ছা–বাইবা দেখপ পরে।”

অনেক বড় হইতে তাহারা চাহে না। মাথা পুঁজিবার মত দুখানা ঘর, লাঙল চালাইবার মত কয়েক বিঘা জমি আর পেট ভরিয়া আহার;–এরি স্বপ্ন লইয়া তাহারা কত চিন্তা করে, কত পরামর্শ করে, কত ফন্দি-ফিকির আওড়ায়।

সকালে বউ রাধে না। পূর্ব দিনের বাসি ভাত যা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে জল মিশাইয়া কাঁচা লঙ্কা ও লবণ দিয়া দুইজনে খাইয়া পেট ভরায়। কোন কোন দিন অনাহারেই কাটায়।

এত অল্প খাইয়াও মানুষ বাঁচিতে পারে! তবু তাহাদের কাজের উৎসাহ কমে না! তবু তাহারা গান করে! রাত জাগিয়া গল্প করিতে করিতে কাজ করে! মাথা খুঁজিবার মত একখানা ঘর, পেট ভরিয়া দুই বেলা আহার, একি কম ভাগ্যের কথা!

.

০৪.

দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাস আসিল। সত্য সত্যই আজাহেরের খেতে ভাল পাট হইয়াছে। সকলেই বলিল মোড়লের বরগার ভাগ দিয়া আজাহের এবার প্রায় কুড়ি মণ পাট পাইবে।

সেই পাট শুখাইতে বউ-এর কি উৎসাহ। উঠানে সারি সারি বাশের আড় পাতিয়া তাহার উপরে পাটগুলি মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে সমস্ত বাড়িখানা যেন নকল বনে পরিণত হইয়াছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে বউটি হারাইয়া যায়। তাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আজাহেরকে বড়ই বেগ পাইতে হয়। সে যদি এদিকে যায় বউ ওদিক হইতে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। বউকে ধরিবার জন্য ওদিক যাইতে বিস্ময়ে আজাহের দেখে বউ অপরদিকে যাইয়া ক করিয়া শব্দ করিয়া ওঠে।

মোড়লের বউ বেড়াইতে আসিয়া বলে, “কি লো! তোগো হাসি মস্করা যে ফুরায় না?”

বউ তাড়াতাড়ি পিড়াখানা বাড়াইয়া বলে, “বুবু আইছ–বইস, বইস।”

আজাহের বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া তামাক সাজিতে রান্নাঘরের দিকে যায়।

পাট শুখান শেষ হইতে না হইতে আজাহেরের বাড়িতে পাটের বেপারী অছিমদ্দীর আনাগোনা শুরু হইল। আজাহের শুনিয়াছে, ফরিদপুরে প্রতিমণ পাট ছয় টাকা দরে বিক্রি হইতেছে। অছিমদ্দী কিন্তু তাহার পাটের দাম চার টাকার বেশী বলে না। অছিমদ্দীর জন্য তামাক সাজিতে সাজিতে আজাহের বলে, “তা বেপারীর পো, চার টাকার পাট আমি কিছুতেই ছাড়ব না।” অছিমদ্দী বলে, “আরে মিয়া তোমার পাট ত তেমুন বাল না? কোম্পানী-আলা এ পাট নিতিই চায় না, তবে আমি কিন্‌তি আছি, দেহি বাল পাটের সঙ্গে মিশায়ানি বেচতি পারি।”

“হুনলাম ফইরাতপুরি পাটের দাম ছয় টাহা মণ।”

“অবাক করলা আজাহের! মার কাছে মাসী-বাড়ির গল্প কইতি আইছাও? ফরিদপুর, তালমা, গজাইরা, ভাঙ্গা, কালিপুর, চোদ্দরসি, ফুলতলা কোন আটের খবর আমি জানি না? যাও না ফৈরাতপুর পাট লয়া। তোমার ভিজা পাট দেকলি পুলিশেই তোমাকে দৈরা নিব্যানে। তারপর যদি স্যাত পাট বিক্রিও অয়, মণকে দশ সের নিব্যানে তোমার তুলাওয়ালা, তারপর বাকি রইল তিরিশ সের। ওজনদার নিব্যানে মণকে পাঁচ সের–কয় সের রইল মিঞার বেটা বিশ সের ত? শব্দেই হুনা যায় ছয় টাহা। চার মণ মানে সেহানে দুই মণ।”

বেপারীর আরো একটু কাছে ঘেঁষিয়া আজাহের বলিল,–”কওকি বেপারীর পো! ফইরাতপুর এমন জায়গা!”

বেপারী দেখিল তাহার ঔষধ কাজে লাগিয়াছে। গলার সুরটি আরো একটু নরম করিয়া বলিল,–”আজাহের মিঞা! আমি তোমার দেশের মানুষ, রাইত দিন চক্ষি দেহি। আমি তোমারে ফৈরাতপুইরা বেপারীগো মত ঠকাইতি আসি নাই।”

আজাহেরের মনটি যেন নরম হইয়া মাটিতে গলিয়া পড়িতে চাহে। অছিমদ্দী শোভারামপুরের ধনী মহাজন। সে তাহাকে আজাহের মিঞা বলিয়া ডাকিতেছে। কত মুলাম করিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। তবু আজাহের হাল ছাড়িল না।

“বেপারীর পো! আরো দুই একদিন দেহি। আর কুনু বেপারী যদি বেশী দাম দেয়?”

“আজাহের মিঞা! আমারে তুমি অবিশ্বাস করলা! আমার চাইতি তোমারে আর কোন বেপারী বেশী দাম দিবি? ও সগল কতা থাক। তোমার মনের আন্ধার ঘুচাই। তোমার

পাটের দাম মণ প্রতি আরো আটআনা বাড়াইয়া দিলাম, না হয় নিজেই লোকসান দিলাম।”

আজাহেরের দুইখানা হাত ধরিয়া বেপারী বলিল–”আজাহের মিঞা! কথা দাও। এবার পাটে ওজন দেই?”

এর উপর আর কথা বলা চলে না। এত বড় মহাজন। নিজে তার বাড়ি আসিয়াছে। তার কথা কি করিয়া অগ্রাহ্য করা যায়? আজাহের চারটাকা আটআনা দামেই পাট বেচিবে কথা দিয়া ফেলিল।

আজাহের আগেই পাট ওজন দিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে তাহার পাটের ওজন হইয়াছিল ছাব্বিশ মণ। কিন্তু অছিমদ্দী নতুন করিয়া পাটগুলিকে ওজন করিল। তাহাতে কুড়ি মণ পাট হইল। আজাহেরের মন কেবলই খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। সে নিজে ওজন করিয়াছিল ছাব্বিশ মণ আর এখন হইল কুড়ি মণ। কিন্তু কথাটা কি করিয়া বেপারীকে বলা যায়? অনেক চিন্তা করিয়া বহুবার ঢোক গিলিয়া আজাহের বলিল, “বেপারীর পো! একটা কতা কব্যার চাই।”

“কি কতা আজাহের মিঞা? একটা ক্যান বিশটা কও না ক্যান?”

“কব আর কি? আমি নিজে ওজন দিছিলাম। পাটের ওজন ঐছিল ছাব্বিশ মণ। কিন্তুক আপনার ওজনে ঐল মোটে কুড়ি মণ।”

বেপারী এবার রাগিয়া উঠিল, “কি কইলা আজাহের, আমি অছিমদ্দী বেপারী, পাটের ওজনে তোমারে ঠকাইছি। শুয়ারের গোস্ত খাই যদি তোমারে ঠকাইয়া থাহি। কোথাকার নকল পালা-পৈড়ান দিয়া তুমি ওজন দিছিলা। তাইতি ওজনে বেশী ঐছিল। একথা কারও কাছে কইও না, যে তোমার কাছে নকল পালা-পৈড়ান আছে। একথা পুলিশি জানতি পারলি এহনি তোমারে থানায় ধইরা নিয়া যাবি। আমার পালা-পৈড়ানে কোমপানি বাহাদুরের নাম লেহা আছে। ইংরাজী পড়বার পার মিঞার বেটা?” বলিয়া বেপারী উচ্চ হাসিয়া উঠিল। ইতিমধ্যেই অছিমদ্দীর লোকজন পাটগুলি বাঁধিয়া নৌকায় উঠাইয়া ফেলিয়াছে। অছিমদ্দী কোমরে গোজা চটের ছালার খুতিটি খুলিয়া টাকা, আনি, দু’আনি প্রায় তিন চারিশত টাকা আজাহেরের উঠানের উপর ঢালিয়া দিল।

আজাহের ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অছিমদ্দীর অপূর্ব ঐশ্বর্য্যের পানে চাহিয়া বিসায়ে অবাক হইয়া রহিল।

সেই টাকা হইতে গণিয়া গণিয়া অছিমদ্দী কুড়ি মণ পাটের দাম নব্বই টাকা আজাহেরের হাতে খুঁজিয়া দিল।

এত টাকা একসঙ্গে পাইয়া খুশীতে আজাহেরের ইচ্ছা করিতেছিল, অছিমদ্দী বেপারীর পায়ের কাছে লুটাইয়া ছালাম জানায়। সে যেন নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়াই তাকে টাকাগুলি দিয়া গেল। পাটগুলি যে লইয়া গেল সে যেন একটা তুচ্ছ উপলক্ষ মাত্র।

বেপারী চলিয়া গেলে বউ ঘরের মধ্য হইতে আসিয়া আজাহেরকে বলিল, “বলি, আমাগো বাড়ির উনি এত বোকা ক্যান? সে দিন মাইপা পাট ঐল ছাব্বিশ মণ আর আজই বেপারী

আইসা সেই পাট মাইপা কুড়ি মণ করল। ও-বাড়ির মেনাজদ্দী মোড়লেরে ডাইকা আইনা পাটের একটা বুঝ কইরা নিলি ঐত না?”

“বাল কই কইছ তুমি। আমার উয়া মনেই আসে নাই। যাক–খোদা নছিবে যা লেখছে তাই ত আমি পাব। এর বেশী কিডা দিবি।”

এ কথার উপরে আর কথা চলে না। তবু বউর মনটা খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল।

বউকে খুশী করিবার জন্য আজাহের বলিল, “আইজই রহিমদ্দী কারিকরের বাড়ি ত্যা তোমার জন্যি একখানা পাছা পাইরা শাড়ী কিন্যা আনিগা।”

বউ বলিল, “আমার শাড়ীর কাম নাই। আগে শরৎ সাহার কর্জ টাহাডা দিয়া আসুক গিয়া।”

“বাল কতাই কইছ তুমি। আমি এহনি যামু শরৎ সহর বাড়ি।”

গোটা তিরিশেক টাকা কোমরে বাধিয়া বাকি টাকাগুলি আজাহের ঘরের মেঝেয় গর্ত খুঁড়িয়া একটা হাড়িতে পুরিয়া তাহার মধ্যে পুঁতিয়া রাখিল। বউ তাড়াতাড়ি সেই গর্তটি মাটি দিয়া বুজাইয়া তাহার উপরটা লেপিয়া ফেলিল।

.

০৫.

দুপুরের রোদে আজাহের সেই কোমরে বাধা টাকাগুলি লইয়া শরৎ সাহার বাড়ির দিকে রওয়ানা হইল।

আলীপুরের ওধারে সাহা পাড়া। হালটের দুইধারে বড় বড় টিনের ঘরওয়ালা বাড়িগুলি। আম, জাম, কাঁঠালগাছগুলি শাখা বাহু বিস্তার করিয়া এই গ্রামগুলিকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। হালটের পথে সাহাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েগুলি খেলা করিতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের গলায়ই মোটা মোটা সোনার হার। কাহারো বাহুতে সোনার তাবিজ বাধা। কপালে সিঁদুর পরিয়া কাঁখে পিতলের কলসী লইয়া দলে দলে সাহা গৃহিণীরা নদীতে জল আনিতে যাইতেছে। তাহাদের কাখের ঘসামাজা পিতলের কলসীর উপর দুপুর বেলার রৌদ্র পড়িয়া ঝকঝক করিতেছে। সাহারা এই অঞ্চলে সবচাইতে অবস্থাপন্ন জাতি, কিন্তু পানীয় জলের জন্যে মুসলমানদের মত তাহারা বাড়িতে টিউবওয়েল বা পতাকুয়া বসায় না। তাহাদের, মেয়েরাই নদী হইতে জল লইয়া আসে। সেই জন্য গ্রামে কলেরা হইলে আগে সাহা পাড়ায় আরম্ভ হয়। নানা রকমের সংক্রামক রোগে তাই ধীরে ধীরে উহাদের বংশ লোপ পাইতে বসিয়াছে।

পূর্বে সাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেশে-বিদেশে গমন করিত। এদেশের মাল ও-দেশে লইয়া গিয়া, ও-দেশের মাল এ-দেশে আনিয়া তাহারা দেশের সম্পদ বাড়াইত। পল্লী-বাংলার অনেকগুলি রূপরেখা তাই সাহা, সাধু-সওদাগরদের কাহিনীতে ভরপুর। আজও পল্লী গ্রামের গানের আসরগুলিতে গায়কেরা কত সাধু-সওদাগরের, শখ-বণিকের দূরের সফরের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শত শত শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। কবে কোন নীলা-সুন্দরীর মাথার কেশে-লেখা প্রেম-লিপি পড়িয়া কোন সাহা বণিকের ছেলে সুদূর লঙ্কার

বাণিজ্যে বসিয়া বিরহের অশ্রুবিন্দু বিসর্জন করিয়াছিল, তাহার ঢেউ আজো গ্রাম্য-রাখালের বাঁশীতে রহিয়া রহিয়া বাজিয়া উঠে।

কিন্তু কিসে কি হইয়া গেল! সাহারা আয়াসপ্রিয় হইয়া পড়িল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অদুনা পদুনার শাড়ীর অঞ্চল ছাড়িয়া তাহারা আর সংগ্রাম-সঙ্কুল বিদেশের বাণিজ্যে যাইতে চাহিল না। পুব বাংলার দেশ-বিদেশের বাণিজ্য-ভার সাহাদের হাত হইতে সরিয়া গিয়া বিদেশী মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য জাতির উপর পড়িল। নানা বিলাস ব্যসনে ডুবিতে ডুবিতে তাহারা লাভ-মূল সবই খোয়াইল। বাংলার সাহা সমাজ কুসীদজীবীতে পরিণত হইল। সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য যা তাহারা করে তাহাও নামে মাত্র। এখন তাহাদের মুখ্য ব্যবসা মূর্খ গেঁয়ো চাষীদের মধ্যে উচ্চহারের সুদে টাকা খাটান।

সাহাদের প্রত্যেক বাড়িতে একখানা করিয়া বৈঠকখানা। সেই বৈঠকখানার একধারে চৌকি পাতা। তাহার উপরে চাদর বিছান। তারই এক কোণে কাঠের একটি বাক্স সামনে করিয়া বাড়ির মূল মহাজন বসিয়া থাকেন। পাশে দুই একজন বৃদ্ধ বয়সের গোমস্তা। ডানাভাঙ্গা চশমায় সূতো বাধিয়া কানের সঙ্গে আঁটকাইয়া তাহারা বড় বড় হিসাবের খাতা লেখে। মূল মহাজন মাঝে মাঝে কানে কানে কি বলিয়া দেন। তাহারা ইসারায় সায় দিয়া আবার খাতা লেখায় মনোনিবেশ করে। মহাজনের মাথার উপর গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের ফটো। তারই পাশে নামাবলি গায়ে হরিনাম জপ-রত মহাজনের গুরুঠাকুর বা পিতৃদেবের ফটো। তাহার উপরে চন্দনের ফোঁটা। প্রতিদিন সকালে বিকালে ধূপ ধুনা দিয়া সেখানে নত হইয়া মহাজন পূজা করেন। এই সমস্ত উপকরণই যেন তার কুসীদজীবী নিষ্ঠুর জীবনের মর্মান্তিক উপহাস। ঘরের চৌকির ওপাশের মেঝে লেপাপোছা। একধারে কতকগুলি ছালা গোটান। সমবেত খাতকেরা এবং টাউটেরা সেই

ছালার উপরে বসিয়া নানা রকমের চাটুবাক্য বলিয়া মহাজনের মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করে। একপাশে একটি আগুনের পাতিল। তাহা হইতে ঘুটার ধুয়া উঠিতেছে। তারই পাশে চার পাঁচটি পিতল বাধান তেলো হুঁকো। তাহার একটি ব্রাহ্মণের জন্যে, একটি কায়স্থের জন্য, একটি মূল মহাজনের জন্যে। সমবেত মুসলমান খাতকদের জন্য কোন হুঁকো নাই। তাহারা কলিকায়ই তামাক সেবন করে।

মহাজনের খাতাগুলি আবার নানা ধরনের। যাহারা তামা-কাসা বন্ধক রাখিয়া অল্প টাকা লয় তাহাদের জন্য এক খাতা, যাহারা সোনা-রূপা বন্ধক দিয়া টাকা লয় তাহাদের জন্য এক খাতা, যাহারা কোনকিছু বন্ধক না দিয়াই টাকা কর্জ করে তাহাদের জন্য এক খাতা, আবার যাহারা মহাজনের বাড়িতে তিন বৎসর খাঁটিয়া যাইবে এই অজুহাতে বিনা সুদে টাকা কর্জ করিয়াছে তাহাদের জন্য এক খাতা।

মহাজনের টাকা আবার নানা নামে খাটে।

কতক টাকা কর্জ দেয় স্ত্রীর নামে, সেই কবে স্ত্রী বউ হইয়া ঘরে আসিয়াছিল, তখন মহাজনের পিতা দশটি টাকা দিয়া নববধূর মুখ দর্শন করিয়াছিলেন, আজ সেই টাকা সুদে ফাপিয়া দশ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে। তার ছেলে শহরে যাইয়া পড়াশুনা করে। জলপানের টাকা হইতে বাঁচাইয়া সে পিতার নিকট সুদে খাটাইবার জন্য পাঁচ টাকা দিয়াছিল তিন বৎসর আগে। তাহাও এখন সুদে ফঁপিয়া তিনশত টাকায় পরিণত হইয়াছে। এইভাবে নানা তহবিল হইতে মহাজনকে নানা প্রকারের টাকা কর্জ দিতে হয়।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ইহা ছাড়া জমা উসুল বকেয়া, পূজার বৃত্তি, পুণ্যার বৃত্তি আরও কত রকমের জটিল। হিসাব তাহাকে রাখিতে হয়। মহাজনের গদীর অর্ধেক স্থান জুড়িয়া কেবল খাতার উপরে খাতা। কিন্তু এতসব খাতাতে দিনের পর দিন চার পাঁচজন গোমস্তা বসিয়া শুধু কলমের খোঁচায় যে অঙ্কের উপর অঙ্কের দাগ বসাইয়া যাইতেছে, তাহার সবগুলি অক্ষর মহাজনের কণ্ঠস্থ। যদি বা কখনো এতটুকু ভুল হইবার উপক্রম হয় পাশের গোমস্তারা তাড়াতাড়ি করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দেয়।

সাহাপাড়া আসিয়া আজাহের দেখিল লোকে লোকারণ্য। আশেপাশের নানা গ্রাম হইতে চাষী মুসলমান ও নমঃশূদ্রেরা এখানে আসিয়া ভীড় করিয়াছে। কেহ টাকা কর্জ লইয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ি যাইতেছে। কেহ কর্জ টাকা দিতে আসিয়া সুদের অঙ্ক শুনিয়া মহাজনের পা ধরিয়া কাঁদিতেছে, কেহ বউ-এর গহনা আনিয়া মহাজনের গদিতে ঢালিয়া দিতেছে। মহাজন নিক্তিতে করিয়া অতি সাবধানে সেই সোনা-রূপার গহনা মাপিয়া লইতেছে।

এইসব দেখিতে দেখিতে আজাহের শরৎ সাহার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ সাহার বাড়িতে লোকজনের ভীড় খুব কম। কারণ কুলোকে বদনাম রটাইয়াছে "চীনা জোঁকে ধরিলেও ছাড়িয়া যায় কিন্তু খাতকের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে শরৎ সাহা ছাড়ে না।" এত যে তার টাকা, কিন্তু সকালে একমুঠো চাউল মুখে দিয়া সে জলযোগ করে। বাজার যখন ভাঙ্গি ভাঙ্গি করে তখন শেষ বাজারে শরৎ সাহা যাইয়া পচা পুঁটিমাছ অথবা টাকিমাছ কিনিয়া আনে। এজন্য গৃহিণীর সঙ্গে তাহার প্রায়ই ঠোকাঠুকি লাগে।

বড় মেয়েটিকে বিবাহ দিয়াছে মানিকগঞ্জ গ্রামে। কাল জামাই আসিয়াছিল। এই খবর পাইয়াই শরৎ সাহা খিড়কীর দরজা দিয়া ভাঙ্গা ছাতির আড়াল করিয়া সেই যে সকাল বেলা তাগাদা করিতে ভাটপাড়ার গ্রামে গিয়াছিল আর ফিরিয়া আসিয়াছে রাত বারোটার সময়। শ্বশুরবাড়িতে দুপুর বেলায় শুকনো ডাটার ঝোল আর পচা আউস চাউলের ভাত খাইয়া জামাই চলিয়া গিয়াছে। অতরাত্রে বাড়ি আসিয়া গৃহিণীকে ঘুমাইতে দেখিয়া আহ্লাদে শরৎ সাহার নাচিতে ইচ্ছা করিতেছিল। গৃহিণী জাগিয়া থাকিলে নথ-নাড়া দিয়া বকিতে বকিতে তাহাকে সারা রাত্রি ঘুমাইতে দিত না। না হয় সে সারাদিন খায় নাই কিন্তু রাত্রটা ত সে ঘুমাইতে পারিবে। এই আনন্দে কলসী হইতে তিন গ্লাস জল লইয়া এক মুঠি চাউলসহ গলাধঃকরণ করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সকাল বেলা উঠিয়া গৃহিণীর হাত হইতে সে নিস্তার পায় নাই। যতই সন্ধ্যা আহ্নিক করার অজুহাতে সে মালা-চন্দন লইয়া জপে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করিয়াছে গৃহিণীর ঝঙ্কার ততই উদারা মুদারা ছাড়াইয়া তারায়–পঞ্চমে উঠিয়াছে।

পরে গৃহিণীর জ্বালায় অস্থির হইয়া সে বলিয়াছে,”ভাল মানুষীর বউ। একটু মন দিয়া শোন। জামাইর সঙ্গে যদি আমি দেখা করতাম তবে বাজারে যেতে হত। বড় একটা রুইমাছ না হলেও অন্ততঃ দেড় টাকা দিয়ে একটা ইলিশমাছ কিনতে হত। দুধও আনতে হ’ত। বলত পাঁচ টাকার কমে কি বাজার করতে পারতাম? আমার বুকের হাড্ডির মত এই পঁচটা টাকা বাজারে নিয়ে ঢেলে দিয়ে আসতে হত। এই পাঁচটাকা সুদে খাটালে পাঁচ বছরে দুশো টাকা হবে। দশবছরে হাজার টাকা হবে।”

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিয়াছে, “ওরে মুখ-পোড়া! টাকার প্রতি যদি তোর এত দরদ তবে মেয়ের জন্ম দিয়েছিলি কেন? শ্বশুর বাড়িতে শুকনো ডাটার ঝোল খেয়ে জামাই

আমার মেয়েকে যখন খোটা দিবে তখন কি তোর টাকা তার উত্তর দিতে যাবে? আজ পাঁচ বচ্ছর মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছি, একখানা পান-বাতাসা হাতে করে মেয়েটাকে দেখতে গেলে না! মেয়েকে আনার নাম করলে ত চোখ চড়ক গাছ।”

শরৎ সাহা এবার রাগিয়া উত্তর করিয়াছে, “সব কাজেই কেবল তোমার খরচ করবার। মতলব। কিসে দু’টো পয়সা আসে সে দিকে খেয়াল নেই। ছিলে ত গরীব বাপের বাড়ি, এক বেলাও আখায় হাঁড়ি চড়তো না!”

তারপর গৃহিণীর সঙ্গে শরৎ সাহার যে ধরনের কথাবার্তা হইয়াছে পৃথিবীর কোন ভাষা তাহা ধরিয়া রাখিবার শক্তি রাখে না। নিতান্ত সাধারণ রুচির কষ্টিপাথরে ঘষিয়া মাজিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম।

“কি! তুমি আমার বাপের খোটা দিয়ে কথা বল? বলি ও যুয়ান কি শোগা! তোর মত বুড়ো শ্মশানের-মড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আমার বাপ-মা যে তোকে সাতকুলে উঠিয়েছে তা কি তোর মনে নেই? তোর ঘরে খেটে খেটে আমি জীবন ক্ষয় করলাম, একদিন একখানা ভাল শাড়ী কারে কয় দেখলাম না।”

“শাড়ীরই যদি দরকার তবে তোমার বাপ-মা তোমাকে তাঁতীদের বাড়ি বিয়ে দিল না। কেন?”

“তাও যদি দিত আমার শত গুণে ভাল হ’ত। তোর বাড়িতে এসে কোনদিন একটা মিষ্টি কথা শুনতে পেলাম না। দিনরাত তোর শুধু টাকা, টাকা, টাকা। বলি ও গোলামের নাতি! সারাদিন টো টো করে ঘোরো খাতকের পাড়ায় পাড়ায়, আর বাড়িতে এসে মহাজনি

খাতা সামনে করে মরা-খেকো শকুনের মত বসে থাকো। বলি ও কুড়ের নাতি!–তোর ঐ খাতা পত্তর আজ আমি উনুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলব।”

“আহা হা গিন্নি রাগ করো না। এই খাতা পত্তরগুলো হ’ল আমার বুকের পাজর। ওর পাতা ছিড়লে আমি বাচবো না। একটা কথা শোন–লোকে বলে শরৎ সাহা খায় না। তার শরীরে বল নেই। কিন্তু আমার বল যে ওই হিসাবের খাতাগুলো। ও গুলো দিনে দিনে। যত বাড়ে আমার বুকের তাগতও তত বাড়ে, একথা কেউ জানে না। এই খাতাগুলোর জোরে আজ আমি দশগ্রামের মধ্যে একটা কেউকেটা। আমার হুকুমে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তোমার যে দশটাকা ভাটপাড়া গাঁয়ে সুদে খাঁটিয়েছিলাম, চার বছরে তা বেড়ে একশ টাকা হয়েছে। কাল সেই টাকাটা পেয়েছি।”

“দাও তবে আমার সে টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমি মেয়ের বাড়িতে তথ্য পাঠাব।”

“এইত, এই তুমি একটা নামাঙ্কুলের মত কথা বললে। টাকা কি আমি বাড়িতে নিয়ে এসেছি? তখন তখনই টাকাটা অপরের কাছে সুদে লাগিয়ে এলাম। বাড়িতে যদি নিয়ে আসতাম, সারারাত তাই পাহারা দিতে ঘুম আসত না। লোকে বলে, শরৎ সাহা লাখপতি না কোটীপতি, কিন্তু বাপের নাম করে প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি–জীবনে কোনদিন একত্রে পাঁচশত টাকার মুখও দেখি নি!”

“তবে তোমার অত মুরাদ কিসের?”

“আরে গিন্নি–একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমার লাখ টাকা আছে না কোটী টাকা আছে তা তোমাকে দেখাতে পারব না, কিন্তু আমার সারাটি জীবন ভরে পাওনাগণ্ডার

হিসাব লিখে যত সব খাতা পত্তর লিখেছি তা মাটিতে বিছিয়ে দিলে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন পর্যন্ত সমস্ত পথ আমি মুড়ে ফেলতে পারি। টাকা, টাকা, টাকা! টাকা ঘরে এনে কি হবে! টাকায় টাকা আনে। সেই জন্য টাকা ছড়িয়ে দিয়েছি। আমার পাঁচ'শ ঘর খাতক আছে সুন্দরবন অঞ্চলে। হাজার ঘর খাতক আছে বঙ্গোপসাগরের ওপারে কুতুবদিয়ার চরে। দশ হাজার খাতক আছে সন্দ্বীপে, ভাটপাড়া, মুরালদাহ, কত গ্রামের নাম তোমাকে বলবো। মুন্সীগঞ্জে ইকিড়ি মিকিড়ি কথা বলে, বেদের দল, নায়ে নায়ে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে আছে আমার বিশ হাজার খাতক। আর তুমি গিন্নি। তুলসীতলায় পেন্নাম করে আমার জন্য। দেবতার আশীর্বাদ এনো। আর যদি কুড়ি বছর বেঁচে থাকি তবে কৃষ্ণের গোলকখানি আমার খাতকে ভরে যাবে। জান গিন্নি সাধে কি লোকে বলে আমার নাম শরৎ সাহা!"

"পাড়ার লোকেরা বলে কি জান? সকাল বেলা উঠে তোমার নাম যদি মুখে আসে তবে সেদিন তাদের আহার জোটে না। কঞ্জুস যক্ষ কোথাকার! আমার কাশি দিয়ে রক্ত পড়ছে কতদিন। লোকে বলে যক্ষ্মা হয়েছে। আমার জন্য একফোঁটা ঔষধ কিনে আনলে না?"

"তোমাকে না বলেছিলাম রামেরাজকে ডেকে জল পড়িয়ে খেও। তা খাওনি? তোমার কেবল টাকা খরচের দিকে মন?"

"রামেরাজের পড়া জল ত কত খেলাম কিন্তু আমার অসুখ একটুও কমলো না। দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একটু ভাল ঔষধ আনিয়ে দাও।"

“দেখ গিন্নি! টাকা পয়সা খরচের দিকে তুমি কিছুতেই আমাকে নিতে পারবে না। তোমার আগে আমি আরও দুই বিয়ে করেছিলাম। বড় জন বড়ই সুন্দরী ছিল। সান্নিপাতিক জ্বর হ’ল, মরে গেল, পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখালাম না। তারপর যিনি এলেন, তার ছিল বড় ঝুঁজ, এই তোমারই মতন, একদিন সিন্দুকের চাবি চুরি করে টাকা বের করে তার বাপকে দিয়েছিল। আমি তার মুখে কলকে পোড়া দিয়ে ছাপ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সেই লজ্জায় সে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।”

“তারা মরে সকল জ্বালা জুড়িয়েছে। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে গলাটিপে মেরে ফেল। তোমার মত কঞ্জুসের ঘর করার চেয়ে আমার মরাও ভাল। বলি ও মরা কাঠ! তোর ঐ টাকা কে খাবে? আমার এমন সুন্দর ছেলেটি পাঁচ বছর বয়সে বাড়ির এখানে সেখানে হরিণের মত ঘুরতো। ওলাউঠা ব্যারাম হোল। বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। পয়সা খরচ হবে বলে একজন ডাক্তার এনে দেখালে না।”

এমন সময় বাহিরে গলা খেকর দিয়া আজাহের ডাক ছাড়িল, “সা-জী মশায় বাড়ি আছেন নাকি?”

আজাহেরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহিণী অন্দরে চলিয়া গেল।

বস্তুতঃ গৃহিণীর সঙ্গে উপরোক্ত বাক্যালাপ করিয়া শরৎ সাহার মেজাজ খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু খাতকের কণ্ঠস্বর যেন বাঁশীর স্বরের মত, তাহাকে আপন মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিল।

সা-জী মশায়

০৬.

“বলি, সা-জী মশায়! বাড়ি আছেন নাকি?”

“এই দুপুর বেলা কে এল? আজাহের নাকি?”

“স্যালাম কর্তা স্যালাম।”

“স্যালাম, স্যালাম;–তা কি মনে করে আজাহের?”

“এই আইলাম কর্তা, আপনার টাহা কয়ডা দিবার জন্যি।”

“বটে! এরই মধ্যে টাহা জোগাড় করে ফেললি! তুই ত কম পাত্র নস রে!”

“হে কর্তা! আজই পাট বেচলাম কিনা। তা ভাবলাম আপনার টাহা কয়ডা দিয়া আসি।”

“তা কত টাকা বেচলি?”

“এই বেশী নয় সা-জী মশায়। চাইর কুড়ি টাহা।”

সা-জী মশায় এবারে চেয়ারের উপর একটু ঘুরিয়া বসিলেন। আজাহের মাটির উপর একখানা ছালা টান দিয়া তাহার উপর বসিল।

বলিল, "কিরে এত টাকায় পাট বেচেছিস? তবে এবার এক কাজ কর। এই টাকা দিয়ে আরো কিছু জমি কিনে ফেল।"

"জমি আর কি কইরা কিনব কর্তা! আপনার কর্জ টাহা শোধ দিতি অবি। তা ছাড়া। বছরের খোরাকি আছে।"

"আরে আমার টাকার জন্য তুই ভাবিস নি। পনর টাকার ভারি ত সুদ। মাসে মাত্র দু'আনা কম দুটাকা। এ তুই যখন পারিস দিস। এক কাজ কর গিয়া। পলার চরে আমার দুই বিঘা জমি আছে। তার দাম দুইশ' টাকা। তা তোকে আমি একশ টাকায় দিতে পারি।"

"এত টাহা কোথায় পাব কর্তা! মাত্র চার কুড়ি টাহা পাট বেচছি।"

"তার জন্য ভাবিস না। তুই আশি টাকা এখন দে। তারপর আগাম সন জমিতে ফসল হোলে বাকি টাকাটা দিয়ে দিস!"

"এত দয়া যদি করেন কর্তা, তা ঐলে ত গরীর মানুষ আমরা বাইচা যাই।"

"আরে গরীর-গরবা দেখতে হয় বলেই ত মারা গেলাম। এই দেখ, চরের জমিটার জন্য ও পাড়ার কালু সেখ এসে সেদিন একশ' পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কত সাধাসাধি। কিন্তু তোকে দেখে একশ টাকায়ই দিয়ে ফেললাম। আমার গিন্নি ত আমার উপর রেগেই

আছে। বলে যত গরীব গরবাকে দয়া করা তোমার কারবার। আরে দয়া কি আমি করি–দয়া উপরওয়ালার।” এই বলিয়া সা-জী মশায় দুই হাত কপালে ঠেকাইলেন।

কলকেটি আগুনের পাতিলের কাছে পড়িল ছিল। কথা বলিতে বলিতে আজাহের তাহাতে তামাক ভরিয়া নিপুণ হাতে তার উপর আগুন সাজাইয়া সা-জী মশায়ের হাতে দিল। সা-জী মশায়ের সামনের রূপা বাধান হুঁকোটির মাথায় কলকেটি বসাইয়া খানিকক্ষণ টানিয়া আজাহেরের হাতে দিল। দুই হাতের আঙ্গুলের মধ্যে কলকেটি সুন্দর করিয়া জড়াইয়া আজাহের সমস্ত শরীরের দম লইয়া গলগল করিয়া কলকেটিতে টান দিল। টানের চোটে কলকের মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাকে মুখে একরাশ খুঁয়ো বাহির করিয়া আজাহের কহিল–”তা বাইবা দেহি সা-জী মশায়। ও বেলা আসপানি।” “অত ভাবিস যদি, কাজ নাই তবে জমি কিনে। আজ বিকালে কালু সেখের আসার কথা আছে। সে যদি আরো কিছু দাম বাড়ায় তবে হয়ত তাকেই দিয়ে ফেলতে হবে। তোর বরাত মন্দ–কি করবো?”

“না, সা-জী মশায়! আমি এক্কে দৌড়ে যাব আর এক্কে দৌড়ে আসপ। আপনি জমিনটা অন্যেরে দিবেন না।”

“আরে হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। কথা যখন একবার তোকে দিয়ে ফেলেছি তখন তুই যদি জমি নিস অন্য কাউকে দিব না। তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে আয়।”

আজাহের সা-জী মশায়কে সালাম করিয়া তাড়াতাড়ি টাকার জন্য বাড়িতে ছুটিল।

জীবন ভরিয়া আজাহের মানুষের কাছে শুধু ঠকিয়াছে। কতবার সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে–আর সে মানুষকে বিশ্বাস করিবে না। নিজের প্রাপ্য একটি কানাকড়িও সে কাউকে

ছাড়িয়া দিবে না। কিন্তু হতভাগ্য আজাহের জানে না, এই পৃথিবীতে যাহারা ঠকাইয়া বেড়ায়, নিত্য নিত্য তাহারা নিজেদের পোশাক বদলাইয়া চলে, ধর্ম নেতার বেশে, সাধু-মহাজনের বেশে, গ্রাম্য মোড়লের বেশে, কত ছদ্মবেশেই যে এই ঠকের দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মূর্খ আজাহের কি করিয়া তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে? এ-পথে সাপিনীর ভয় ওপথেতে বাঘে খায়। এই ত জীবনের পথ।

বাড়ি হইতে টাকা লইয়া আসিতে আসিতে আজাহেরের মনে দু'একবার যে সা-জী মশায়ের সাধুতার প্রতি সন্দেহ না হইল তাহা নহে, কিন্তু এমন ধার্মিক লোক, এমন মিষ্টি যার মুখের কথা, এমন ধোপ-দোরস্ত পোশাক পরিয়া যে সব সময় ফেরে তার প্রতি কি সত্য সত্যই সন্দেহ করা যায়? নিজের মনে মনে সে তাহার সাধুতার প্রতি যে সন্দেহ পোষণ করিয়াছে, সে জন্য সে অনুতাপ করিল। সা-জী মশায়ের বাড়ি যাইয়া, চলার মত। আশিটি টাকা সে গণিয়া দিয়া আসিল। না লইল কোন রসিদ পত্র, না রহিল কোন সাক্ষী-সাবুদ!

সা-জী মশায় হাসিয়া বলিল, "তাহলে আজাহের আজ হ'তে তুই জমির মালিক হলি।"

আল্লাদে আজাহেরের বুকখানা দুলিয়া উঠিল। সা-জী মশায়কে সালাম জানাইয়া জোরে জোরে সে পা চালাইয়া বাড়ি চলিল। যাইবার সময় আজাহেরের নাচিতে ইচ্ছা করিতেছিল। সব মিলিয়া এখন তাহার চারি বিঘা পরিমাণ জমি হইল। সেই চারি বিঘা জমিতে আজাহের পাট বুনিবে, ধান বুনিবে, সরষে ফলাইবে, মটরশুটি ফলাইবে। তার বউ সেই খেতে এক মাথা ঘোমটা পরিয়া শাক তুলিতে আসিবে।

.

০৭.

সত্য সত্যই আজাহেরের জমিতে সোনা ফলিল। চার বিঘা জমির দুই বিঘাতে সে। পাট বুনিয়াছে আর দুই বিঘাতে ধান। পাটের ডগাগুলি যেন ল্যাক ল্যাক করিয়া আকাশ ছুঁইতে চায়। আর তার জমিতে যা ধান হইয়াছে, আকাশের মেঘভরা আসমানখানা কে তাহার জমিতে লেপিয়া দিয়াছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ চলিয়া গেল। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে খেতের শোভা দেখিয়া আজাহেরের আর বাড়িতে আসিতে ইচ্ছা করে না। খেতের মধ্যে একটা ঘাস গজাইলেই সে তাহা নিড়াইয়া ফেলে। তার চার বিঘা জমির উপর দিয়া যখন বাতাস দুলিয়া যায়, তখন তার অন্তরের মধ্যেও ঢেউ খেলিয়া যায়। সমস্ত খেতের শস্যগুলি যেন তার সন্তান। আজাহেরের ইচ্ছা করে, প্রত্যেকটি ধানের গাছ ধরিয়া, প্রত্যেকটি পাটের চারা ধরিয়া সে আদর করিয়া আসে।

সন্ধ্যা বেলায় আজাহের ঘরে ফিরিয়া যায়। ঘরে ফিরিতে ফিরিতেও আজাহের দুই তিনবার তার খেতের দিকে পিছন ফিরিয়া চায়। খেতের শোভা দেখিয়া তার আশ মেটে না। বাড়ি আসিয়া দেখে, বউ রান্না করিতেছে। তার পাশে একখানা পিড়ি পাতিয়া বসিয়া আজাহের বউ-এর সঙ্গে গল্প করিতে বসে। আর কোন গল্প নয়। ধানক্ষেতের গল্প, পাটক্ষেতের গল্প। ও-পাড়ার বরান খা আজ আজাহেরের খেতের আলি দিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গিয়াছে, তোমার খেতে খুব কামিল-কারী করিয়াছে মিঞা! তোমার ধানখেত না যেন সবুজ টিয়া পাখিগুলি শুইয়া আছে।

সেই কথা আজাহের আরো বাড়াইয়া বউ-এর কাছে বলে। শুনিতে শুনিতে বউ-এর মুখ খুশীতে ভরিয়া উঠে।

তারপর গামছার একটি খুঁট খুলিতে খুলিতে আজাহের বলে, "আমার পাটখেতে বউটুবানী ফুল ঐছিল। তোমার জন্যি নিয়া আইলাম।"

ফুলগুলিকে খোঁপায় জড়াইতে জড়াইতে বউ বলে, "ওবেলা যে পাট শাক তুইলা আনবার কইছিলাম, তা আমাগো বাড়ির উনি আনছে নি?"

"দ্যাহ, পাট শাক আমার তুলিতি ইচ্ছা করে না। ওরা যখন বাতাসের সঙ্গে হেইলা ল্যাগ ল্যাগ করে আমার মনে অয়, যিনি ওরা আমাগো পোলাপান। ওগো গায় ব্যথা দিতি মনডা যিনি কেমন করে।"

বউ এবার কতটা লজ্জা লজ্জা ভাব মিশাইয়া বলে, "দেহ, তোমারে একটা কথা কইবার চাই।"

"আমাগো বাড়ির উনি কি কতা কইবার চায় হুনি?"

"না কব না।"

"ক্যান কইবা না! কইতি অবি।"

আজাহের যাইয়া বউ-এর হাতখানা ধরে।

"ছাইড়া দাও। খুব লাগতাছে।"

"না ছাড়ুম না।"

এবার বউ আজাহেরের হাতখানায় কৃত্রিম কামুড় দিতে গেল।

আজাহের বলে, "আইচ্ছা কামড়াও, কুত্তা যখন ঐছ, তহন কামড়াও।"

"কি আমাগো বাড়ির উনি আমারে কুত্তা কইল? আমি কুনু কতা কইব না।"

"না না কুত্তা ঐবা ক্যান? তুমি ঐলা আমার ধানখেত, তুমি ঐলা আমার পাটখেত। তোমারে আমি নিড়ায়া দিব। তোমার গায়ে আমি পানি ঢালব।"

"হ হ বুজা গ্যাছে! তুমি খালি কতার নাগর। সারাদিন খেতে বইসা থাহ। আমার কতা একবার মনেও কর না। কও ত! খালি বাড়ি, আমি একলা বউ থাহি কি কইরা? যাও তুমি তোমার পাট লইয়াই থাহ গিয়া। রাত্তিরি আর বাড়ি আইলা ক্যান?" বলিতে বলিতে বউ কাঁদিয়া দিল।

সত্য সত্যই একথা ত আজাহেরের মনে হয় নাই। গত তিন মাস সে মাঠে মাঠেই কাটাইয়াছে। বাড়ি আসিয়া বউ-এর সঙ্গে খেত-খামারের কথাই আলাপ করিয়াছে। বউ-এর দিন কেমন করিয়া কাটে, সে কেমন আছে তাহার দিকে ত আজাহের একবারও ফিরিয়া তাকায় নাই। কাঁধের গামছার খোটে বউ-এর চোখ মুছিতে মুছিতে আজাহের নিজেই। কাঁদিয়া ফেলিল। সত্য সত্যই ত বউ-এর ঠোঁট দুখানা যেন কেমন নীল হইয়া

গিয়াছে, শরীর যেমন ভার ভার। বউ-এর একখানা হাত নিজের বুকের মধ্যে পুরিয়া আজাহের বলে, “মনি! তুমি রাগ কইর না। আমি চাষা মানুষ। তোমারে কি কইরা আদর-যত্তন করতি অবি তা জানি না। আহারে! তোমার সোনার অঙ্গ মইলান অয়া গ্যাছে। আমি কি করবরে আজ?”

এবার বউ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, “কেমুন তুমারে জব্দ করলাম কি না?”

“আচ্ছা আমি পরাস্ত মানলাম। এবার কও ত সোনা! কি কতা কইবার চাইছিলা?”

“কইলি কি অবি? তুমি বুজবা না।”

“আচ্ছা কওই না একবার?”

“আইজ দুই মাস ধইরা আমার কেবলই গা বমি বমি করে, কিছুই খাইবার ইচ্ছা করে না।”

“তয় এদ্দিন কও নাই ক্যান? আমি এহনি রামে-রাজরে ডাইকা আনবানি, তোমারে ওষুধ করবার জন্যি।”

আজাহেরের মুখে একটা ঠোকনা দিয়া বউ বলিল, “তুমি কিছুই বোঝ না।”

“ক্যান বুঝব না? তোমার অসুখ ঐছে। আমি বুঝব না ত কি বুঝবি? তুমি বইস, আমি রামে-রাজরে ডাইকা আনি গিয়া।”

“আরে শোন? আমার খালি চাড়া চাবাইতে ইচ্ছা করে।”

“তা ঐলি তুমার অসুখ আরো কঠিন। রামে-রাজরে এহনি ডাকতি অবি।”

আজাহেরের মুখে আর একটি ঠোকনা মারিয়া বউ বলিল,–”তুমি ছাই বোঝ।”

এবার বউ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আজাহের ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গামছাখানা মাথায় জড়াইয়া রামে-রাজের বাড়ি যায়ই আরকি। বউ তাহার হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, “শোনই না একবার? আমারে দেইখা ও বাড়ির বু’জী কইছে কি!”

“কি কইছে? কও–কও।”

বউ আর একটু লজ্জিত হাসি হাসিয়া বলিল, “আমি কইবার পারব না। আমার সরম লাগে।”

“আমার সুনা, আমার নককী তুমি আমারে কও। আমার কাছে তুমার সরম কিসির?”

“তবে তুমি আমার মুহির দিগে চাইবার পারবা না। ওই দিগে চাও, আমি কই।”

আজাহের পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, “এই আমি দুই হাতে চোখ বন্ধ করলাম, এবার তুমি কও।”

“তুমি কইলা না? তুমার খ্যাতের ধানগুলান তুমার কাছে কিসির মত লাগে যিনি?”

এবার আজাহের বউ-এর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, “কইলাম ত খ্যাতের ধানগুলা না যেন আমার একখ্যাত ভরা পুলাগুলা নাচত্যাছে।”

বউ আজাহেরের মুখে আর একটা ঠোকনা দিয়া বলিল, “যাও তুমি আমার দিগে চাইতাছ।”

“না না এই যে আমি অন্য দিগে চাইলাম।”

“ও বাড়ির বুজী কইছে কি, আর কয়মাস পরে আমার তাই ঐব।”

“কি কইলা? পুলা ঐব। আমার পুলা ঐব। ও মাতবরের বেটা, হুইনা যান। হুইনা যান। রবানের বাপরে ডাক দেন।”

“আরে চুপ চুপ! মানুষ হুনলি কি কইবি।” বউ তার দুখানা সোনার হাত দিয়া আজাহেরের মুখখানা চাপিয়া ধরিল। কিন্তু আজাহেরের মনের তুফানে সেই সুন্দর হাত দু’খানা কোথায় ভাসিয়া গেল। ডাক শুনিয়া মিনাজদ্দী মাতবর আসিয়া উপস্থিত হইল। রবানের বাপ আসিয়া উপস্থিত হইল। বউ ত লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়। সেদিকে আজাহেরের কোন খেয়ালই নাই।

“কি আজাহের খবর কি?”

“বসেন মাতবর সাহেব। খবর বড় ভাল খবর। আমাগো ও-পাড়ার বচন মোল্লারে ডাক দিতি অবি। রহিমদ্দী কারিকররেও ডাকতি অবি?”

"ক্যান মিঞা! লগনডা কি?"

"লগন আর কি! আমার বাড়িউয়ালী, কইবার ত চায় না। অনেক নিরায়া পিরায়া করতি করতি তয় কইছে, আর একমাস পরে আমার একটা পুলা অবি!"

বউ রান্নাঘরের ও-পাশ হইতে আজাহেরকে কত রকম ইসারা করিতেছে সেদিকে আজাহেরের খেয়ালই নাই।

"বুজছেন নি মাতবরের পো? আমার একটা পুলা অবি! খ্যাতে যহন দুইপার বেলা। তিষ্টাতে ছাতি ফাঁইটা যাইতি চাবি তহন আমার পুলা পানির বদনা নিয়া খ্যাতে যাবি। তামুক সাইজা নিয়া হাতে উক্কা দিবি। পুলার হাতে লাঙলের গুটি সইপা দিয়া একপাশে দাঁড়ায়া তামুক খাব আর পুলার হাল বাওয়া দেখপ।"

"খুব খুশীর কতা আজাহের। তবে আইজ খুশীর দিনি তোমার বাড়ি একটু গান-বাজনা ওক। খাড়াও, আমি গেরামের সগলরে ডাক দিয়া আনি! তুমি পান-তামুক জোগার কর।"

আধঘণ্টার মধ্যে আজাহেরের সমস্ত বাড়িখানা ভরিয়া গেল। ও-পাড়া হইতে রহিমদ্দী কারিকর আসিল। বচন মোল্লা আসিল। তিলাজুদ্দী, ভুমুরদ্দী কেউ কোথাও বাদ রহিল না। খুঞ্জরীর বাজনায় আর গ্রাম্য-গানের সুরে সমস্ত গ্রামখানা নাচিয়া উঠিল।

প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত গ্রামবাসীরা আনন্দ কোলাহল করিয়া যার যার বাড়ি চলিয়া গেল।

আজাহেরের মুখে ঠোকনা মারিয়া বউ বলিল, “বলি আমাগো বাড়ির উনির কি লজ্জা সরম একেবারেই নাই? এত লোকের মধ্যে ওই কথা কইল, সরম করল না?”

“সরম আবার কিসের? আমাগো পুলা অবি। তা সগলরে জানাইয়া দিলাম। আমি এবার পুলার বাপ। ও-পাড়ার ঝড়! এতটুকুন ছাওয়াল, আমারে ডাকে, ও আজাহের! হুইনা যাও। ইচ্ছা করে যে মারি এক থাপর তার মুখ পাইচা। আমি যেন কেউকেডা নয়। এবার মানষি জানুক আমি পুলার বাপ। আমার গুণে যদি আমারে মানতি না চায় আমার পুলার গুণে মানবি।”

“পুলা হওয়ার আগেই ত তুমি অহঙ্কারে ফাঁইটা পড়লা। আগে পুলা হোক ত।”

তারপর দুইজনে বিছানায় শুইয়া গলাগলি ধরিয়া কথা আরম্ভ হইল। এবার পাট বেচিয়া আজাহের পুলার পায়ের ঝাজ কিনিয়া আনিবে। নারকেল গাছের পাতা দিয়া ভেপু বাঁশী বানাইবে। বউ পুলার কাথার উপর বিড়াল আঁকিয়া রাখিবে। পুলা দুধের বাটি মুখে দিতে দিতে বলিবে,–”ওমা! বিলাই খেদাইয়া যাও। আমার দুধ খায়া গেল।”

আজাহের বলে, সে পুলার জন্য শোলা কাটিয়া পাখি বানাইয়া দিবে। পুলা তার মাকে ডাকিয়া বলিবে,–”ওমা! আমারে ত খাইবার দিলা। আমার পাখিরে ত দিলা না?”

এমনই কত রকমের কথা। পুলা বড় হইয়া খেত হইতে ধান টোকাইয়া আনিবে। মাকে আসিয়া বলিবে, “ওমা! এখুনি আমারে এই ধান দিয়া পিঠা বানায়া দাও।”

এমনই কথায় কথায় কখন যে রাত কাটিয়া গেল, তাহারা টেরও পাইল না।

.

০৮.

আষাঢ় মাসের পরে শাওন মাসের মাঝামাঝি ঘন বৃষ্টি পড়িতেছে। চারিদিক অন্ধকার করিয়া আকাশ ভরা মেঘ। বর্ষার জল আসিয়া সমস্ত গ্রামখানাকে ভরিয়া তুলিয়াছে। আউস ধানের খেতগুলিতে কে যেন সোনা ছড়াইয়া দিয়াছে।

কলার ভেলাখানি লগিতে ঠেলিতে ঠেলিতে আজাহের তাহার খেতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোটা মোটা আউস ধানের ছড়াগুলি এক হাঁটু পানির উপরে মাথা তুলিয়া বাতাসে দুলিয়া সুগন্ধ ছড়াইতেছিল। এদের প্রত্যেকটি ধানের গুচ্ছের সঙ্গে আজাহেরের পরিচয় আছে। ওরা এতটুকু ছিল। নিড়াইয়া কুড়াইয়া সে তাহাদের এতবড় করিয়াছে। আর দুই তিনদিন যদি বর্ষার পানি না বাড়ে তবে আজাহের আঁটি আঁটি ধান কাটিয়া বাড়ি লইয়া যাইবে। খেতের মধ্যে কোথা হইতে কতকগুলি আগাছা পানা আসিয়া জড় হইয়াছে। সে একটি একটি করিয়া পানা তুলিয়া তাহার ভেলায় আনিয়া জড় করিতে লাগিল। সেইগুলি সে অন্যত্র ফেলিয়া দিবে।

এমন সময় শরৎ সাহা একখানা নৌকায় করিয়া আট দশজন কামলা লইয়া খেতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

“সা-জী মশায় স্যালাম।” আজাহের সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করে, “তা কি মনে কইরা?”

"এই এলাম দেখতে খেতের ধানগুলো পেকেছে কিনা। ওরে, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কেটে ফেল, কেটে ফেল ধানগুলো।"

আট দশজন কামলা কাস্তে লইয়া ধান কাটিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ আজাহের কোন কথাই বলিতে পারিল না। তাহারই খেতের ধান অপরে কাটিয়া লয়। কিন্তু কি করিয়া প্রতিবাদ করে আজাহের তাহাও জানে না।

শরৎ সাহা তাহার পুরাতন চশমা জোড়া চাঁদরের খোটে মুছিতে মুছিতে তাহার লোকজনদের বলে, "ওরে তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। একদিনের মধ্যেই সমস্ত ধান কেটে নিয়ে যেতে হবে। এখন কলিকালের দিন ত। কে কোথা থেকে এসে বাধা দেয় বলা ত যায় না।"

নিজের খেতের ধানগুলি উহারা লইয়া যাইতেছে। কাস্তের আঘাতে ধানগুলি খসখস করিয়া কাটিতেছে। আজাহেরের বুকের ভিতরে যাইয়া যেন কাস্তের আঘাত লাগিতেছে। সে হঠাৎ খেতের মাঝখানে আসিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। "দোহাই সা-জী মশায়! আমার খেতের ধান কাটপেন না।"

শরৎ সাহা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, "শুনছ কামলা মিঞারা! কইলাম না? কলিকাল কাকে বলেছে? তোর জমিতে আমি ধান কাটতে এসেছি। তোর জমি? তোর দখলে আছে? পরচা আছে? আরে আজাহের! কলিকাল হ'লেও ধরাটাকে সরা জ্ঞান করা যায় না। আজ আশি বছর ধরে আমার বাবার আমল থেকে এই জমি ভোগ-দখল করছি। আর আজ তুই এসে বলছিস, এ জমি আমার!"

আজাহের এ কথার আর কি জবাব দিবে? সে শুধু বলিল, "সা-জী মশায়! আপনারা ভদ্দর লোক, মুখি যা বলেন তাই লোকে বিশ্বাস করবি। কিন্তুক আইজও রাইত দিন বইতাছে। কন ত দেহি গত সন ভাদ্র মাসে চার কুড়ি টাহা নিয়া এই জমি আমারে দিছিলেন কিনা? উচা মুখে নিচা কথা কইবেন না।"

সা-জী মশায় কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "শোন কামলা মিঞারা। আশি টাকায় দুই বিঘা জমিন ওরে আমি দিয়েছিলাম? দুই বিঘা জমির দাম দু'শ টাকা। ও আমার নাত জামাই কি না, সেই খাতিরে ওকে আশি টাকায় জমি দিয়েছিলাম।"

"দিছিলেন না সা-জী মশায়? কইছিলেন না? এখন আশি টাকা দে, আগামী সন পাট বেইচা বাকি কুড়ি টাকা দিস। আমি চলার মতন চার কুড়ি টাহা আপনারে গইনা দিয়া আইলাম।"

এইসব কথা শুনিয়া কামলারা ধান কাটা রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শরৎ সাহা তাদের তাড়া দিয়া বলিলেন, "আরে মিঞারা! শীগগীর শীগগীর কর। দেখছ না কোথাকার বাতাস কোথায় গিয়ে লাগে?"

কামলারা আবার কাজ আরম্ভ করিল। আজাহের সা-জী মশায়ের পা দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সা-জী মশায়! আপনারও যদি জমিন অয়, আমি ত ধান বুইনাছি। সারা বছর কি খায়া থাকপ? অর্ধেক আমার জন্য রাইখা যান।"

সা-জী মহাশয় পা দিয়া আজাহেরকে ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি খাবে তার খবর কি আমি রাখব? জমি চাষ করেছ। আমার কাছ থেকে গত বছর পনর টাকা কর্জ নিয়েছিলে। তারই সুদে তুমি আমার জমি চাষ করেছ।"

কামলারা ধান কাটিতেই ছিল। আজাহের এবার তাহাদের সামনে আসিয়াই দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই দিছি কোম্পানী বাহাদুরের, দোহাই মহারাণী মার। মিঞারা তোমরা আগগাওরে, আমার জমির ধান কাইটা নিয়া গ্যাল। ও মাতবরের পো! ও বরান খাঁ। তোমরা আগগাও–আমার জমির ধান কাইটা লয়া গেল।"

চীৎকার শুনিয়া মিনাজদ্দী মাতবর নৌকা বাহিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নৌকায় দশ বার জন লোক। বরান খাও কলার ভেলা বাহিয়া আসিল।

আজাহের এবার আরো জোরে জোরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই দিছি কোম্পানীওয়ালার, দোহাই দিছি ইংরাজ বাহাদুরের, মিঞারা তোমরা দেইখা যাও, আমার জমির ধান কাইটা নিয়া গ্যাল।"

শরৎ সাহা আস্তে আস্তে তার কামলাদের বলিল, "আরে তোরা এসব কথার মধ্যে থাকবিনে। তাড়াতাড়ি ধান কেটে ফেল। ডবল দাম দিব আজকের রোজের।"

মিনাজদ্দী মাতবর শরৎ সাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি সা-জী মশায়! খবরডা কি?"

"এই যে মাতবর এসেছে, ভালই হয়েছে। তোমরাই এর বিচার কর। তোমরা ছোটলোক হ'লেও তোমাদের মধ্যে ত ন্যায়-অন্যায় বিচার আছে। তোমাকেই সালিস মানলাম তুমি এর বিচার কর।"

"ওমন কথা মুহিও আনবেন না কর্তা। আপনারা ঐছেন মানি লোক। আপনাগো বিচার আমরা করতি পারি? কতাডা কি তাই আগে আমাকে বলেন।"

"শোন তবে বলি মাতবর। জান ত তোমার অনুরোধেই সে বছর আমি ওকে পনর টাকা কর্জ দিলাম। গত ভাদ্র মাসে ও আমাকে যেয়ে ধরল, কর্তা, গরীব মানুষ। এবারকার সুদের টাকা দিতে পারব না। হাতে পায়ে যেয়ে ধরতে লাগল। তখন কি করি! দয়ার শরীর ত। তোমরা আমাকে যাই মনে কর না কেন, কেউ এসে ধরলে আমি আপনা থেকেই গলে যাই। গলে যখন গেলাম তখন আর কি করি? বললাম আমার দুই বিঘা জমি চাষ করে দে, এ বছরে তোর থেকে আর কোন সুদ নিব না। তোমাদের মাতবর! সবাই বলে ছোটজাত। তা ছোটজাত হলেই কি লোকের ধর্ম-জ্ঞান থাকে না। এখন আজাহের বলে যে ওর জমিতে ও ধান বুনেছে। আমি জোর করে সেই ধান কাটতে এসেছি।"

"দেখেন সা-জী মশায়। বারবার আমাগো ছোটজাত কইছেন। আপনারা ত বড়জাত কিন্তুক বড়জাতের মত ব্যবহারডা ত দেখলাম না।"

"মিনাজদ্দী! মুখ সামলায়া কথা কইও। মনে রেখ তুমিও আমার কাছে দু'শ টাকা ধার।"

“মুখ সামলাব কার কাছে মশায়। আপনার ত কুত্তার মুখ। আমি জানি না? গত সন ভাদ্র মাসে এই বেচারী গরীব মানষির কাছ থাইকা আশি টাহা নিছেন জমির দাম। আইজ কইবার আইছেন জমি আপনার। দয়ার শরীর আপনার, জমিটা এরে দয়া কইরাই বুনবার দিছেন! আজ দয়া কইরাই গরীব মানষীর মুখির বাত কাইড়া নিবার আইছেন। এ জমির ধান আপনারে কাটপার দিব না।”

“দেখ মিনাজদ্দী! সাপ নিয়ে খেলা খেলছ–মনে রেখ। সদর কোর্ট, দেওয়ানী আদালত। মনে যেন থাকে। বড়শি দিয়ে টেনে এনে তবে নাগরদোলায় চড়াব।”

“আরে মশায়! দেখাওগ্যা তোমার দেওয়ানী আদালত। আমাগো আদালতের বিচারডা আগে কইরা নেই। আজাহের! চহি দেখতাছ না? ধান কাটপার লাইগা যাও।”

মিনাজদ্দী মাতবরের লোক আজাহেরের সঙ্গে ধান কাটা আরম্ভ করিয়া দিল।

শরৎ সাহা খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া তাহার লোকজন লইয়া চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই মিনাজদ্দী মাতবরের লোক আজাহেরের খেতের সমস্ত ধান একদিনেই কাটিয়া আনিল। আজাহেরের সমস্ত বাড়িখানা ধানে ভরিয়া গেল। আজাহের উঠানের এক পাশে ধানগুলি পরিপাটি করিয়া সাজাইল! সমস্ত বাড়িখানা নতুন ধানের গন্ধে ভরিয়া গেল। আজাহের একবার ধানের পালার দিকে চাহে আর একবার পাকা ধানেরই মত গায়ের রঙ তার বউয়ের দিকে চাহে। বউ-এর আজ মোটেই অবসর নাই। ধান উড়াইতে, ধান রোদে দিতে, কোন দিক দিয়া যে বেলা কাটিয়া যায় তা বুঝিতেও পারে

না। বর্ষার দিনে যখন তখন মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামে। তাড়াতাড়ি উঠানের ধানগুলি ঘরে আনিতে হয়। এত যে কাজ তবু তার এতটুকু পরিশ্রম হয় না।

সময় মত খাওয়া হয় না। সুন্দর করিয়া খোঁপা বাঁধা হয় না। বউ-এর সারা গায়ে ধানের কুটো জড়ানো। মাথার চুলে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান ঝুলিতেছে। এগুলিতে আজ তাকে যা মানাইয়াছে! আজাহের ভাবে সোনা-রূপার গহনা পরিয়া সাজিয়া গুঁজিয়া যদি বউ থাকিত তাতেও তাকে অতটা মানাইত না।

ধান কাটা হইতে না হইতে পাট আনিয়া আজাহের বাড়িতে জড় করিল।

এই সব কাজকর্মে আজাহের শরৎ সাহার ভয় দেখানোর কথা সমস্তই ভুলিয়া গেল। গত বছর পাট বেচিয়া আজাহের ঠকিয়াছিল। এবার সে কিছুতেই ঠকিবে না। গ্রামের ফড়িয়া, পাটের বেপারীরা–নানা রকম গাল-গল্প করিয়া আজাহেরের প্রশংসা করিয়া বৃথাই ফিরিয়া গেল। আজাহের সমস্ত পাট মাপিয়া পাঁচ সের করিয়া ধড়া বাঁধিয়া মিনাজদ্দী মাতবরের নৌকায় করিয়া ফরিদপুরের হাটে যাইয়া পাট বেচিয়া আসিল। এবার পাট বেচিয়া আজাহের পাঁচশত টাকা পাইল। এই টাকা আনিয়া সে একটা মাটির হাঁড়িতে আবদ্ধ করিয়া হাঁড়িটা ঘরের মেঝেয় গাড়িয়া রাখিল।

.

০৯.

সেদিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। গ্রামের দুই তিনজন লোকের সঙ্গে আজাহের ঘরের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিল আর পাটের দড়ি পাকাইতেছিল। এমন সময় আচকান পায়জামা পরা দুইজন যুবক মৌলবী আসিয়া ডাকিল,–"আজাহের মিঞা! বাড়ি আছেন নাকি?"

আজাহের তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যাইয়া পাড়ার একটা ছোকরাকে কি যেন বলিল। সেই ছোকরাটি আওগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজাহের মিঞারে কি জন্যি।"

মৌলবী দুইজন বলিলেন, "আমরা পীরপুরের মৌলানা সাহেবের তালেব-এলেম। মৌলানা সাহেব এদেশে তছরীফ আনছেন। সেই জন্য আজাহের মিঞারে খবর বলতে আইলাম।"

আজাহের ঘরের মধ্য হইতে সমস্তই শুনিতেছিল। সে যখন বুঝিতে পারিল উহারা মৌলবী সাহেবের লোক, শহর হইতে পরওয়ানা লইয়া কোন পেয়াদা আসে নাই তখন সে তাড়াতাড়ি আসিয়া তালেব-এলেমদের সামনে দাঁড়াইল। তাঁহারা আচ্ছালামু আলায়কুম বলিয়া আজাহেরের হাত ধরিয়া দরূদ পড়িল। এমন সম্মানের সহিত আজাহেরের সঙ্গে কেহই ব্যবহার করে নাই। আজাহের মৌলবীদের ব্যবহারে একেবারে মোহিত হইয়া গেল। মৌলবীদের মধ্যে যে একটু বড় সে আজাহেরের মুখের কাছে হাত ছোঁয়াইয়া সেই হাত চুম্বন করিয়া কহিলেন, "গ্রামে আসতেই খবর শুনলাম, আজাহের মিঞা, তা নামেও যেমনি কামেও তেমনি। আপনার মতন ভাগ্যবান লোক দুনিয়ায় হয় না।"

দ্বিতীয় মৌলবী আরবী হইতে সুর করিয়া একটা শ্লোক পড়িলেন, "খোদাওয়ান তায়ালা জাল্লা জালালুহু কোরান শরীফ মে ফরমাইয়াছেন,–"আয়ুর্যেবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম। অর্থাৎ কিনা যে নাকি পরহেজগার নেকবক্ত আল্লাহ তায়ালা হঠাৎ তার কপালডারে খ্যাডেড় পালাডার মত উচা কইরা দেন।"

বড় মৌলবী তার সুর আরো একটু চড়া করিয়া পড়িলেন, "আলহামদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন আর রহমানের রহিম মালেকে ইয়াউমেদ্দিন।"

অর্থাৎ কিনা, আমার খোদাওয়ান করিম বলেছেন–হে আমার বান্দাগণ, আমার যদি হুকুম না হয় তবে হস্তি দিয়াও তুমি মাকড়ের আঁশ ছিড়বার পারবা না।

খোদাওয়ান তায়ালা আরো বইলাছেন, আমার যদি হুকুম না হয় তবে বন্দুক দিয়া দ্যাওড় কইরা কাতরা, লাঠি, কুড়াল মাইরা একটা বনের মশারেও তুমি মারবার পারবা না।" এই পর্যন্ত বলিয়া বড় মৌলবী সাহেব হাঁপাইতে লাগিলেন।

ছোট মৌলবী সাহেব আবার আরম্ভ করিলেন, "আমার খোদা জাল্লা জালালাহু পাক পরওয়ারদেগার আরো ফরমাইয়াছেন, হে আমার বান্দাগণ আমি যদি ইচ্ছা করি, আমার যদি দিলে কয় তবে আকাশের চান্ডার উপরে আমি একজন পথের ফকিরকে বসাইতে পারি।"

প্রথম মৌলবী এবার তছবীহ জপিতে জপিতে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। "দেখ মিঞা আজাহের! খোদা আইজ তোমারে মুক তুইল্যা চাইলেন। আকাশের চান-সুরুজ আইনা

তোমার হাতে দিলেন। গ্রামের সকল লোক তোমার নছিবের জন্য হিংসা করবি।” আজাহের সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিতেছিল,–কি সৌভাগ্য আজ তাহার হইল।

দ্বিতীয় মৌলবী এবার খুব জোরে জোরে খানিক মোনাজাত করিয়া বলিলেন,–”দেখেন মিঞা আজাহের! আজ পিরান পীর ছৈয়দে মক্কা-মদীনা শাহসুফি মোহাম্মদ তজুম্বর আলি খাকসার সাহেব জনাবে নিজামুদ্দীন আলায়হে ছালাম পীরপুরী আপনার বাড়িতে তছরীফ আনত্যাছেন। পীর সাহেবের বজরা শরীফ বাদামতলীর ঘাট হইতে রওয়ানা হইয়া আপনার বাড়ির দিক আসত্যাছেন।”

দ্বিতীয় মৌলবী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “দেখেন মিঞা আজাহের! খোদার। তারিফের কি খুবী, ঐ গেরামে আরো তো কত আলেম, ফাজেল, জমিদার, জোদ্দার। সাহেবান আছেন। তারা সকলেই পীর সাহেবকে পাইলে তোলা তোলা চান্দি রূপার মত তানারে মাথায় করিয়া নিয়া যাব্যানে।”

প্রথম মৌলবী হাতের তছবীর মালাটি চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ও গিরামের গৈজদ্দী খালাসী কাইল পীর সাহেবের দুই পা জড়ায়া ধইরা কত কানতে লাগলেন। পীর সাহেব! একটু পায়ের ধূলি আমার বাড়িতে দিয়া যান। পীর সাহেব রাজী হইলেন না। কিন্তু আপনার কি ভাগ্য যে বিনি দাওয়াতে পীর সাহেব আজই আপনার বাড়িতে তছরীফ আনত্যাছেন। ওই যে ধলা জল-পিংলাসের নাও সাজায়া পীর সাহেব আসত্যাছেন। জলদী বাড়ির ভিতর যান। পীর সাহেবের জন্য সামিয়ানা তয়ার করেন গ্যা।”

www.bengaliebook.com

এই সব শুনিয়া আজাহেরের মন আনন্দে মশগুল হইয়া গেল। সত্যই ত কত বড় সৌভাগ্য তার! সে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর যাইয়া তিনটি মুরগী জবাই করিয়া ফেলিল। বউকে তাড়াতাড়ি ভাত রাধিতে বলিয়া দিল। মিনাজদ্দী মাতবরের বাড়ি হইতে হাতল ভাঙ্গা চেয়ারখানা আনিয়া পীর সাহেবের বসার জায়গা করিল। পীরপুরের মৌলানা সাহেব আজাহেরের বাড়িতে আসিতেছেন। এ খবর শুনিয়া গ্রামের আরো আট দশজন লোক তাহার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পীর সাহেবের প্রেরিত তালেবে-এলেম দুইজন। তাহাদের সকলেরই হাতে হাত মিলাইয়া দরূদ পড়িলেন এবং তাহাদের দাড়িতে হাত ছুঁয়াইয়া সেই হাত চুম্বন করিলেন। গ্রামের লোকেরা যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তাহারা। সকলেই স্বীকার করিল, এমন বড় মৌলানা তাহাদের দেশে আর কখনও আসে নাই। সুতরাং আজাহের তাহার গরুর ঘরখানা পরিষ্কার করিয়া খড় বিছাইয়া তাহার উপরে খেজুরের পাটির বিছানা পাতিয়া রাখুক।

শুভক্ষণে মৌলানা সাহেবের বজরা আজাহেরের বাড়ির ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জলপিংলাসের নৌকা কখনও দেখে নাই। তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া নৌকা দেখিতে আসিল। আজাহেরের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড বজরার মধ্যে মৌলানা সাহেব বসিয়া তছবীহ জপ করিতেছেন। পৃথিবীর কোন দিকে তাঁহার খেয়াল নাই। মনে হয় যেন শত শত বৎসর ধরিয়া তিনি এইভাবেই তছবীহ জপ করিতেছেন। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে আজাহের মৌলানা সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল। মৌলানা। সাহেবের গালভরা পাকা দাড়ি, তাহাতে লাল খেজাব মাখা। গায়ে খুব দামী সিল্কের পোশাক। এতবড় লোক আজ তাহার বাড়িতে তছরীফ আনিয়াছেন। তালেব-এলেমরা আজাহেরের কানে কানে আসিয়া কহিল, “আজাহের মিঞা! শিগগীর যায়া থালির উপরে

পান আর দশটা টাকা মৌলবী সাহেবের সামনে নজর ধরেন, এতবড় মৌলানা তানার মান। ত রাখতি অবি।”

সুতরাং পাট বেচা টাকা হইতে দশটি টাকা লইয়া আজাহের তাহার মাটির সানকির। উপরে রাখিল। তার পাশে কয়েকটি পান সাজাইয়া আজাহের মৌলানা সাহেবের সামনে আসিয়া নজর ধরিল। মৌলানা সাহেব একটু মৃদু হাস্যে আজাহেরকে করুণা করিয়া টাকা দশটি জায়নামাজের পাটির একপাশে রাখিয়া দিলেন। তারপর আগেরই মত কোরান পড়ায় মন দিলেন, যেন দুনিয়াদারীর কোন খেয়াল রাখেন না। সাকরেদ দুইজন চোখের ইসারায় আজাহেরকে দেখাইলেন, কত খোদাপরস্ত তাঁহাদের পীর সাহেব।

মৌলানা সাহেবের সাগরেদদের উপদেশ ও পরামর্শে দুপুরের আহারটা মৌলানা। সাহেবের উত্তম রকমেরই হইল। রাতে মৌলবী সাহেব ওয়াজ করিবেন। মিনাজী মাতবরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আজাহের দুই গ্রামের সকল লোক দাওয়াৎ করিয়া

আসিল। রাতে আজাহেরের উঠানের উপর চাদোয়া টাঙান হইল। তাহার তলে পীরান পীর মৌলানা সাহেব মৌলুদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। চারি পাশে গ্রামের লোকেরা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে মৌলবী সাহেবের ওয়াজ(বক্তৃতা) শুনিতে লাগিল। প্রথমে তিন চারি জন তালেব-এলেম লইয়া মৌলবী সাহেব আরবী এবং ফারসীতে গজল পড়িলেন। তারপর সুদীর্ঘ মোনাজাত করিয়া মৌলবী সাহেব আরম্ভ করিলেন, “খোদা তায়ালা জাল্লা জালালুহু পাক পরওয়ারদেগার কোরান শরিফমে ফরমাইছে,“–এই পর্যন্ত বলিতেই গায়ের একটি বৃদ্ধ লোক আহা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মৌলানা সাহেব তাহার প্রতি একটা শুভ দৃষ্টিপাত করিয়াই আবার আরম্ভ করিলেন,– “আমার খোদা কি

ফরমাইয়াছেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের বাড়িতে কোন মৌলবী আসিয়া উপস্থিত হন, তানি মাথায় করিয়া খোদার রহমত নিয়া আসেন। তখন কি হয়? চারজন। ফেরেস্তা একটা বেহেস্তি চাঁদরের চার কানি ধরিয়া সেই গেরস্তের বাড়ির উপরে আসিয়া দাঁড়ায়। গৃহস্থ যদি মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার সঙ্গে আচ্ছালামু আলায়কুম না করে তবে কি হয়? ওই যে চারজন ফেরেস্তা চাঁদরের চার কানি ধরিয়া রাইখ্যা ছিল, তার একজন চাঁদরের এক কানি ছাইড়া দেয়। তারপর যদি গৃহস্থ ওজুর পানি ও জায়নামাজের পাটি আইনা মৌলবী সাহেবের সামনে না ধরে, তবে দ্বিতীয়। ফেরেস্তা চাঁদরের আর এক কানি ছাইড়া দিয়া যায়। তারপর গৃহস্থ যদি তাজিমের সাথে মৌলবী সাহেবের সামনে খানাপিনা না ধরে অর্থাৎ কিনা মুরগী জবাই কইরা খুব ভালমত তাকে না খাওয়ায়, তখন তৃতীয় ফেরেস্তা চাঁদরের আর এক কানি ছাইড়া দিয়া যায়। শোনেন মিঞা সাহেবরা, আমার কথা নয়, আমার খোদা বইলাছেন, তারপর সেই গৃহস্থ যদি মৌলবী সাহেবের সামনে কিছু নজরানা না দেন তখন সেই চতুর্থ ফেরেস্তা কাতে কাতে বলে, "হারে কমবক্ত! তোর বাড়িতে আমার মৌলবী সাহেব বেহেস্তি নিয়ামত নিয়া আইছিল তুই তারে খালি হাতে বিদায় করলি! যদি তার হাতে এক টাকাও ভইরা দিতি আমার খোদা তোরে রোজহাশরের বিচারের দিন সত্তর টাকা বকশিশ করত। এই বইলা ফেরেস্তা কানতি কানতি চইলা যায়।" এই পর্যন্ত বলিয়া মৌলানা সাহেব বাম হস্তের রঙীন গামছা দিয়া চোখ মুছিলেন। সভার মধ্যে বৃদ্ধ দুই একজন লোকও মৌলবী সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছিলেন। মৌলবী সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন, "শোনেন মোমিন মুসলমান ভাইরা–শোনেন আমার ঈমানদার ভাইরা! আবার মৌলবী সাহেবকে যদি কেউ একটা ছাতি দান করেন–রোজ কেয়ামতের দিন সেই ছাতি তাহার মাথার উপরে ঝুলতি থাকবি। এখানকার সূর্যের সত্তর গুণ গরম লইয়া সে দিন মাথার উপরে

সূর্য উঠপি। এখানকার সূর্য আসমানের উপরে জ্বলে কিন্তু সেদিনকার সূর্য মাথার আধ হাত উপরে জ্বলবি। শোনেন ভাই সাহেবরা, আমার মৌলবী সাহেবরে যিনি আজ ছাতা দান করবেন। সেদিন তাহার মাথায় সেই ছাতা শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়বি। একটুকও গরম লাগবি না। শোনেন আমার ঈমানদার ভাইরা, মৌলবী সাহেবরে যে একজোড়া জুতা দান করবি, পুলছুরাতের পুলের উপর দিয়া সে যখন চলবি তখন ওই জুতা আইনা ফেরেস্তারা তার পায় পরাইয়া দিবি। সেই জুতা পায় দিয়া সে অনায়াসে পুলছুরাতের চুলের সেতু পার হইয়া যাবি।” এই পর্যন্ত বলিয়া মৌলবী সাহেব হাঁপাইতে লাগিলেন। তালেম এলেমরা সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন :

“মৌলবীর মফেলতে মোমবাতি চাহিরে,
মৌলবীর মফেলতে আতর গোলাপ চাহিরে।
মৌলবীর মফেলতে ছোরমাদানী চাহিরে,
মৌলবীর মফেলতে নজরানা চাহিরে।”

কিছুক্ষণ বাদে হাতের ইশারায় তাহাদিগকে থামাইয়া দিয়া মৌলবী সাহেব আবার ওয়াজ করিতে আরম্ভ করিলেন, “খোদা ওয়াতায়ালা জাল্লা জালালুহু পাক পরওয়ারদেগার কোরান শরিফমে ফরমাইয়াছেন, ”হে আমার বান্দাগণ, তোমরা কখনও আমার মৌলবী সাহেবের কথার অবহেলা করিবে না। যদি মৌলবী সাহেবকে অবহেলা কর তবে আমি তোমাদিগকে কখনও ক্ষমা করিব না। মৌলবী সাহেব হইল আমার নায়েবে-নবী। নায়েবে-নবী কারে কইছে? আমার ভাইরা একটু খেয়াল করিয়া শুনবেন। যেমন আপনারা দেখছেন মহারাণীর চৌকিদার। এই চৌকিদারকে যদি কেহ অমান্য করে, প্রথমে দারগা তাহার বিচার করব, দারগা যদি না করে হাকিম তাহার বিচার করব,

হাকিম যদি না করে ছোটলাট তাহার বিচার করব, ছোটলাট যদি বিচার না করে বড়লাট তাহার বিচার করব, বড়লাট যদি না করে মহারাণী নিজে আসিয়া তার বিচার করব। তা হইলে বোঝেন ভাই সাহেবরা, চৌকিদার যদি অপমান হৈল, দারগা অপমান হৈল, ছোটলাট অপমান হৈল, বড়লাট অপমান হৈল, মহারাণী নিজেও অপমান হৈল। এইরূপ নায়েবে-নবী হইলেন মৌলবী সাহেব।”

এই পর্যন্ত বলিয়া মৌলবী সাহেব একটা গল্প আরম্ভ করিলেন : একজন চাষী লোকের বাড়ি কবে একজন মৌলবী যাইয়া উপস্থিত। চাষী তাহাকে ভালমত আদর না করাতে মৌলবী সাহেব বেজার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহাতে সে বছর চাষীর খেতে ফসল হইল না। চাষীর পাঁচটি গরু আছড়াইয়া মরিয়া গেল। তারপর চাষীর বউ কি করিয়া সেই মৌলবী সাহেবকে দাওয়াৎ করিয়া আনাইল, কি করিয়া মৃত বলদগুলির প্রাণ দেওয়াইল এই সকল কথা মৌলবী সাহেব সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। কখনও কাঁদিয়া কখনও হাসাইয়া সমস্ত আসরকে তিনি যেন নিজের হাতের ক্রীড়নক করিয়া তুলিলেন। প্রায় শেষ রাত্রে আজাহেরের বাড়িতে মৌলুদের বৈঠক ভাঙিল। সমবেত লোকেরা আহার করিয়া যার যার বাড়ি চলিয়া গেল। আজাহের তাহাদের খাওয়ার এত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিল সে সকলের প্রশংসা তাহারা একবার মুখেও আনিল না। সকলের মুখেই মৌলবী সাহেবের তারিফ। এমন জবরদস্ত মৌলানা তাহারা জীবনে কখনও দেখে নাই। এমন অপূর্ব আওয়াজ তাহারা কখনও শোনে নাই। সুতরাং এ-বাড়িতে সে-বাড়িতে মৌলবী সাহেবকে আরো কয়েকদিন নিমন্ত্রণ রাখিতে হইল। গরীব গাঁয়ের লোকেরা সাধ্যের অতীত অর্থ আনিয়া মৌলবী সাহেবের নজরানা দিয়া সস্তায় বেহেস্তের পথ প্রসার করিয়া লইল। যদিও অপরিচিত জেলার লোকেরা মৌলবী সাহেবের জন্য ঘন ঘন পত্র

লিখিতে লাগিলেন তথাপি আশপাশের গ্রামগুলির মুসলমান ভাইদের ঈমানদারীর জন্য মৌলবী সাহেব এখানেই কিছুদিন রহিয়া গেলেন।

উত্তেজনার প্রথম ঝুঁকিটি কাটিয়া গেলে, আজাহের আর তার বউ রাত্রিকালে অতি গোপনে মাটির তলা হইতে কলসীর টাকাগুলি উঠাইয়া গুণিতে বসিল। হায়! হায়! তাহারা করিয়াছে কি? এই কয়দিনে তাহারা তিনশত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। ওদিকে শরৎ সাহার দেনা পড়িয়া রহিয়াছে। সেদিন কেমন করিয়া শরৎ সাহা শাসাইয়া গিয়াছে, যদি সত্য সত্যই নালিশ করিয়া থাকে তবে উপায় হবে কি? অবশ্য মোড়ল তাহাকে অনেক সাহস দিয়াছে কিন্তু সদরের পিয়ন আসিয়া যদি তাহার গরু বাছুর ক্রোক করিয়া লইয়া যায় তখন মোড়ল তাহাকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারিবে?

আজাহেরের বউ-এর চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। "তুমি এমন নামালের কাজ করলা ক্যান। এতগুলি টাকা এই কয়দিনের মধ্যে খরচ কইরা ফালাইলা।" গামছার খোট দিয়া বউ-এর চোখ মুছাইতে যাইয়া আজাহের নিজেও কাঁদিয়া ফেলে। তবু বউকে সান্তনা দেয়, "পরলোকের কাম ত করছি। এক পয়সা খরচ করলি রোজহাশরের ময়দানের দিন সত্তর পয়সা পাব। বউ তুমি কাইন্দ না।" বউ বলে, "পরলোকের জন্যে ত ছবাব কিনলাম। কিন্তু এখন আমরা খাব কি?" পৃথিবীতে যাহারা কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিল না। পরলোকের সঞ্চয়ের স্বপ্ন রচনা করিয়া তাহারা ক্ষণিক সান্তনা লাভ করে। কিন্তু রোজহাশরের ময়দানের সুখ-সুবিধার কথা আজাহের যতই ভাল করিয়া ভাবিতে চায় শরৎ সাহার শাসানির কথা ততই উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনে ভাসে।

.

১০.

সেদিন আজাহের মাঠ হইতে এক আঁটি ঘাস মাথায় করিয়া বাড়ি আসিতেছে, দুর হইতে শুনিতে পাইল তাহার ঘরে ছোট শিশুর ক্রন্দন। এমন সুর যেন আজাহের কোনদিন শোনে নাই। শিশুর মিষ্টি কান্না যেন আজাহেরের সকল অন্তরখানি ধীরে ধীরে দোলা দিতেছিল। আজাহের যা ভাবিতেছে তা যদি সত্য সত্যই সত্য হয় তবে যে আজাহেরের ভারি লজ্জা করে, সে কেমন করিয়া ঘরে যাইবে। আজাহের ঘাসের বোঝাটি মাটিতে নামাইয়া খানিক আওগাইয়া যায়–আবার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শোনে। আজাহেরের কুঁড়ে ঘরখানি ভরিয়া শিশু-কণ্ঠের কান্নার সুর যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মনের খুশীতে আজাহের আরো খানিক আওগাইয়া যায়। আবার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই কান্না শোনে। কিন্তু তার যে ভারি লজ্জা করিতেছে। কেমন করিয়া সে ঘরে যাইবে! কিন্তু কি এক অপূর্ব রহস্য যেন তাকে রশি বাধিয়া বাড়ির দিকে লইয়া যাইতে চাহে। দু এক পা যায় আজাহের আবার দাঁড়ায়।

শিশু-কণ্ঠের মিষ্টি কান্নায় সমস্ত দুনিয়া ভরিয়া গেল। এবার বুঝি সেই সুর খোদার। আরশ পর্যন্ত ধাওয়া করিবে, আর আজাহের স্থির থাকিতে পারে না। আস্তে আস্তে যাইয়া। তার ঘরের পিছনে কচুগাছগুলির মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া শিশুর কান্না শোনে। ঘরের মধ্যে মিনাজদ্দী মাতব্বরের বউ আসিয়াছে। পাড়া হইতে আরো দুচার জন স্ত্রীলোক আসিয়াছে। উঠানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কৌতূহলী দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এত লোকের মধ্যে আজাহের কেমন করিয়া ঘরে যাইবে? তাহার লজ্জা যেন

শতগুণ বাড়িয়াছে। এমন সময় শিশুর নাড়ি কাটার জন্য বাঁশের নেইলের সন্ধানে আসিয়া মিনাজদ্দী মাতবরের বউ আজাহেরকে সেই কচুগাছের জঙলের মধ্যে আবিষ্কার করিল।

"ওমা, আজাহের! তুমি এহ্যানে পালায়া রইছ, তোমার যে পুলা ঐছে।"

আজাহের তাড়াতাড়ি কচুগাছের আড়াল হইতে উঠিল–বলিল, "য়্যা–পুলা ঐছে। কিন্তুক আমার যে ভারি সরম লাগে!" বাড়ির ভিতরে মেয়েরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলের দল আসিয়া আজাহেরকে ঘিরিয়া ফেলিল। "ও আজাহের চাচা! তোমার পুলা ঐছে।"

"যা! যা! ভারি একটা ইয়া পাইছস তোরা? আমার যে সরম লাগে? তা বুঝতে পারস না।"

ঘোমটার ভিতর থেকে মিনাজদ্দী মাতবরের বউ বলিল, "তা সরম করলি চলবি না। আমাগো ক্ষীর খাওয়াইতি অবি।"

"তা ক্ষীর খাইবা বাবি! তাতে ত আমার আপত্তি নাই। আমি এহনই পাঁচ স্যার কুসাইরা মিঠাই আর দশ স্যার আতপ চাইল কিন্যা আনতাছি–কিন্তুক–" আর বলিতে হইল না। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক পোটলার মত আজাহেরের সেই শিশু পুত্রটিকে আনিয়া তার সামনে ধরিল।

"দেহ আজাহের! তোমার কি সুন্দর ছাওয়াল হইছে!" খুশীতে আজাহেরের নাচিতে ইচ্ছা করিতেছিল। মুখে শুধু বলিল, "আমার যে সরম লাগে ইয়া তোমরা কেওই বুঝবার পার

না।” বাড়ি ভরা মেয়ের দল তখন হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল! আজাহের তাড়াতাড়ি কোমরে গামছা বাঁধিয়া কুসুরে গুড় কিনিবার জন্য বন্দরে ছুটিল।

নতুন শিশু পুত্রটি লইয়া আজাহের আর তার বউ বড়ই মুস্কিলে পড়িল। বাড়িতে বর্ষীয়সী কোন স্ত্রীলোক নাই। কেমন করিয়া শিশুকে দুধ খাওয়াইতে হইবে, কেমন করিয়া তাহাকে স্নান করাইতে হইবে, কিভাবে তাহাকে কোলে লইতে হইবে, কোন সময় কিভাবে শিশুকে শোয়াইলে তাহাকে ডাইনীতে পায় না এসব খবর তাহারা কেহই জানে না। আনাড়ী মাতা শিশুকে দুধ খাওয়াইতে যাইয়া তার সমস্ত গায় দুধ জড়াইয়া দেয়, স্নান করাইতে শিশুর নাকে মুখে জল লাগে, সর্দি হয়। বেশী দুধ খাওয়াইয়া শিশুর পেটে অসুখ করে।

দৌড়াইয়া যায় আজাহের রামে-রাজের বাড়ি। তুক-তাবিজের অলঙ্কারে শিশুর সকল অঙ্গ ভরিয়া যায়। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিশুর ভালোর জন্য যে বিধান দেয় দুইজনে অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করে। এইভাবে শিশু দিনে দিনে বাড়িতে থাকে।

এখন তাহারা ঠেকিয়া ঠেকিয়া অনেক শিখিয়াছে। রাত্রে বাহির হইতে আসিয়া ‘শিশুর ঘরে প্রবেশ করিলে শিশুকে প্রেতে পায়! নিমা-সামের কালে শিশুকে বাহিরে আনিলে তাহার বাতাস লাগে। বাতাস লাগিয়া পেটে অসুখ করে। ডাইনী আসিয়া শিশুর সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিলে তাহার জ্বর চমকা লাগে। এ জন্য সাবধানও তাহারা কম হয় নাই।

ঘরের দরজার পাশে একটা মরা-গরুর মাথার হাড় লটকাইয়া রাখিয়াছে। ডাইনীরা তাহা দেখিয়া পালাইয়া যাইবে। কে কখন শিশুকে দেখিয়া নজর দেয়, বলা যায় না ত? সকলের চোখ ভাল না। তাহাতে শিশু রোগা হইয়া যাইতে পারে। উঠানের এক কোণে বাশ পুঁতিয়া তাহার উপরে রান্নাঘরের একটি ভাঙ্গা হাড়ী বসাইয়া রাখিয়াছে। ছেলের দিকে নজর লাগাইলে সেই নজর আবার যদি সেই কালো হাঁড়ীর উপর পড়ে তবে আর তাহাতে ছেলের কোন ক্ষতি হইবে না। ছেলের যাহাতে সর্দি না লাগে সেই জন্য তাহার গলায় একছড়া রসুনের মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শেষ রাত্রে শিশু জাগিয়া উঠিয়া হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে থাকে। শিশুর খলখলানিতে বাপ মায়ের ঘুম ভাঙিয়া যায়। ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া শেষ রাত্রের চাঁদ আসিয়া শিশুর মুখের উপর পড়ে। আজাহের আর তার বউ দুইজনে শিশুর দুই পাশে বসিয়া নীরবে চাহিয়া থাকে। কেউ কোন কথা কয় না, তাদের বুকের যত কথা যেন মূর্তি ধরিয়া ওই শিশুর হাসির রঙে ঝলমল করিয়া তাহার নরম ননির মত হাত পাগুলির দোলার সঙ্গে দুলিয়া সেই এতটুকুন দেহখানি ঘিরিয়া যেন টলমল করিতে থাকে।

দুইজনে দুই পাশে বসিয়া কেবলই চাহিয়া থাকে। নিকটে–দূরে আমবাগান হইতে কোকিলগুলি আড়াআড়ি করিয়া ডাকিতে থাকে। স্কুব স্কুব করিয়া কানাকুয়া ডাকে। আকাশের কিনারায় তারাগুলি সারি বাধিয়া ঝিকমিক করে।

.

আজাহের আর তার বউ শিশুর মুখের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকে। দেখিয়া দেখিয়া আবার দেখিয়া সাধ মেটে না। ।

আকাশের তারাগুলি ভাঙ্গা ঘরের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া চায়। কলা পাতার আড়াল হইতে এক ফালি চাঁদ আসিয়া শেষ রাতের উতল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মুখে নৃত্য করে।

ওরা কি তাদের শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে না কি? না না না। তারার সঙ্গে 'তারা' হইয়া কতকাল তাদের এই শিশুটি আকাশ ভরিয়া খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে। চাঁদের সঙ্গে চাঁদ হইয়া সারা আকাশ ভরিয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। বাঁশী বাজাইয়া সেই চাঁদকে আজাহের ঘরে টানিয়া আনিয়াছে। আজ আকাশ ছাড়িয়া তাই তার ঘরের চাঁদকে দেখিতে আসিয়াছে। চাষার ছেলে আজাহের অতশত ভাবিতে পারে কিনা কে জানে!

কিন্তু এই শিশু পুত্রটির মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সে যাহা ভাবিতেছে তাহা আকাশের তারার চাইতে ঝলমল করে, আকাশের চাঁদের চাইতে ঝিকমিক করে।

ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে আবার দেখিতে রাত শেষ হইয়া যায়। তাদের ঐ শিশুটির মত আর একটি শিশুরবি পূব আকাশের কিনারায় হাসিয়া হাসিয়া রঙীন হইয়া উঠে।

প্রভাতের নতুন আলোয় আজাহের বউ-এর মুখের দিকে তাকায়।

রাঙা প্রভাতের মত লজ্জায় রাঙা হইয়া বউ আজাহেরের দিকে তর্জনী ক্ষেপণ করিয়া বলে, "যাও!"

আজাহের তাড়াতাড়ি উঠিয়া লাঙল লইয়া খেতে ছোটে। বউ ঘর-গেরস্থালীর কাজে মনোযোগ দেয়।

খাকি রঙের জামা

১১.

কোথা হইতে খাকি রঙের জামা পরিয়া কোমরে চাপরাশ আঁটিয়া একটি লোক আসিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামের কুকুরগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল।

কৌতূহলী গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হল্লা করিয়া কলরব করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেই লোকটিকে দেখিয়া গ্রামের সাবধানী লোকেরা ফিস ফিস করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, “আদালতের পিয়ন আসিয়াছে। তোরা পালারে পালা।”

যে যেখানে পারিল পালাইল কিন্তু সেই লুকান-স্থান হইতে সকলেই তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। লোকটির দাপট পদক্ষেপে সকলেরই বুক দুর দুর করিয়া কাপিতে লাগিল।

সারাদিন মাঠের কঠোর পরিশ্রম করিয়া দুপুর গড়াইয়া গেল আজাহের ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত ভাতের থালা সামনে লইয়া কেবল বসিয়াছে, এমন সময় সেই লোকটি তাহার বাড়ির সামনে আসিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, “এক নম্বর আসামী আজাহের বাড়িতে আছ? তোমার নামে সমন আছে।”

অমনি ভাতের থালাখানা সরাইয়া আজাহের মাচার উপর একটা ডোলের মধ্যে যাইয়া পালাইল। ইতিমধ্যে দুই চারজন ছেলে-মেয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আজাহেরের বউ ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহাদিগকে শিখাইয়া দিল, “কয়া দেগা বাড়ি নাই।”

পিয়নকে আর ছেলেদের বলিতে হইল না। সে বাহির হইতে শুনিয়া আরো জোরের সঙ্গে চেঁচাইয়া কহিল, "আজাহের মিঞা এক নম্বর আসামী বাড়ি নাই বলিয়া তাহার নামের সমন লটকাইয়া জারি করিলাম।"

এই বলিয়া একখানা কাগজ ঘরের বেড়ার সঙ্গে আটকাইয়া রাখিয়া সে আরো বীরত্বের সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহার দাপটপদক্ষেপে সমস্ত গ্রাম কাপিতে লাগিল। তাহার চলিবার ভঙ্গী এমনই–সে যেন কোথায় একটা কি ভীষণ কাজ করিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রামের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার পিছন পিছন ছুটিল। পিয়ন চলিয়া গেলে বহুক্ষণ পরে লুকান-স্থান হইতে কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া আজাহেরের বাড়ির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিনাজদ্দী মাতবরও আসিল। তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া আজাহেরের ধড়ে প্রাণ আসিল। সে লুকান-স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সকলের সামনে উপস্থিত হইল। সকলেরই মুখে একই প্রশ্ন ব্যাপার কি?"

আজাহের আনুপূর্বিক সকল ঘটনা বলিল। ঘরের বেড়ার সঙ্গে লটকান কাগজখানাও দেখাইয়া দিল। মোড়ল অনেক গবেষণা করিয়াও সেই কাগজখানা যে কেন পিয়ন রাখিয়া গেল, তাহার কোন কূল-কিনারা করিতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে বচন মোল্লা কিছু লেখাপড়া জানে বলিয়া তাহার কিছু খ্যাতি আছে। ছহি সোনাভান ও জয়গুন বিবির পুঁথি সে সুর করিয়া পড়িয়া গ্রামের লোকদের তাক লাগাইয়া দেয়। সকলে মিলিয়া স্থির করিল বচন মোল্লাকে ডাকাইয়া আনিয়া এই কাগজ পড়াইতে হইবে।

তিন চারজন লোক বচন মোল্লার কাছে ছুটিল। বচন মোল্লা গিয়াছিল ভাটপাড়ার গায়ে দাওয়াত খাইতে। সেখানে যাইয়া তাহারা শুনিল, সে সেখান হইতে গিয়াছে শোভারামপুর তার শ্বশুর বাড়ি। তখন দে ছুট শোভারামপুর বলিয়া, দুই তিন ঘন্টার মধ্যে কৌতূহলী খবরিয়ারা বচন মোল্লাকে লইয়া আসিল। ইতিমধ্যে আজাহেরের বাড়ির সামনে প্রায় পঁচশত কৌতূহলী লোক জড় হইয়াছে। বচন মোল্লা আসিলে তাহাদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। মিনাজদ্দী মাতবর চারিদিক হইতে ভীড় সরাইয়া দিয়া মাঝখানে বচন মোল্লার জন্য জায়গা করিয়া দিল। সেখানে বসিয়া বচন মোল্লা একবার চারিদিকে তাকাইয়া সমবেত লোকগুলি দেখিয়া লইল, মনে যেন এই ভাব, সকলে মনে করে বচন মোল্লা কেউকেটা নয়; এবার দেখুক একখানা চিঠি পড়িতে প্রায় তিন মাইল দূর হইতে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে। সে ছাড়া আর কাউকে দিয়া এ কাজ হইল না।

মিনাজদ্দী মাতবর এবার তাড়াতাড়ি আজাহেরের বেড়ায় লটকান কাগজখানা আনিয়া বচন মোল্লার হাতে দিল। “পড়েন ত মোল্লাজী। এতে কি লেইখাছে?” মোল্লাজী কাগজখানা হাতে লইয়া বেশ নাড়িয়া চাড়িয়া খানিকক্ষণ পড়িবার অভিনয় করিয়া তারপর হাতের গামছাখানা দিয়া মুখ মুছিয়া আবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, “একটু তামুক খাওয়াও।”

অমনি চারি পাঁচজন লোক তামাক সাজিতে ছুটিয়া চলিল। অনেকক্ষণ তামাক টানিয়া কুণ্ডলী করিয়া নাকে মুখে ধূম বাহির করিয়া মোল্লাজী আবার কাগজখানা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

পড়িয়া পড়িয়া মোল্লাজী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখে ঘাম বাহির হইল। সেই ঘাম গামছা দিয়া মুছিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

মিনাজদ্দী মাতবরের আর ধৈর্য থাকে না। সে মোল্লাজীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "কি পড়লেন মোল্লাজী? কন শীগগীর?"

মোল্লাজী এবার সুর করিয়া সমবেত লোকদিগকে শুনাইয়া পড়িতে লাগিল, "এতে লেইখাছে, ইবার পিয়াইজির দাম পাঁচসিকা মণ, মুরগীর আণ্ডার দাম দুইআনা করিয়া কুড়ি, তামুক পাতার দাম আধা পয়সা, কাঁচা মরিচের দাম তিন পয়সা সের।"

আজাহের আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আরে মোল্লাজী! আপিনি ত কোন জিনিসের কি। দাম পইড়া যাইতেছেন। কিন্তুক পিয়ন যে কয়া গ্যাল, আজাহের মিঞা এক নম্বর আসামী বাড়িতি নাই বইলা সমন লটকাইয়া জারি করলাম। সেই যে আমি আসামী ওইলাম, কোন মোকদ্দমার? বালা কইরা পড়েন?" মোল্লাজী একটু বিরক্ত হইয়া আজাহেরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আরে রাখ মিঞা! আমি আসছি তোমার কতায়। ইয়ার আদি-অন্ত সগল কথাইত পড়তি অবি। আর পড়বই বা কি? তোমারে আসামী দিছে, তাতে কি ঐছে? তোমার ত দেখা পায় নাই। ঘরের বেড়ার সাথে কাগজ লটকাইয়া গ্যাছে। ওই বেড়ায়ই এটা লটকাইয়া থোও। যদি আসামী অয় ত ঘরের বেড়াই অবি।"

মোড়লও এই যুক্তিটি পছন্দ করিল। সরল মনে সকলেই বুঝিল কাগজ যখন পিওন কাহারও হাতে দেয় নাই, ঘরের বেড়ায় লটকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে সুতরাং আজাহেরের

এ জন্য ভয় করিবার কোনই কারণ নাই। সকলে পরামর্শ করিয়া কাগজখানা বেড়ার যে স্থানে। লটকান ছিল সেই স্থানেই উহা আবার লটকাইয়া রাখিল। বচন মোল্লা সসম্মানে ঘরে ফিরিয়া গেল।

দিনের পরে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। খেত-খামারের কাজে ঘরের বাহির হইতে বেড়া গোজা সেই কাগজের টুকরাটির দিকে চোখ পড়তেই কি যেন আশঙ্কায় আজাহেরের অন্তরটি দুরু দুরু করিয়া কাপিয়া উঠে। রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া আজাহেরের ঘুম আসে না। সেই কাগজের টুকরাটি হিংস্র অজগর হইয়া যেন তাহাকে কামড়াইতে আসে।

কোন কোন দিন আজাহের রাত্রে আধ-তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখে, তাহার শিশু পুত্রটি কোলের উপর বসিয়া খেলা করিতেছে। হঠাৎ সেই কাগজের টুকরাটি প্রকাণ্ড একটা হা করিয়া আসিয়া তাহার সেই শিশু পুত্রটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া আজাহের কোলের ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরে। বউ অবাক হইয়া ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করে, “কও ত তোমার ওইল কি? এমন কইরা কাইন্দা উঠলা ক্যান?”

আজাহের বলে, “কিছু না বউ! তুমি ঘুমাও।” কিন্তু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের ধারায় তাহার সমস্ত বুক ভিজিয়া যায়।

এই সমস্ত চিন্তার হাত হইতে আজাহের একেবারে রেহাই পায় যখন তাহার শিশু পুত্রটি আধ আধ স্বরে তাহাকে বাজান বলিয়া ডাকে। ছোট ছোট পা ফেলিয়া উঠানের এ-ধারে ওধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। আজাহের তাহাকে কাঁধে করিয়া মাঠে লইয়া যায়।

"এ খেত আমার। ও খেত আমার।" নিজের সবগুলি ফসলের খেত আজাহের ছেলেকে দেখায়। মাঠের ফুল কুড়াইয়া ছেলের হাতে দেয়। আজাহের ছেলের জন্য কি যে করিবে আর কি যে না করিবে!

কত গ্রাম্য-ছড়াই সে ছেলেকে শিখাইয়াছে। ছেলেকে কোলে করিলে তাহার মুখ যেন ছড়ার ঝুমঝুমি হইয়া বাজিতে থাকে।

আজাহেরের হালের বলদ দুইটিকে দেখিয়া ভয় না করে এমন লোক পাড়ায় খুব কমই। আছে। কিন্তু আজাহেরের এতটুকুন শিশু পুত্রটির কাছে গরু দুইটি যেন একেবারে নিরীহ। সে তাহাদের শিং ধরিয়া ঝকে, লেজ ধরিয়া যখন তখন টানাটানি করে, গরু দুইটি তাহাকে কিছুই বলে না। প্রতিদানে গরু দুইটি যতক্ষণ বাড়ি থাকে সব সময়ই সে তাহাদিগকে কলার খোসাটি, কচি ঘাসের ছোট গুচ্ছটি, আরো কত কি আনিয়া খাইতে দেয়।

গরু দুইটি যখন পেট ভরিয়া খাইয়া ঘুমাইতে থাকে সেও তখন তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কতদিন তাহার মা আসিয়া তাহাকে এমন ঘুমন্ত অবস্থা হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। বাড়িতে নূতন কেহ আসিলে সে তাহাকে টানিয়া লইয়া গরু দুটিকে দেখায়। আর সগর্বে ঘোষণা করে, এই গরু দুটি তাহার নিজের।

ইতিমধ্যে আজাহেরের আরো একটি মেয়ে জন্মিল। সদ্যজাত শিশু বোনটি আজাহেরের ছেলের একটি আশ্চর্য রকমের খেলনা হইয়া দাঁড়াইল।

সে যখন আধ আধ সুরে তাহাকে ভাই বলিয়া ডাকিতে শিখিল তখন তাহার মনে কি যে খুশী! বোনকে কি খাওয়াইবে, কোথা হইতে কি আনিয়া দিবে, গহন-দুর্গম বনের অন্তরাল হইতে কাউয়ার হুঁটির ফল, কাটা গাছের আগডাল হইতে ডুমকুর, আরো কত কি আনিয়া সে বোনের সামনে জড় করে।

আজাহের ছেলের নাম রাখিয়াছে বছির' আর তার মেয়ের নাম রাখিয়াছে বড়। আজাহেরের ছেলে বছির শেষ রাত্রেই জাগিয়া উঠে। বাপ মা দুই পাশে এখনও ঘুমাইয়া।

ছোট বোন বড়, সেও মায়ের বাহু জড়াইয়া ঘুমাইতেছে–সামনের আমগাছটি হইতে টুপ টুপ করিয়া আম পড়িতেছে। বছিরের বুক তারই তালে তালে নাচিয়া উঠিতেছে, কখন সকাল হইবে–দুইহাতে ধাক্কা দিয়া রাতের আঁধার যদি সরাইয়া দেওয়া যাইত। সামনের কলাগাছের পাতার উপরে শিশির-ফোঁটা পড়ার শব্দ কানে আসিতেছে।

ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া চোখ পাতিয়া সে বসিয়া আছে, আর কেহ আসিয়া পাকা আমগুলি কুড়াইয়া লইয়া না যায়।

.

১২.

ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হইয়া আসিল। আজাহেরের ছেলে বছির আস্তে আস্তে উঠিয়া আম গাছের তলায় যাইয়া আম কুড়াইতে লাগিল। এমন সময় আট দশজন লোক বাড়ির উপর আসিয়া আথাল হইতে গরু দুইটির দড়ি খুলিতে লাগিল। বছির চীৎকার করিয়া

তার বাপকে ডাকিতে লাগিল, “ও বাজান! জলদী উইঠা আইস। কারা যিনি আমার গরু দুইডারে লইয়া যাইত্যাছে।”

ছেলের ডাক শুনিয়া আজাহের হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দেখিতে পাইল,শরৎ সাহা লোকজন লইয়া আসিয়াছে। সঙ্গে সেই আদালতের পিয়ন খাকি পিরানের পকেট হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া সদম্ভে পড়িতে লাগিল, “আলীপুর গ্রামের মহামহিম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সাহা, পিতা মৃত গোলক চন্দ্র সাহার নিকট হইতে গোবিন্দপুর নিবাসী আজাহের মণ্ডল আজ পাঁচ বৎসর পূর্বে পনর টাকা কর্জ করিয়াছিল। তাহার সুদ, সুদের সুদ, চক্রবন্দীতে বৃদ্ধি পাইয়া পঁচ শত টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই টাকা মহামহিম আদালত শরৎ সাহার নামে ডিগ্রী দিয়াছেন। আজ আজাহের মণ্ডল যদি সেই টাকা পরিশোধ না করিতে পারে তবে তাহার স্থাবর, অস্থাবর। সমস্ত মাল ক্রোক হইবে।”

লোকটি প্রতিটি কথা এইরূপ ধমকের সহিত বলিতেছিল, যেন তাহার আঘাতে আজাহেরের বুকের পাজরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

আজাহের সেই আদালতের পিয়নের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, “দোহাই দিচ্ছি কোম্পানী বাহাদুরের, দোহাই মা মহারাণীর, আমার হালের গরু দুইডা নিবেন না।”

পিয়ন আজাহেরের হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "রাজার হুকুম, আমার কি সাধ্য আছে মিঞা সাহেব? শরৎ সাহার টাকাটা যদি আপনি পরিশোধ করে দিতে পারেন তবে গরু ছেড়ে যেতে পারি।"

এত টাকা সে কেমন করিয়া পরিশোধ করিবে। মাত্র পনর টাকা সে কর্জ করিয়া আনিয়াছিল। তাহার পিছনে কত পনর টাকা সে শরৎ সাহার বাড়ি দিয়া আসিয়াছে। তবু তাহার সেই পনর টাকার সুদের সুদ বাড়িয়া আজ পঁচশত টাকায় পরিণত হইয়াছে। আজাহের আছাড় খাইয়া শরৎ সাহার পা জড়াইয়া ধরিল, "সা-জী মশায়! আমারে মাপ করেন।"

তাহার কান্নাকাটিতে গ্রামের বহু লোকজন আসিয়া উঠানে জড় হইল। মিনাজদ্দী মাতবরও আসিল। কিন্তু আদালতের পিয়ন সামনে দাঁড়াইয়া। তাহার মাজায় আদালতের ছাপ-মারা চাপরাশ ঝকমক করিতেছে। কেহই আজাহেরকে কোন সাহায্য করিতে সাহস পাইল না।

শরৎ সাহা ঝেংটা দিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "কেন মিঞা? সে দিন যে খুব বাড়াবাড়ি করেছিলে? কই মিনাজদ্দী! কথা কও না কেন? আমার মুখ না কুত্তার মত, এখন আজাহেরকে বাঁচাও।"

আজাহের জোড় হাত করিয়া শরৎ সাহাকে বলিতে লাগিল, "বাবু! আমারে বাঁচান। আপনি আমার ধর্মের বাপ। আমার ছাওয়াল-ম্যায়াগো মুখির দিক চায়া আমাকে দয়া করেন।"

“দয়ার কথা আজাহের! শরৎ সাহার জীবনে সব আছে কিন্তু ওই একটা জিনিস কেউ কোন দিন দেখেনি।”

“কিন্তুক আমাগো সব যদি নিয়া যান আমরা খাব কি? আমার ছাওয়াল-ম্যায়াগুলা যে না খায়া মরবি।”

“এসব যদি ভাবতাম তবে কি আর টাকা করতে পারতাম। জান মিঞা! টাকা যেমন শক্ত তেমনি শক্ত মন না করতে পারলে টাকা থাকে না। আমার গিন্নীর ছয়মাস যক্ষমা হয়েছে, এখনও টাকা খরচ করে ডাক্তার দেখাইনি।”

“বাবু! জনম ভইরা আপনার বাড়িতি চাকর খাইটা খাব, যা হুকুম করবেন তাই কইরা দিব।”

“তোমাকে খাটাব? জান, বাড়িতে গিন্নীর অসুখ, রানতে পারে না। নিজের হাতে এক বেলা বেঁধে তিন বেলা খাই তবু চাকর রাখি না। লোকে বলে, শরৎ সাহার লাখ টাকা আছে। সে কি সহজে হয়? যাক তোমার সঙ্গে কথা বলে কি হবে! আরে মিঞা সাবরা! তোমরা যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে, ঘরের মধ্যে ধান চাউল যা আছে বের কর।”

শরৎ সাহার লোকেরা ঘরে ঢুকিতেছিল। আজাহেরের বউ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। “আমার ডোলের ধান আমি কাউরে নিবার দিমু না। আমি কত কষ্টে এই ধান উড়াইছি। কত কইরা বৈদে শুকাইছি। আমার পুলা-ম্যায়ারা বছর ভইরা খাবি। আমি যাবার দিব না কেউরে আমার গরে।”

শরৎ সাহার লোকেরা আজাহেরের বউ এর গায়ে হাত দিতে যাইতেছিল। মিনাজদ্দী মাতবর আর স্থির থাকিতে পারিল না।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাবধান! সাবধান মিঞারা! ম্যায়া লোকের গায় হাত দিবেন না। আপনাগো গরেও মা-বোন আছে।"

এমন সময় পিয়ন সামনে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "মাতবর সাহেব! সাপের সঙ্গে খেলা করছেন। রাজার হুকুম। যে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তার যথাসর্বস্ব যাবে। দেখছেন না আমার কোমরে কোম্পানীর চাপরাশ। এই আওরত লোকটিকে দরজা ছেড়ে চলে যেতে বলুন।"

"হে যদি না যায় তবে কি করতি চান পিয়ন সাহেব?" মাতবর জিজ্ঞাসা করিল।

"কি করতি পারি শুনতে চান? শোভারামপুরের গনি বেপারী সদর পিয়নকে বে-দখল করেছিল, দেখে আসুন গিয়া আজ গনি বেপারীর বাড়িতে জঙ্গল। উঠানে ঘুঘু চরছে। পীড়নের কথা ছেড়েই দিন। ভাজন ডাঙার বছিরদ্দীন চৌকিদারকে অপমান করেছিল। থানার দারোগা তাকে ডেকে নিয়ে এমন করে মেরেছিল যে সেই মারের চোটেই তিন দিন পরে সে মারা গেল।"

এ সব কথা ত সবই মিনাজদ্দীর জানা! নইলে কার বাপের সাধ্য ছিল আজ আজাহেরের ঘর হইতে এমন করিয়া সব মাল লইয়া যায়। মিনাজদ্দীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পিয়ন আবার আরম্ভ করিল, "আমরা যে গ্রাম-ভরে এত বুকটান করে ঘুরি সে নিজের

জোরে নয় মাতবর সাহেব! এই চাপরাশের জোরে। এই আওরত লোকটিকে এখনও চলে যেতে বলুন, নইলে এর মান-সম্মান আর রাখা যাবে না।”

মিনাজদী আজাহেরকে বলিল, “আজাহের! বউকে ওখান হইতে চইলা যাইতে কও। আমরা বাইচ্যা থাকতি তোমার কুনুই উপকারে আসলাম না।”

আজাহেরকে আর বলিতে হইল না। বউ আপনা হইতেই দরজা হইতে সরিয়া গেল।

শরৎ সাহার লোকেরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেড়ী হইতে ভারে ভারে ধান আনিয়া ছালায় ভরিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিতে লাগিল। হড়ী ভরা কলাই, মসুরী, বীজধান যেখানে যাহা পাইল তাহাই আনিয়া গাড়ীতে তুলিল। এই সব কাজ করিতে তাহারা ঘরের বিছানা পত্র, তৈজস, হাড়ী-পাতিল সমস্ত ছড়াইয়া একাকার করিল।

মোড়ল আজাহেরকে ডাকিয়া কহিল, “আজাহের ভাই! তুই একেবারে ছন্নছাড়া ফকির ছিলি। তোরে আমি নিজের আতে ঘর-গিরস্তালী বানায়া দিছিলাম। ভিন গেরাম হইতে বউ আইন্যা বিয়া দিছিলাম। আইজ তোর সেই যত্তনের বান্দা ঘর-বাড়ি ভাইঙা পড়ত্যাছে। ইয়া আমি আর চক্ষি দেখপার পারি না। পিয়ন সাহেব! যা করবার অয়। করেন, আমি চইল্যা গেলাম।”

এই বলিয়া চাঁদরের খেটে চোখ মুছিতে মুছিতে মিনাজদ্দী মাতবর চলিয়া গেল। শরৎ সাহার লোকেরা দশ মিনিটের মধ্যে ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র আনিয়া গাড়ীতে তুলিল। তারপর তাহারা গাড়ী লইয়া রওয়ানা হইবে এমন সময় শরৎ সাহা বলিল, “আরে

www.bengaliebook.com

মিঞারা! তোমরা কি চোখের মাথা খেয়েছ, দেখছ না ঘরের চালে ক'খানা টিন রয়েছে, টান দিয়ে খুলে নাও।”

আজাহের শরৎ সাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “বাবু! সব ত নিলেন। আমার মাথা গুজবার জন্যি এই টিন কয়খানা রাইখা যান। ছাওয়াল-ম্যায়া লয়া কোথায় থাকপ?”

“আরে বাপুরে! তোমার ছেলে-মেয়ের দুঃখই যদি ভাবতে পারতাম, তবে আমি শরৎ সাহা হ'তে পারতাম? পিঁপড়ায় যদি গুড় খেয়ে যায় তার মুখ টিপে সেইটুকু বার করে রাখি। সেইজন্য আমার নাম শরৎ সাহা।”

একথা মুখে বলিবার প্রয়োজন ছিল না। গ্রামের সকল লোকই তাহা জানিত। সে জন্য। তাহারা নীরব দর্শকের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। কোন কথাই বলিতে পারিল না। শরৎ সাহার লোকেরা দেখিতে দেখিতে ঘরের চাল হইতে টিন খুলিয়া লইয়া গাড়ীতে তুলিল। তাহাদের পায়ের ধাক্কা লাগিয়া ভাতের হাঁড়ী তরকারীর পাতিল ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়িল। আজকে। ছেলে-মেয়েগুলো যে পান্তা-ভাত খাইয়া এ-বেলাটা কাটাইয়া দিবে তাহারও উপায় থাকিল না!

সমস্ত কাজ শেষ করিয়া শরৎ সাহা আজাহেরের বাড়িতে প্রকাণ্ড এক বাঁশ পুঁতিল। তাহার মাথায় এক টুকরা কাপড় বাধা। তখন আদালতের পিয়ন পূর্বের মতই ধমকের সুরে। বলিয়া যাইতে লাগিল, “অদ্য হইতে আজাহের মিঞার বাড়ির স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিসহ মহামহিম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সাহা, পিতা মৃত গোলকচন্দ্র সাহা ডিক্রী করিয়া ক্রোক করিলেন। এই জমিতে বাঁশগাড়ী করিয়া উপযুক্ত সাক্ষীসহ নিজের দখল

সাব্যস্ত করিলেন।” সমবেত লোকেরা ভয়ে-বিস্ময়ে সেই ধমকের সুর শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

গাড়ী রওয়ানা হইল। শরৎ সাহার লোকেরা খামারের গরু দুইটিকে যখন লইয়া যাইতেছিল তখন আজাহেরের ছেলে বছির গরু দুইটির গলা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, “গরু দুইডা আমার। আমি নিবার দিমু না।”

শরৎ সাহার লোকেরা বালকের সেই কচি হাত দুইটি ঝেংটা দিয়া ছাড়াইয়া তাহাকে দূরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, “বাজান! দেহ আমার গরু দুইটা লয়া গেল।”

আহা! বাজানের আজ কোন সাধ্য নাই এই নরবেশী-দস্যুর হাত হইতে গরু দুইটিকে রক্ষা করে। শরৎ সাহার লোকেরা গরু দুইটির দড়ি ধরিয়া টানে, তাহারা কিছুতেই নড়ে না। মূক-বোবা এই প্রাণী দুইটি হয়ত সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাদের বড় বড় চোখ দুইটি হইতে ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শরৎ সাহার লোকেরা গরু দুইটিকে হেলে-লাঠি দিয়া জোরে জোরে আঘাত করিতে লাগিল। গরু দুইটি তবু নড়িল না।

তাহাদের পিঠে আঘাতের পর আঘাত চলিতে লাগিল। আজাহের আর সহ্য করিতে পারিল না। হামলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর গরু দুইটির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “বোবাধন! অনেক কাল তোরা আমার কাছে ছিলি। কত ঠাটা-পড়া রৈদী তোগো দিয়া কাম করাইছি। প্যাট বইরা খাবার দিতি পারি নাই। আমারে মাপ করিস। আমার বাড়ি

ছাইড়্যা অন্য বাড়িতে গ্যালি হয়ত বাল মত খাইবার পাইবি।” তারপর বউকে ডাকিয়া বলিল, “বউ! জনমের মত ত ওরা চলল। বাল মত পা দুইডা ধুইয়া দাও।”

বউ আসিয়া কাঁদিতে কাদিতে গরু দুইটার পা ধোয়াইয়া দিল। তারপর গলার কাছে মুখ। লইয়া আরো খানিক কাঁদিয়া আঁচলে বাধা কয়টি ধান-দূর্বা তাদের মাথায় ছড়াইয়া দিল।

তখন আজাহের নিজেই দড়ি ধরিয়া টানিয়া তাহার এত আদরের গরু দুইটিকে সে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গরু দুইটিকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর যখন তাহারা দূরের জঙ্গলের আড়ালে চলিয়া গেল তখন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। এই গরু দুইটি শুধু মাত্র তার হাল বাহিবার বাহনই নয়; নিজের ছেলে-মেয়েদের মতই সে ইহাদের যত্ন করিয়াছে। তাহার পরিবারে যেমন তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে তেমনি এই গরু দুইটি। এদের সঙ্গে সে কথা কহিতে পারিত। এই বোবার ভাষাও সে হয়ত কিছু বুঝিতে পারিত। তার সকল সুখের সঙ্গে সকল দুঃখের সঙ্গে সমসুখী সমদুখী হইয়া ইহারা তাহার স্বল্প পরিসর জীবনটিতে জড়াইয়াছিল।

উঠানে ফিরিয়া আসিয়া আজাহের মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিল। কিসে কি হইয়া গেল। গাজীর গানের দলের বাদশার কাহিনীর মত নিমিষে সে পথের ভিখারী হইয়া বসিল।

.

১৩.

দুপুর বেলা মিনাজদ্দী মাতবর নিজের বাড়ি হইতে ভাত পাকাইয়া আনিয়া বলিল, "আজাহের বাই! আর বাইব না। ভাত খাও।"

আজাহের বলিল, "মোড়ল সা'ব! কয়দিন আপনি এমন কইরা আমাগো খাওয়াইবেন? আমার ত কিছুই রইল না।" আজাহের হামলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মোড়ল তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, "বাইরে! আল্লা যখন মুখ দিছেন, তিনিই খাওয়াইবেন। কাইন্দা করবি কি?"

"না মোড়ল সা'ব! আর কাম না।" মোড়লের হাত ধরিয়া আজাহের বলিতে লাগিল, তাহার চোখ দুইটি হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছে; "আর কান্দুম না, মোড়ল সাব! আমার ত সবই শ্যাষ। পুলা-ম্যায়ারা না খাইয়া মরবি। কিন্তুক তাগো মরণ আমি খাড়ায়া খাড়ায়া দেখপার পারব না। তাগো মরার আগে ওই শরৎ সার গলাডা আমি টিপা তারে জন্মের শোধ শেষ কইরা দিয়া আসপ।"

মোড়ল বলিল, "আজাহের! এমন চিন্তা মুখেও আইন না। মানুষরে মানুষ মারলি আল্লার কাছে দায়ী হবা। দোজগে যায়া পুড়বা।"

"কিন্তুক মোড়ল সাব! আল্লার দোজগের জ্বালা কি দুনিয়ার দোজগের চায়াও বিষম? আমার পুলা-ম্যায়ারা কুনুদিন বাতের দুঃখু পায় নাই। কাইল তারা যখন বাত বাত কইরা কানবি, আমি খাড়ায়া খাড়ায়া তাই হুনব, আল্লার দোজগে কি ইয়ার চায়াও দুস্কু?"

"হত্যি কথাই কইছসরে বাই আজাহের! মানুষ মানুষির জন্যি যে দোজগ বানাইছে, আল্লার সাধ্যও নাই তেমন দোজগের আগুন বানায়।"

"তয় মোড়ল সাব। আমারে কি করবার কন আপনি? আগুনে পুইড়া যাইত্যাছে আমার সব্ব শরীল। ওই শরৎ সার মুণ্ডডা কাইটা না আনতি পারলি আমার এই অন্তরডা জুড়াবি না। আমার এই শূন্য বাড়ি-গরের দিগে যখন আমি চাই, ঘরের আসবাব পত্রের কথা যখন বাবি, আমার গরু দুইডার কতা যখন মনে আসে তহন কে যিনি আমার কানের কাছে কেবলই কয়া বেড়ায়, শরৎ সাহার মুণ্ডটা কাইটা আন।"

"আজাহের বাই! তোমার ত মাথা খারাপ হয়া গ্যাল। একটু ঠিক অও।"

"ঠিক আর কি মোড়ল বাই! কাইল যখন দেখপ, আমার চাষ দেওয়া খ্যাতে অন্য মানষী হাল জুড়ছে, আমার এত আদরের গরু দুইডি অন্য লোকের খ্যাত চাষ করতাছে, ক্যামন কইরা তা আমি সহ্য করব মোড়ল বাই?"

"কি করবা আজাহের! রাজার আইন।"

"আচ্ছা মোড়ল সাব! এ কেমুন আইন? পোনর টাহা কর্জ দিছিল ওই বেটা চামার। তারপর কত পোনর টাহা তারে দিছি, তবু আইজ সেই পোনর টাহা ফুরাইল না। বাইড়্যা পাঁচশ' টাহা ঐল।"

"আজাহের! হুনছি এই আইনের বদল অবি। দেশে সুদখোর মহাজন থাকপি না।"

"কিন্তুক যহন বদল ঐব তহন আমরাও থাকপ না। আমাগো উপর যা ঐল তার কুনু। বিচার অবি না।"

"আজাহের বাই! সবুর কর। সকল দুরই শেষ আছে। যাই দেখি, ছ্যামড়ারা কি করতাছে। তুমি বইস।"

মোড়ল চলিয়া গেল। আজাহের বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দুপুরের দিন গড়াইয়া সন্ধ্যা হইল। রাত্রের পিশাচিনী তার অন্ধকারের কথা বিস্তার করিয়া সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল। চারিধারের বনে ঝিঁঝিপোকার আর্তনাদ আজাহেরের ব্যথা-বিক্ষিপ্ত অন্তরখানি। যেন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছিল।

দিনের আলোকে মানুষের যে সব অন্যায় অবিচারের আঘাত সে অনুভব করিতে পারে নাই, রাত্রের অন্ধকারে তাহারা সহস্র ক্ষত হইয়া তাহার শরীর-মনকে বিষাইয়া তুলিতেছিল। এই অন্ধকারের আশীতে সে যেন আজ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, কৌশলের পর কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া এই লোভী মহাজন ধীরে ধীরে কেমন করিয়া তাহার সমস্ত ঘর-বাড়ি জমি-জমা দখল করিয়া লইয়াছে। সেই সঙ্গে তার জীবনের সমস্ত আশার প্রদীপ নিষ্ঠুর হাতের থাপড় মারিয়া নিবাইয়া দিয়াছে। তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আজাহের শিহরিয়া উঠিল। দিনের পর দিন, ধীরে ধীরে তার এত আদরের ছেলে-মেয়েরা না খাইয়া মরিয়া যাইবে তারপর সে, তার স্ত্রী, তাহারাও ধরাপৃষ্ঠ হইতে একদিন চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইবে। আর এই লোভী শয়তান মহাজন দিনে দিনে তাহার সম্পদ-জাল বিস্তার করিয়া তাহারই মত বহু নির্দোষী লোককে আবার গৃহহীন।

সর্বস্বহীন করিবে। ইহার কি কোনই প্রতিকার নাই? আজাহের মরিবে কিন্তু তার আগে সে ইহার কিছুটা প্রতিকার করিয়া যাইবে!

ঘরের বেড়া হইতে সে তাহার দাখানি বাহির করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া তাহাতে ধার দিল। অন্ধকারে বালুর উপর ঘসা পাইয়া ইস্পাতের দা চকমক করিয়া উঠিতেছিল, আর তারই চমকে আজাহেরের অন্তরের কি এক বীভৎস ক্ষুধার যেন তৃপ্তি হইতেছিল। অনেকক্ষণ দাখানি বালুর উপর ঘসিয়া আজাহের তাহাকে মনের মত করিয়া পরীক্ষা করিল। তারপর। মালকোছা দিয়া কাপড় পরিয়া চারিদিকের শুচিভেদ্য অন্ধকার-সাগরের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িল। সারাদিনের কান্নাকাটির পর বউ তাহার ছেলে-মেয়েগুলিকে লইয়া ঘরের মেঝেয় শুইয়া একটু তন্দ্রাতুর হইয়াছিল। সে টের পাইল না।

সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে আজাহের নিজেকে যেন দেখিতে পাইতেছিল। তাহার নিজের এই ভীষণতর চেহারা দেখিয়া যেন নিজেই সে শিহরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ইহা ছাড়া তার আর ত কোন উপায় নাই। ওই শয়তান সুদখোর মহাজনটাকে একটু শিক্ষা না দিয়া গেলে সে কিছুতেই শান্তি পাইবে না।

দেখিতে দেখিতে আজাহের শরৎ সাহার দরজায় আসিয়া পোছিল। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। একখানা ঘরে একটি মাটির প্রদীপ টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়া আজাহের দেখিতে পাইল, একটা বিছানার উপর সেই সুদখোর মহাজন পড়িয়া ঘুমাইতেছে। পাশে কতকগুলি মহাজনী খাতা-পত্র ইতস্ততঃ ছড়ান। বোধ হয় সেগুলি পড়িতে পড়িতে, তারই মত কোন সরল-প্রাণ নিরীহ কৃষাণের সর্বনাশের ফন্দী বাহির করিয়া সে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়ত ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াই তাহার বিনাশের

নূতন নূতন কৌশল-জালের স্বপ্ন দেখিতেছে। এই উপযুক্ত সময়, আস্তে আস্তে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একটা বাখারীর চাড়া দিয়া আজাহের কপাটের খিল খুলিয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পায়ে যাইয়া বিছানার সামনে হাঁটু-গাড়া দিয়া বসিল। নিজের কোমর হইতে দাখানা খুলিয়া ভালমত আর একবার তাহার ধার পরীক্ষা করিয়া লইল। এইবার মনের মত করিয়া তাহার গলার উপরে একটা কোপ বসাইয়া দিতে পারলেই হয়। কিন্তু একি! ছোট একটি মেয়ের কচি দুখানা হাত ওই সুদখোর মহাজনের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। মাঠের কলমী ফুলের মতই রাঙা টুকটুকে সেই শিশু-মুখোনি। কত

আদরেই সে তার বাপের গলাটি ধরিয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আজাহেরের হাতের দাখানি শিথিল হইয়া আসিল। সে এক নিমিষে অনেকক্ষণ সেই সুন্দর শিশু-মুখোনির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে দাখানি হাতে লইয়া ঘরের দরজা অবধি ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু ফিরিয়া সে যাইবে না। তারও ঘরে ত অমনি ছোট্ট সোনার শিশুকন্যা রহিয়াছে। আজ যখন সে নিলামে তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া আসিয়াছে তখন কি একবারও ওই নিষ্ঠুর মহাজন তার ছেলে-মেয়ের কথা ভাবিয়াছে? না! না! কিছুতেই সে ফিরিয়া যাইবে না। এই গোখুরা সাপকে সে চিরকালের মত দুনিয়ার বুক হইতে নিঃশেষ করিয়া যাইবে।

ধীরে ধীরে আবার আসিয়া আজাহের সেই বিছানার সামনে পূর্বের মতই হাঁটু-গাড়া দিয়া বসিল। মওতের ফেরেস্তা আজরাইল যেন তার সামনে আসিয়া খাড়া হইয়াছে। আস্তে আস্তে অতি সাবধানে শরৎ সাহার গলা হইতে তার ছোট্ট মেয়েটির একখানা হাত খুলিয়া

লইল। অপর হাতখানা খুলিতে সেই হাতের তপ্ত স্পর্শ যেন আজাহেরকে মুহূর্তে কি করিয়া দিল।

সেই হাতখানা মুঠির মধ্যে লইয়া আজাহের ধীরে ধীরে নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। তাহার হাতের আদর পাইয়া ছোট মেয়েটি ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে বলিয়া উঠিল, “আমার খেলনা আমি কাউকে নিতে দিব না।” কি মিষ্টি এই কণ্ঠস্বর! খোদার দুনিয়া বুঝি বহুদিন এমন সুর শোনে নাই। সমস্ত আকাশ বাতাস নীরব নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্বর যেন বুকের মধ্যে পুরিয়া লইল। এমনি করিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। আজাহেরের মনে ছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিল। ওমনি একটি ছোট খুকী-ফেরেস্তা তাহারও ঘরে আছে। ওমনি করিয়া সারাটি রাত তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকে। আজ ওই নিষ্ঠুর মহাজনটিকে হত্যা করিয়া গেলে তাহারই মেয়ের মত একটি ছোট্ট মেয়ে কাল এবাড়ি ও বাড়ি তাহার আদরের বাপটিকে খুঁজিয়া ফিরিবে। রাতের বেলা ঘুমাইতে যাইয়া ওই ছোট মেয়েটি তার কচি বাহু দুটি জড়াইয়া ধরিবার এমনি আদরের বাপটিকে আর পাইবে না। আজাহেরের উপর যাহা হইয়াছে হউক, ওই কচি মেয়েটিকে কিছুতেই কাঁদাইবে না।

নিজের হাতের দা-খানিকে অতি সন্তর্পণে কোমরে খুঁজিয়া আজাহের ঘরের দরজা পার হইয়া বাহিরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আকাশের চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। রহিয়া রহিয়া দুই একটি রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ রাত্রির মৌনতা ভঙ্গ করিতেছিল। মহাজনের উঠানের শেফালি গাছটি হইতে অজস্র ফুল ঝরিয়া পড়িয়া অর্ধেক অঙ্গনখানি ভরিয়া তুলিয়াছে।

www.bengaliebook.com

কি জানি কেন আজাহের সেই গাছের তলায় যাইয়া দাঁড়াইল, গামছার খেটে আস্তে আস্তে অনেকগুলি ফুল টুকাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে সন্তর্পণে দরজা পার হইয়া সেই সুপ্ত মেয়েটির বিছানার পার্শ্বে আসিয়া আবার বসিয়া রহিল। রাঙা টুকটুকে আলতা মাখান পা দু'টি। সরু সরু কোমল দুখানি হাত গলায় জড়াইতে ইচ্ছে করে। অতি ধীরে ধীরে আজাহের তার সেই হাত দুখানি লইয়া পূর্ব্ববৎ সেই নিষ্ঠুর মহাজনের গলায় পরাইয়া দিল। মহাজন ঘুমের ঘোরে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। তারপর গামছার খোট হইতে ফুলগুলি লইয়া সেই ছোট্ট খুকী-মেয়েটির সারা গায়ে ছড়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

রাত্র তখন শেষ হইয়াছে। মহাজনের সেই খুকী-মেয়েটির মতই আর একটি লাল টুকটুকে মেয়ে ফজরের আসমানের কিনারায় আসিয়া উঁকি দিতেছে।

.

১৪.

চাহিয়া চিন্তিয়া আর কয় দিন কাটান যায়? তবু যে তিন চার দিন আজাহেরের কি করিয়া কাটিয়া গেল তাহা সে-ই জানে। গ্রামে কাহারও অবস্থা ভাল নয়। ইচ্ছা থাকিলে তাহারা সাহায্য করিতে পারে না। বড় আদর করিয়া আজাহের মেয়েটিকে একগাছি রূপার গোটছড়া কিনিয়া দিয়াছিল। সেইটি কি মেয়ে মাজা হইতে খুলিয়া দিতে চায়? অনেক বলিয়া কহিয়াও যখন কিছু হইল না তখন জোড় করিয়া আজাহের সেই গোটছড়া মেয়ের কোমর হইতে খুলিতে যাইয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। পীর সাহেবের নিকট হইতে ছেলের

ভাল-ভালাইর জন্য আজাহের তাহার হাতে একটি রূপার তাবিজ কিনিয়া দিয়াছিল। সেটিও খুলিয়া লইতে হইল। কিন্তু এইভাবে আর কয়দিন কাটান যায়? নিজেদের কথা না হয় নাই ভাবিল, কিন্তু রাত্র প্রভাত হইলেই যে ছেলে-মেয়ে দুইটি ভাত ভাত করিয়া কান্না। চড়ায়, তারপর কঁদিতে কঁদিতে হয়রান হইয়া দুই ভাই-বোন গলাগলি ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। দুপুরের বেলা জাগিয়া উঠিয়া আবার ভাত ভাত করিয়া কাদিতে থাকে। এইভাবে আর কতদিন চলা যায়?

আজাহের খবর পাইল, এখান হইতে বিশ মাইল দূরে তাম্বুলখানা গ্রাম। সেখানে অনেক জমি পড়িয়া রহিয়াছে। চাষ করিবার কৃষাণ নাই। সেখানে গেলে জন খাঁটিয়া আজাহের কোন রকমে ছেলে-মেয়ের পেট ভরাইতে পারিবে। প্রথমে সে এ বিষয়ে মিনাজদ্দী মাতবরের সঙ্গে পরামর্শ করিল। মাতবর বলিল, “সেই জঙলা জায়গায়, নদীর দ্যাশের লোক, তোমরা কেমন কইরা থাকপা। হুনছি সেহানে মানষীর জ্বর-জারি লাইগাই আছে।”

আজাহের বলিল, “এহানে থাইকা ত মরণ। জন-কিষাণি খাটপ, তাও কেউ খাটাইবার চায় না।”

মোড়ল বলে, “আজাহের! যা করবি কর। জিজ্ঞাস কইরা শুধু আমারে কান্দাইবারই পারবি। আমি যদি পারতাম, তোরে কি এই গিরাম ছাড়বার দিতামরে?”

আজাহের বলে, “মোড়লসাব! আমাগো জন্যি আপনি বহু কষ্ট করছেন, এইবার গ্রাম ছাইড়া যাওনের দিন-খান ঠিক কইরা দ্যান।”

মোড়লের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আজাহের যাইবার দিন স্থির করিয়া ফেলিল। মোড়ল বলিল, "আজাহের! হেই দ্যাশে যদি যাবিই, সেহানের গরীবুল্লা মাতবরের বাড়ি যাইস। তানি আমার বিয়াই। আমার কতা কইলি তোরে খাতির করবি।"

আজাহের খুঁটিয়া খুঁটিয়া গরীবুল্লা মাতবরের সব কিছু জানিয়া লইল। নির্দিষ্ট দিনে কিছু পান্তা-ভাত খাইয়া তাহারা রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সঙ্গে মোট-বহর কিছুই। নাই। বউ-এর কোলে মেয়েটি, আজাহেরের কোলে ছেলেটি। ছেলেটিকে কোল হইতে নামাইয়া আজাহের উঠানের উপরে কয়টি ধান ছড়াইয়া তাহার উপর একটি সালাম জানাইয়া সে আর একবার ভালমত সমস্ত বাড়িখানি দেখিয়া লইল। আজ বাড়ির প্রতিটি জিনিস যেন তাহার সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ করিতেছে। এখানে বউ লাল-নটে খেত করিয়াছে। রঙের পাতা মেলিয়া যেন খেতখানি নক্সী করা কাঁথার মত ঝলমল করিতেছে। ওইখানে শশার জাঙলা। হলুদ রঙের ফুলে সমস্ত জাঙলা হাসিতেছে। তারই পাশে শ্রীচন্দনের লতা যেন তাহাদের স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র চাষী-জীবনের সমস্ত স্নেহ-মমতা লইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এগুলি ছাড়িয়া যাইতে কি মন চায়?

তাহাদিগকে বিদায় দিতে মোড়ল আসিয়াছে, মোড়লের বউ আসিয়াছে। আজাহেরের বউ মোড়ল-গিন্নীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বুবুগো! এই সোনার সংসার ছাইড়া আমরা বনবাসে চলোম। আমাগো কতা মনে রাইখ।" মোড়ল-বউ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। আজাহেরের বউ বলিল, "বুবুগো! এইখানে কন্যে-সাজানী সীমের গাছ বুনছিলাম। আইজ লালে নীলে রঙীন পাতায় আমার সমস্ত জাঙলা ভইরা গ্যাছে। আর কয়মাস পরেই নীলা রঙের সীমে সমস্ত জাঙলা ছায়া যাবি! তহন আয়া তুমি এই সীম পাইড়া নিও। আর আমার মত মন্দ-ভাগিনীর কতা মনে কইর। আর শোন বুবু!

এই যে বরবটির চারা ঐছে না? আমার ম্যায়াড়া বড় যত্তনে উয়ারে বুনছিল, পানি না দিলি ওরা শুহাইয়া যাবি। তুমি আইসা মদ্দি মদ্দি ওগো গোড়ায় একটু। পানি ঢাইলা দিও।”

মোড়ল-গিন্নী শুধু নীরবে কাঁদিতে লাগিল। বউ আবার তাহাকে বলিতে লাগিল, “বুবুগো। আমার সোনার গরু দুইডারে লইয়া গ্যাছে। ওগো আমি নিজির পুলাপানগো মতই যত্তন করতাম। বাস্যা গণ্ডা দিনে গাস পাত পাওয়া যায় না। তাই সারা বচ্ছর বইরা কুঁড়া পুঁজি কইরা রাকছিলাম। এই কুঁড়ায় আমার কি অবি? তুমি লইয়া যাও, তোমাগো গরুগুলিরে খাওয়াইও।”

মোড়ল-বউ আজাহেরের স্ত্রীর মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “বউ! এতটুকু তুই এখানে আইছিলি। তারপর পোলা ঐল-ম্যায়া ঐল। তোর গরের কলরব শুইনা আমার পরাণ জুড়াইত। আইজ যে তুই বনবাসে চললি, তোর এই ভিটা শূন্য পইড়া খা খা করব। আমি রইলাম পোড়া কপালী তাই দেখপার জন্যি।”

মোড়ল কান্না রাখিতে পারিল না। কাঁধের গামছার খোট দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। মোড়ল-গিন্নী তার আঁচল হইতে কয়েকটি বীজ বাহির করিয়া আজাহেরের বউকে দিতে দিতে বলিল, “বউ! হুনছি, সেই বন-জঙলের দ্যাশে কিছুই পাওয়া যায় না। এই চালকুমড়ার বীজ কয়টা দিলাম, কোনোখানে বুইনা দিস। সেই গাছে যহন চালকুমড়া ধরবি তখন তোর এই বুবুরে মনে করিস। আর এই সোয়া স্যার কুসুম ফুলের বীজ দিলাম। আজাহেররে কইস মাঠে যেন বুইনা দেয়। চৈত্র মাসে রঙীন অয়া যহন কুসুম ফুল ফুটবি, তহন সেই ফুল দিয়া তোর মায়ার শাড়ী খানা রাঙা কইরা দি।”

.

ধীরে ধীরে রোদ হইয়া আসিতে লাগিল। গ্রামের বহুলোক আজাহেরের উঠানে আসিয়া জড় হইল। আজাহের আগে জানিত না, তাহারা তাহাকে এত ভালবাসে। আজ বিদায়ের দিন তাহাদের সকলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহারা কাদিতে ইচ্ছা করিতেছে। নিজে কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইয়া আজাহের তার স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুদুর তালখানার পথে রওয়ানা হইল। গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, ছোট ছেলে-মেয়ে, প্রায় পঞ্চাশজন বহুদূর পর্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সেই ইদু মল্লিকের তালতলা, সোনাডাঙার বড় বটগাছ, হদু। বেপারীর তালাপ ছাড়িয়া আসিতে আজ কোথাকার কান্নায় আজাহেরের সমস্ত অন্তর ভাঙিয়া যাইতে চাহে। এরাও যে জীবন্ত হইয়া এতদিন তাহার জীবনের সুখের দুঃখের সাথী হইয়াছিল। আজ বিদায়ের বেলা সেই কথাটি আজাহেরের বড় করিয়া মনে পড়িতেছে। কারিকর পাড়ার মোড়ে আসিলে রহিমদ্দী কারিকর আগাইয়া আসিয়া আজাহেরের হাত জড়াইয়া ধরিল, “আজাহের! তুমি তবে চললা?” কারিকরের পায়ে সালাম জানাইয়া আজাহের বলিল, “তোমরা দুয়া কইর চাচা।”– রহিমদ্দী বলে, “আজাহের! বাবছিলাম তোমার যাওনের বেলা আমি দেহা করব না। দুইডা বাতের অভাবেই যে তুমি দ্যাশ ছাইড়া চললা, আমরা তোমারে খাওয়ায়া রাখপার পারলাম না, আল্লা আমাগো এত বদনসীব করছে, সেই জন্যিই আমি পলাইয়াছিলাম। কিন্তু তোমার চাচী হুনল না। এই মশারীখানা নিয়া যাও। হুনছি সেই দ্যাশে ভারী মশার উৎপাত। টানায়া তোমার পুলাপানগো লয়া শুইও। এইডি দিবার জন্যি তোমার চাচী আমারে পাঠাইছে।”

মশারীখানা গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে আজাহের বলিল, “কারিকর চাচা! আর চিরজনমে তোমার গীদ হুনতি পারব না।”

রহিমদ্দী বলিল, “তুই ভাবিস না আজাহের! তাম্বুলখানার আটে আমি কাপড় বেচতি যাব। একদিন তোর ওহানে রাত্রির থাইকা গীদ হুনায়া আসপ।”

গাঁয়ের সব চাইতে বৃদ্ধা কেদারীর মা ভাল করিয়া হাঁটিতে পারে না। তবু আজাহেরকে বিদায় দিতে এত পথ আসিয়াছে। সে আগাইয়া আসিয়া আজাহেরের বউ-এর আঁচলখানি টানিয়া লইয়া বলিল, “বউ! আমি বিধবা মানুষ, আমার ত আর কিছুই নাই। এই মুড়ি চারডা আঁচলে বাইন্দা দিলাম। পথে পুলা-ম্যায়াগো খাইতি দিস।”

এমন সময় মেয়ে-পুরুষ, সমবেত গাঁয়ের লোকদের মোড়ল বলিল, “তোমরা অনেক দূর পর্যন্ত আইছ, আর যায়া কাম নাই। রইদ উইঠা আইল। ওগো তাড়াতাড়ি যাবার দাও।”

আজাহের সকলের দিকে আর একবার ভাল মত চাহিয়া বউকে সঙ্গে করিয়া জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। গ্রামের লোকেরা নীরবে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ তাহাদের দেখা যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে যার যার বাড়িতে চলিয়া গেল।

আজাহের জোরে জোরে পথ চলিতেছে। একটা ছোট বিড়াল ম্যাঁও ম্যাঁও করিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। তাহার করুণ কান্না শুনিয়া আজাহেরের মেয়েটি মার কোল হইতে আধ আধ সুরে বলিল, “বাজান! আমার বিলাইডারে লইয়া যাব–ওডারে আমার কোলে দাও।”

এত দূরের পথ। ছেলে-মেয়ে দুটিকে কোলে লইয়া যাওয়াই অসম্ভব। আবার বিড়ালটিকে কেমন করিয়া তাহারা লইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুতেই বিড়ালটি পিছন ছাড়ে না। কোলের মেয়েটিও বিড়ালটির জন্য কাঁদে। আজাহের একটা লাঠি লইয়া বিড়ালটিকে আঘাত করিল। ম্যাঁও ম্যাঁও কান্নায় বিড়ালটি পাশের বনে যাইয়া লুকাইল। তারপর আর তাহার কান্না শোনা গেল না।

.

১৫.

ঘন জঙ্গলের আড়াল ঘেরা তালখানা গ্রাম। সূর্য এখানে এক ঘন্টা পরে আলোক দেখায়। সূর্য ডোবার এক ঘন্টা আগে এখানে চারিদিকে রাত্র হইয়া যায়। প্রত্যেকটি বাড়িতে আম, কাঁঠাল, সুপারীর বন। তার পাশে বাঁশ ঝাড়, কলার ঝড়, আর নানা আগাছার বন। প্রত্যেকটি গাছের সঙ্গে নাম-না-জানা লতা, এ-গাছের সঙ্গে ও-গাছকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শেয়াল, খাটাস দিনের বেলায়ই নির্ভয়ে সারা গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। বুনো শুয়োরের ঝাক দল বাধিয়া বনের মধ্যে বিচরণ করে। কোন বাড়িতেই বেশী লোকজন নাই। যাহারা আছে তাহাদের পেট উঁচু, বুকের হাড় কয়খানা বাহির করা। এই গ্রামে আসিয়া প্রথমে আজাহের গরীবুল্লা মাতবরের সঙ্গে দেখা করিল।

গরীবুল্লা মাতবর মিনাজদ্দী মাতবরের সম্পর্কে বৈবাহিক। মিনাজদ্দী মাতবর আগেই আজাহেরকে গরীবুল্লা মাতবরের সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া দিয়াছিল।

সারাদিন হাঁটিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া প্রায় সন্ধ্যা বেলা তাহারা গরীবুল্লা মাতবরের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মাতবর বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক টানতেছিল। হঠাৎ এই আগন্তুক লোকদের দেখিয়া আশ্চর্য হইল।

আজাহের মাতবরকে সালাম জানাইয়া কহিল, "আমরা মিনাজদ্দী মাতবরের দ্যাশ অইতে আইছি।"

মোড়ল খুশী হইয়া বলিল, "আরে কুটুমের দ্যাশ অইতে আইছ! তা বইস বাই! বইস।"

তারপর অন্দর-বাড়ির দিকে মুখ লইয়া উঁচু গলায় বলিল, "আরে আমাগো বাড়ির উনি কৈ গ্যাল? এদিক আসুক দেহি। কুটুম আইছে। আজ সকাল বেলা থাইকাই কুটুম-পক্ষি ডাকত্যাছে, তখনই মনে করছিলাম, আইজ কুটুম আইব।"

মোড়লের স্ত্রী হাসি-খুশী মুখে বাড়ির ভিতর হইতে দৌড়াইয়া আসিল। তারপর আজাহেরকে দেখিয়া মুখে লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিল। মাতবর কহিল, "আরে শরম কইর না। বেয়াইর দ্যাশের লোক। শীগগীর ওজুর পানি পাঠায়া দাও। আর শোন, এগো বাড়ির মদ্দি নিয়া যাও।"

মোড়লের স্ত্রী আজাহেরের বউ-এর কোল হইতে মেয়েটিকে টানিয়া বুকে লইল। তারপর আজাহেরের বউকে টানিয়া লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। একটু পরেই ছোট মেয়েটি পানির বদনা এবং খড়ম আনিয়া বৈঠকখানায় রাখিল। মোড়ল মেয়েটিকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ ফুলু! তোর মাকে ক গিয়া বড় মোরগড়া জবাই কইরা দিতি। আইজ বেয়াই-এর

দ্যাশের কুটুমরে বাল কইরা খাওয়াইতি অবি।" মেয়েটি রুমঝুম করিয়া পায়ের খাড়ু বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল।

আজাহের তাহাকে নিষেধ করিবারও সুযোগ পাইল না। এইসব আদর-আপ্যায়নে আজাহের শরমে মরিয়া যাইতেছিল। সে ত কুটুমের মত দু'একদিনের জন্য এদেশে বেড়াইতে আসে নাই। অনাহারী স্ত্রী-পুত্র লইয়া মোড়লের ঘাড়ে একটা ভার হইতে আসিয়াছে। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া মোড়ল তাহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, কে বলিবে? একটি পয়সা সে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিতে পারে নাই। সেই জন্য আগেই আজাহের মোড়লকে তাহার সমস্ত অবস্থা জানাইয়া দেওয়ার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

একটু কাসিয়া বলিল, "মোড়ল সাহেব! আমাগো জন্যি ব্যস্ত অবেন না। আমাগো সগল হুনলি,"–

"আরে মিঞা! সগল কতাই হুনবানি। আগে বইস্যা জিরাও, নাস্তা খাও।"

এমন সময় মোড়লের মেয়ে ফুলু চীনের রেকাবীতে করিয়া মুড়ি, তীলের নাড়, নারকেলের তক্তি–আর একটি বাটিতে করিয়া ঘন আওটা দুধ আজাহেরের সামনে আনিয়া ধরিল। আজাহের কি বলিতে চাহিতেছিল মোড়ল তাহা কানেও তুলিল না, "আরে মিয়া! আগে নাস্তা খায় লও।"

অগত্যা আজাহের হাত পাও ধুইয়া নাস্তা খাইতে বসিল। মোড়ল তাহার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

“আরে মিঞা! তোমরা ঐলা গাঙের দ্যাশের মানুষ, তাও আবার শহরের কাছে বাড়ি। তোমাগো কি আমরা খাতির করতি পারি? এই গই-গিরামে কিবা আছে আর কিবা খাওয়াব?”

আজাহের খাইতে খাইতে মুখ উঠাইয়া বলে, “আরে কি যে কন মোড়ল সাব?”

“কব আর কি আজাহের বাই?” মোড়ল খুশী হইয়া উত্তর করে, “হেবার গেলাম বেয়াইর বাড়িতি! কাছারী গরে কতা কইতাছি, এক দণ্ডও যায় নাই অমনি জিলাপী, হন্দেশ আরও লওয়াজিমা আইন্যা উপস্থিত। কত আর খাব? খাওয়ার পরে বিয়াই কয় চা খাও। চীন্যা-বাটিতে ভইরা চার পানি ত আইন্যা দিল। গরম, মুহি চুমুক দিয়া মুখ পুড়ায়া ফেললাম। তারপর বিয়াইরে কই, ‘বিয়াই! চা ত খাইলাম। এইবার পানি দাও। পানি খাই। বিয়াইন ও-কোণা খাড়ায়া মুহি কাপড় দিয়া আসে। আমি জিজ্ঞাইলাম, আপনার কি অইল বিয়াইন?’ বিয়াই তখন কয়, “তোমার বিয়াইন তোমারে ঠগাইল। চা খায়া পানি খাইতি হয় না। আমি ত এহেবারে নামাকূল আর কি! তোমাগো শহইর্যা দ্যাশের মানষিরী আমরা কি আর খাতির করব? আরে মিয়া! উঠলা যে? ওই উড়মগুলা সবই খাইতি অবি। আর বাটিতে দুধও ত পইড়া রইল?” মোড়ল বাটির সমস্ত দুধ আজাহেরের পাতে ঢালিয়া দিল। নাস্তা খাওয়া শেষ হইলেই মোড়ল নিজের বাশের চোঙ্গা হইতে পান বাহির করিল। পাশের দাখানা লইয়া একটা সুপারি অর্ধেক কাটিয়া আজাহেরের হাতে দিল। “মিঞা! পান-সুপারি খাও।” তারপর খুব গর্বের সঙ্গে বলিতে লাগিল, “পান আমার নিজির বাড়ির, আর সুপারিও নিজির গাছের। চুনডা ক্যাবুল কিনছি।” বলিয়া চুনের পাত্রটি সামনে আগাইয়া দিল। আজাহের পান মুখে দিতে না দিতেই মোড়ল নিজির হাতের হুঁকোটি আনিয়া আজাহেরের হাতে দিল।

বাড়ির ভিতরেও ওদিকে মোড়লের স্ত্রী আজাহেরের বউকে কম খাতির করিল না। ছেলে-মেয়ে দুটি মোড়লের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। মুরগীর ঝোল চুলায় উঠাইয়া দিয়া মোড়লের বউ আজাহেরের বউ-এর চুল লইয়া বসিল।

"পোড়া-কপালী! এমন চুল তোর মাথায়! তাতে ত্যাল নাই।" আঁজলা পুরিয়া তেল লইয়া বউটির মাথায় ঘসিতে বসিল। তারপর বাঁশের চিরুণীখানা লইয়া ভালমত আঁচড়াইয়া সুন্দর করিয়া একটি খোঁপা বাঁধিয়া দিল। "বলি পোড়া-কপালী! দুইদিনের জন্যি ত আইছাস। বালমত আদর কইরা দেই, আমাগো কতা তোর মনে থাকপি।" বউ যেন কি বলিতে যাইতেছিল। মুখে একটা ঠোকনা মারিয়া মোড়ল-গিন্নী বলিল, "বলি আমি তোর বইন অই কিনা? আমার বাড়িতে তুই অযত্তনে থাকপি,–তা দেইখ্যা তোর জামাই। আমারে কি কইব?"

এত আদর-যত্ন পাইয়া আজাহেরের বউ-এরও বড়ই অসোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। ভিখারীর মত তাহারা আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। তাহাদের প্রতি তেমনি ভিখারীর আচরণ করিলেই সে খুশী হইতে পারিত। কিন্তু মোড়ল-গিন্নী একি করিতেছে? তাহাদিগকে আত্মীয়-কুটুম্বের মত যত্ন করিতেছে। এটা ওটা আনিয়া খাওয়াইতেছে। কাল যখন টের পাইবে, তাহারা পেটের ভুখের তাড়নায়ই এদের বাড়িতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে, তখন

জানি ইহারা কি ভাবে তাহাদের গ্রহণ করিবে? কিন্তু মোড়ল-গিন্নীর মুখোনি যেন সকল দুনিয়ার মমতায় ভরা। রোগা একহারা পাতলা গঠন, বয়স পাঁচ চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু মুখের হাসিখানি কি করুণ আর মমতায় ভরা। মা বলিয়া কোলে ঝাপাইয়া পড়িতে

ইচ্ছা করে। তাকেও আজাহেরের বউ দুই চার বার তাহাদের সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলিবার জন্য চেষ্টা করিল। মোড়ল-গিন্নী সেদিকে কানও দিল না।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে একখানা ঘরে মোড়ল আজাহেরদের শুইবার দিল। মোড়ল-গিন্নীর সুবন্দোবস্তে আজাহেরের ছেলে-মেয়ে দুইটি আগেই বিছানার এক পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আজাহেরের ছেলে বছির

১৬.

রাত্র শেষ না হইতে আজাহেরের ছেলে বছির জাগিয়া উঠিল। চারিদিকের বনে কত রকমের পাখিই না ডাকিতেছে। মাঝে মাঝে কাঠ-ঠোকরা শব্দ করিতেছে। দল বাধিয়া শিয়ালেরা মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। আর বনের ভিতর হইতে শো শো শব্দ আসিতেছে। এক রহস্য মিশ্রিত অজানা ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কখন সকাল হইবে। কখন সে তাহার সদ্য পরিচিত খেলার সাথীদের সঙ্গে এই অজানা। দেশের রহস্য উদঘাটিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

এমন সময় ফুলু আসিয়া ডাক দিল, “বছির-বাই, আইস। আমরা তাল কুড়াইবার যাই।” তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বছির বাহির হইয়া পড়িল। মোড়লের পুত্র নেহাজদ্দী আর গেদাও উঠানে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া পানা-পুকুরে ডুবান একটা ডোঙ্গা পেঁচিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। নেহাজী হাতে লগি লইয়া অতি নিপুণভাবে ডোঙ্গাখানিকে ঠেলিয়া আঁকাবাঁকা নাও দাঁড়া বাহিয়া ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়া সেই বেত ঝাড়ের অন্ধকারে তালগাছ তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পানির উপরে রাশি রাশি তাল ভাসিয়া বেড়াইতেছিল? যেন তাহাদেরই ছোট ছোট খেলার সাথীগুলি। সকলে মিলিয়া কলরব করিয়া তালগুলিকে ধরিয়া ডোঙ্গায় উঠাইতে লাগিল। তারপর তাল টোকান প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঘন জঙ্গলের আড়ালে লতা পাতার আবরণে দু’একটা তাল তখনও লুকাইয়াছিল।

এবার সেই তালগুলির যেটি যে আগে দেখিতে পাইবে সেটি তাহারই হইবে। দেখা যাক কার ভাগে কয়টি তাল পড়ে। যার ভাগে বেশী তাল পড়িবে সে লগি দিয়া ডোঙা ঠেলিয়া লওয়ার সম্মান পাইবে। তাল খুঁজিতে তখন তাহাদের কি উৎসাহ, "মিয়া-বাই! ওইদিকে লগি ঠ্যাল, ওই যে একটা তাল, ওই যে আর একটা।" ফুলেরই মতন মুখোনি নাচাইয়া ফুলী বলে। এইভাবে তাল টুকাইয়া দেখা গেল, ফুলীর ভাগেই বেশী তাল হইয়াছে। বড় ভাই নেহাজদ্দী বড়ই মনমরা হইয়া তাহার লগি চালানোর সম্মানটি ছোট বোনকে দিতে বাধ্য হইল। কোমরে আঁচল জড়াইয়া ফুলী লগি লইয়া ডোঙা ঠেলিতে। লাগিল। সামনে দিয়া দুই তিনটি সাপ পালাইয়া গেল। একটা সাপ ত ডোঙর মাথায়ই। একেবারে পেচাইয়া গেল। বছির ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আর সাপ–সাপ, কামুড় দিবি!" অতি সন্তর্পণে লগির মাথা দিয়া সাপটিকে ছাড়াইয়া ফুলী খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার ভাই দুটিও বোনের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। ইহারা মানুষ না কি! সাপ দেখিয়া ভয় করে না! বছিরের বড় গোস্বা হইল।

ফুলী পূর্বেরই মত হাসিতে হাসিতে বলিল, "বছির-বাই! ওগুলো গাইছা সাপ। আমাগো কি করব?"

"ক্যান কামুড় দ্যায় যদি?" বছির বলিল।

পূর্ববৎ হাসিতে হাসিতে ফুলী বলিল, "কামুড় কেমন কইরা দিবি, আমার হাতে লগি নাই? এক বাড়িতি মাথা ফাটায়া দিব না?" কিন্তু বছির ইহাতে কোনই ভরসা পাইল না। পথে আসিতে আসিতে পুকুর হইতে তাহারা অনেক ঢ্যাপ-শাপলা তুলিল। বছিরের কিন্তু একাজে মোটেই উৎসাহ লাগিতেছিল না। কোন সময় আর একটা সাপ আসিয়া ডোঙা

পেচাইয়া ধরিবে কে জানে। কিন্তু তাহাদের দুই ভাই-বোনের উৎসাহের সীমা নাই। এখানে ওখানে অনেক ঢ্যাপ কুড়াইয়া তাহারা বাড়ির ঘাটে আসিয়া ডোঙা ভিড়াইল। তখন বাড়ির। সকল লোক উঠিয়াছে। মোড়ল ঘাটে মুখ হাত ধুইতে আসিয়াছিল। ছেলে-মেয়েদের এই অভিযানের সাফল্য দেখিয়া তাহাদিগকে তারিফ করিল। ইহাতে তাহাদের সারা সকালের সমস্ত পরিশ্রম যেন সার্থক হইয়া উঠিল। ফুলী তার ফুলের মত মুখোনি দুষ্টামীতে ভরিয়া বলিল, "বাজান! ডোঙার আগায় একটা গাইছা সাপ বায়া উঠছিল। তাই দেইখা বছির-বাই একেবারে বয়ে চিক্কর দিয়া উঠছে।" শুনিয়া মোড়ল একটু হাসিল। ইহার ভিতর। কি তামাসার ব্যাপার আছে বছির তাহা বুঝিতে পারিল না।

.

১৭.

পাঁচ ছয়দিন কাটিয়া গেল। আজাহের কিছুতেই গরীবুল্লা মাতবরকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবার অবসর পাইল না। যখনই সে মাতবরকে সমস্ত বলিতে গিয়াছে, মাতবর কৌশলে অন্য কথা পাড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে তাহাদের সম্মানে মাতবর গ্রামের সমস্ত লোককে দাওয়াত দিয়াছে। আজ দুপুরে খাসী জবাই করিয়া বড় রকমের ভোজ হইবে। নিমন্ত্রিত লোকেরা প্রায় সকলেই আসিয়া গিয়াছে। এইসব আত্মীয়তার অতি সমাদর আজাহের কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। আজ যেমন করিয়াই হোক সে মাতবরকে সমস্ত খুলিয়া বলিবে। ইতিমধ্যে সে বহুবার মাতবরের বাড়িতে এটা ওটা কাজ করিতে গিয়াছে। হালের লাঙল

লইয়া মাঠে যাইতে চাহিয়াছে, মাতবর তার কাধ হইতে লাঙল কাড়িয়া লইয়াছে, হাত হইতে কাস্তে কাড়িয়া লইয়াছে। বলিয়াছে "কুটুমির দ্যাশের মানুষ। মিঞা! তুমি যদি আমার বাড়িতি কাম করবা, তয় আমার মান থাকপ? কুটুম বাড়িতে আইছ। বাল মত খাও দাও, এহানে ওহানে হাইট্যা বেড়াও, দুইডা খোশ গল্প কর।" আজাহের উত্তরে যাহা বলিতে গিয়াছে, মাতবর তাহা কানেও তোলে নাই। অন্দরমহলেও সেই একই ব্যাপার। আজাহেরের বউও এটা ওটা কাজ করিতে গিয়াছে, ধান লইয়া কেঁকিতে পাড় দিতে গিয়াছে, হাঁড়ি-পাতিল লইয়া ধুইতে গিয়াছে, মোড়লের বউ আসিয়া তাহাকে ঢেঁকি-ঘর হইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, হাত হইতে হাঁড়ি-পাতিল কাড়িয়া লইয়াছে; আর অভিযোগের সুরে বলিয়াছে, "বলি বউ! হাঁড়ি দিয়া কি করবার লাগছাস? কুটুমবাড়িতি আয়া তুই যদি কাম করবি, তয় লোকে কইব কি আমারে? কত কাম কাইজির বাড়ির থইন্যা আইছাস, এহানে। দুইদিন জিড়া। হাড় কয়খানা জুড়াক।"

আজাহের যখন এইসব লইয়া তাহার বউ এর সঙ্গে গভীর পরামর্শ করিতে বসিয়াছে, তখন মোড়লের বউ আসিয়া বেড়ার ফাঁকে উঁকি মারিয়া বলিয়াছে, "বলি বিয়াইর দ্যাশের কুটুমরা কি গহীন কতা কইবার লাগছে। তা ক-লো বউ ক'। এক কালে আমরাও অমনি কত কতা কইতাম। কতা কইতি কইতি রাত কাবার অয়া যাইত, তবু কতা ফুরাইত না।"

লজ্জায় বউ তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পালাইয়া গিয়াছে। মোড়ল-গিনী উচ্চ হাসিয়া। বলিয়াছে, "কি-লো বউ! পালাইলি ক্যান? তোবা, তোবা, কান মলা খাইলাম আজাহের। বাই। আর তোমাগো নিরাল-কতার মদ্দি আমি থাকপ না। না জানি তুমি আমারে মনে। মনে কত গালমন্দ করত্যাছ?"

কলরব শুনিয়া মোড়ল আসিয়া উপস্থিত হয়। “কি ঐছে? তোমরা এত আসত্যাছ ক্যান?” মোড়লের কানে কানে মোড়ল-গিন্নী কি কয়। মোড়ল আরো হাসিয়া উঠে। আজাহের কয়, “আরে বাবিসাব কি যে কন? আমরা কইত্যাছিলাম .....”

“তা বুঝছি, বুঝছি আজাহের বাই! কি কইত্যাছিলা তোমরা নিরালে। তবে আজ কান মলা খাইলাম তোমাগো গোপন কতার মদ্দি আড়ি পাতপ না।” লজ্জায় আজাহের ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। মোড়ল আর মোড়ল-গিন্নী হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। ওদিকে ঘোমটায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া আজাহেরের বউ লজ্জায় মৃত্যু কামনা করে।

এ কয়দিন সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াইয়া আজাহেরের নিকট এই গ্রামটিকে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছে। এ গ্রামে কেহ কাহারও সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করে না। কাহারও বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ নাই। গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। সন্ধ্যা হইলেই তাহারা কাঁথার তলে যাইয়া জ্বরে কাঁপিতে থাকে। সকাল হইলেই আবার যে যাহার মত উঠিয়া পান্তা-ভাত খাইয়া মাঠের কাজ করিতে বাহির হইয়া যায়। কেউ কোন ডাক্তার ডাকে না। আর ডাক্তার ডাকিবার সঙ্গতিও ইহাদের নাই। গলায় মাদুলী ধারণ করিয়া কিংবা গ্রাম্য-ফকিরের পড়া-পানি খাইয়াই তাহারা চিকিৎসা করার কর্তব্যটুকু সমাধা করে। তারপর রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে একদিন চিরকালের মত পরাজিত হইয়া মৃত্যুর তুহীন শীতল কোলে নীরবে ঘুমাইয়া পড়ে। কাহারও বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ নাই। কাহারও উপরে তাহাদের মনে কোনদিন। কোন ক্ষোভ জাগে না।

সকলেরই পেট উঁচু, বুকের হাড় কয়খানা বাহির করা, বেশী পরিশ্রমের কাজ কেহ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার প্রয়োজনও হয় না। এদেশের মাটিতে সোনা ফলে। কোন রকমে লাঙলের কয়টা আঁচড় দিয়া মাটিতে ধানের বীজ ছড়াইয়া দিলেই আসমানের কালো মেঘের মত ধানের কচি কচি ডগায় সমস্ত মাঠে ছড়াইয়া যায়। আগাছা যাহা ধানখেতে জন্মায় তাহা নিড়াইয়া ফেলার প্রয়োজন হয় না। বর্ষার সময় আগাছাগুলি পানির তলে ডুবিয়া যায়! মোটা মোটা ধানের ডগাগুলি বাতাসের সঙ্গে দুলিয়া লক লক করে। কিন্তু এদেশে শূকরের বড় উৎপাত। রাত্রে শূকর আসিয়া ফসলের খেত নষ্ট করিয়া যায়। বন। হইতে বাঘ আসিয়া গোয়ালের গরু ধরিয়া লইয়া যায়। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রেহাই পাইয়া গ্রামে যাহারা ভাল থাকে তাহারা সারা রাত্র জাগিয়া আগুন জ্বালাইয়া টিন বাজাইয়া শূকর খেদায়, বাঘকে তাড়া করে। তাই পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদের সুযোগ তাহাদের ঘটে না। তাহাদের বিবাদ বুনো শূকরের সঙ্গে, হিংস্র বাঘের সঙ্গে। এইসব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাড়ার সকল লোকের সমবেত শক্তির প্রয়োজন। সেই জন্য গ্রামের লোকেরা এক ডাকে উঠে বসে। একের বিপদে অপরে আসিয়া সাহায্য করে। শহরের নিকটের গ্রামগুলির মত এখানে দলাদলি মারামারি নাই; মামলা-মোকদ্দমাও নাই।

পূর্বে বলিয়াছি নতুন কুটুমের সম্মানে মোড়ল গ্রামের সব লোককে দাওয়াৎ দিয়া আসিয়াছে। নিমন্ত্রিত লোকেরা আসিয়া গিয়াছে। কাছারী-ঘরে সব লোক ধরে না। সেইজন্য উঠানে মাদুর বিছাইয়া সব লোককে খাইতে দেওয়া হইল। আজাহেরকে সকলের মাঝখানে বসান হইল। তার পাশেই গরীবুল্লা মাতবর আসন গ্রহণ করিল। নানা গল্প-গুজবের মধ্যে আহার চলিতে লাগিল। সকলের দৃষ্টি আজ আজাহেরের দিকে। শহরের কাছে তাহার বাড়ি, তাতে সে আবার মোড়লের কুটুম্ব। সে কেমন করিয়া খায়,

কেমন করিয়া কথা বলে, কেমন করিয়া হাসে, সকলেই অতি মনোযোগের সহিত সেদিকে দৃষ্টি দিতে লাগিল। তাহারা অনেকেই শহরে যায় নাই। শহরের বহু রোমাঞ্চকর আজগুবি-কাহিনী শুনিয়াছে। আজ শহরের কাছের এই লোকটি তাই তাহাদের নিকট এত আকর্ষণের।

এত সব যাহাকে লইয়া সেই আজাহের কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। এই সব জাঁকজমক আজাহেরকে তীব্র কাটার মত বিদ্ধ করিতেছিল। মোড়ল যখন জানিতে পারিবে, সে এখানে আত্মীয় কুটুম্বের মত দুইদিন থাকিতে আসে নাই–সে আসিয়াছে। ভিখারীর মত পেটের তাড়নায় ইহাদের দুয়ারে দয়া প্রার্থনা করিতে; তখন হয়ত কুকুরের মত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু আজই ইহার একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাওয়া ভাল। আজাহের মরিয়া হইয়া উঠিল। তিন চারবার কাশিবার চেষ্টা করিয়া মোড়লের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আজাহের বলিল, "মোড়ল সাহেব! আমার একটা কতা।" মোড়ল বলিল, "মিঞারা! তোমরা চুপ কর। আমার বিয়াইর দ্যাশের কুটুম কি জানি কইবার চায়।" একজন বলিয়া উঠিল, "কি আর কইব! কুটুম বুঝি আমাগো চিনি-সন্দেশ খাওয়ানের দাওয়াৎ দিতি চায়!" সকলে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু আজাহের আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত ব্যাপার আজ সকলকে না জানাইয়া দিলে কিছুতেই সে সোয়াস্তি পাইবে না।

আবার একটু কাশিয়া আজাহের বলিতে আরম্ভ করিল, "মোড়ল সাহেব! সেঁতের শেহলার মত ভাসতি ভাসতি আমি আপনাগো দ্যাশে আইছি। আমি এহানে মেজবান-কুটুমের মত দুইদিন থাকপার আসি নাই। আমি আইছি চিরজনমের মত আপনাগো গোলামতী করতি।" এই পর্যন্ত বলিয়া সভার সব লোকের দিকে সে চাহিয়া দেখিল; তাহারা কেহ

টিটকারী দিয়া উঠিল কি না। কিন্তু সে আশ্চর্য হইয়া দেখিল তাহার কথা সব লোক নীরবে শুনিতেছে। তখন সে আবার আরম্ভ করিল, "বাই সব! আমারও বাড়ি-ঘর ছিল, গোয়ালে দুইডা যুয়ান যুয়ান বলদ ছিল, বেড়ী ভরা ধান ছিল; কিন্তু মহাজনে মিথ্যা দিনার দায়ে নালিশ কইর‍্যা আমার সব নিল্যাম কইরা নিয়া গ্যাছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া আজাহের গামছার কানি দিয়া চোখ মুছিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আধবেলা খায়া উপাস কইরা তবু ভিট্যার মাটি কামড়ায়া ছিলাম। কিন্তুক পুলাপানগুলা

যহন বাত বাত কইরা কানত, তখন আর জানে সইত না। আমাগো মোড়ল মিনাজদ্দী মাতবর তহন কইল, আজাহের! যা, তাম্বুলখানা আমার বিয়াই গরীবুল্লা মাতবরের দ্যাশে যা। তানি তোর একটা কূল-কিনারা করব।"

এই বলিয়া আজাহের আবার কাঁদিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সমবেত গ্রাম্য লোকদেরও দুই একজনের চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠিল। মোড়ল নিজের গামছার খোট দিয়া আজাহেরের চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "আজাহের বাই! কাইন্দ না। খোদা যহন তোমারে আমার এহানে আইন্যা ফেলাইছে, তহন একটা গতি হবিই।" আজাহের কি বলিতে যাইতেছিল। মোড়ল তাহাকে থামাইয়া বলিল, "আর কইবা কি আজাহের বাই? তুমি যেদিন পরথমে আইছ, সেই দিনই বুঝতি পারছি, শোগা-ভোগা মানুষ তুমি প্যাটের জ্বালায় আইছ আমাগো দ্যাশে। আরে বাই। তাই যদি বুঝতি না পারতাম তয় দশ গিরামে মাতবরী কইরা বেড়াই ক্যান? কিন্তুক তুমি তোমার দুস্কির কতা কইবার চাইছ, আমি হুনি নাই। কেন হুনি নাই জান? তোমার দুস্কির কতা আমি একলা হুনব ক্যান? আমার গিরামের দশ বাইর সঙ্গে একাত্তর বইসা হুনুম। তোমার জন্যি যদি কিছু করনের অয় তবে দশজনে মিল্যা করুম।" এই পর্যন্ত বলিয়া মোড়ল সকলের মুখের দিকে

একবার তাকাইয়া লইল। মোড়ল যে এমনি একটা সামান্য ব্যাপারেও তাহাদের দশজনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিয়াছে, এজন্য মোড়লের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তাহাদের মনের ভাব এমনই হইল যে, দরকার হইলে তাহারা মোড়লের জন্য জান পর্যন্ত কোরবানী করিয়া দিতে পারে। তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া মোড়ল ইহা বুঝিতে পারে। বহু বৎসর মোড়লী করিয়া তাহার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে। মোড়ল আবার সমবেত লোকদের ডাকিয়া কহিল, "কি বল বাইরা! আজাহের মিঞারে তবে আমাগো গিরামে আশ্রয় দিবা তোমরা?" সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "তারে আমরা বুকি কইরা রাখপ।"

"শুধু মুহির কতায় কি চিড়্যা ভেজে মিঞারা? কি ভাবে বুকি কইরা রাখপা সে কতাডা আমারে কও?"

সম্মুখ হইতে দীনু বুড়ো উঠিয়া বলিল, "মাতবরের পো! আমার ত পুলাপান কিছুই নাই। মইরা গ্যালে জমি-জমা সাতে-পরে খাইব। আমার বাঘার ভিটাডা আমি আজাহের বাইর বাড়ি করবার জন্যি ছাইড়া দিলাম। এতে আমার কুনু দাবি-দাওয়া নাই।"

দীনু বুড়োর তারিফে সকলের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

এ-পাশ হইতে কলিমদ্দী উঠিয়া বলিল, আজাহের-বাইর বাড়ি করতি যত ছোন লাগে সমস্ত আমি দিব।"

তাহের নেংড়া বহু দূরে বসিয়া ছিল। সে নেংড়াইতে নেংড়াইতে কাছে আসিয়া বলিল, “তোমার বাড়ি করতি যত বাঁশ লাগবি, আমার ছোপের ত্যা তুমি কাইটা নিয়া যাবা আজাহের-বাই।”

মোড়ল তখন চারিদিক চাহিয়া বলিল, “থাকনের ভিটা পাইলাম, গর তোলনের ছোন পাইলাম। বাশও পাইলাম। কিন্তুক আজাহের বাই ত একলা বাড়ি-গর তুলতি পারবি না?”

সকলে কলরব করিয়া উঠিল, “আমরা সগ্যলে মিল্যা আজাহের-বাইর নতুন বাড়ি তুল্যা দিব। কাইল-ই কাম আরম্ভ কইরা দিব।”

“ক্যাবল কাম আরম্ভ করলিই অবি না। কাইলকার দিনির মদ্দি আজাহের-বাইর নতুন বাড়ি গড়ায়া দিতি অবি। বুঝলানি মিঞারা? পারবা ত?” মোড়ল জিজ্ঞাসা করিল।

সকলে কলরব করিয়া উঠিল, “পারব।”।

“তা ঐলে এই কতাই ঠিক। কাইল সন্ধ্যার সময় আমি দাওয়াৎ খাইতি যাব। আজাহের-বাইর বাড়িতি। দেখি মিঞারা! তোমাগো কিরামত কতদূর।” এই বলিয়া মোড়ল প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। আজাহেরের জন্য ইতিমধ্যে গ্রামের লোকদের মধ্যে যে যতটা স্বার্থত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল, সেই দৃষ্টির বিনিময়ে তাহা যেন স্বার্থক হইয়া গেল।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আজাহেরের মনে হইতেছিল সে যেন কোন গ্রাম্য-নাটকের অভিনয় দেখিতেছে। মানুষের অভাবে মানুষ এমন করিয়া সাড়া দেয়? আনন্দের অশ্রুতে তার দুইচোখ ভরিয়া আসিল।

মোড়ল তখন আজাহেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "আজাহের-বাই! তোমার দুস্কির কতা তুমি আমারে একলারে হুনাইবার চাইছিলা? কিন্তু সেই হোননের কপাল ত আমার নাই। হেই দিন যদি আমার থাকত তবে গিরামের মানুষ ট্যারও পাইত না, ক্যামুন কইরা তুমি আইল্যা। কাক-কোকিলি জানার আগে তোমার গর-বাড়ি আমি তুল্যা দিতাম। বাগের মত যুয়ান সাতটা ভাজন বেটা ছিল। এক দিনের ভেদ-বমিতে তারা জনমের মত

আমারে ছাইড়া গেল। তারা যদি আইজ বাইচ্যা থাকত, তবে তুমি যেইদিন আইছিলা, হেইদিন রাত্তিরেই তোমার নতুন গর-বাড়ি তুল্যা দিতাম। আইজ গিরামের মানুষ ডাইকা তোমার গর-বাড়ি তুলবার কইছি।"

আজাহের কি যেন বলিতে যাইতেছিল। মোড়ল তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "আরে বাই! তুমি ত পরথমে গিরামের লোকগো কাছে আস নাই। আইছিলা আমার কাছে। আমি তোমার জন্যি কিছুই করবার পারলাম না। আমার পুলারা যদি আইজ বাইচ্যা থাকত?" গামছার খোট দিয়া মোড়ল চোখের পানি মুছিতে লাগিল।

পাশে বাবরী-চুল মাথায় মোকিম বসিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "মোড়ল-ভাই! আপনি কানবেন না। আমরা আপনার পোলা না? আমরা গেরামের সকল পোলাপান মিল্যা আজাহের-বাইর বাড়ি-গর তুল্যা দিব।"

"আরে মোকিম! তুই কি কস?" গামছার খোটে চোখের পানি মুছিতে মুছিতে মোড়ল বলে, "হেই গিরামের মানুষই কি সব আছে? কি দেখছিলাম, আর কি দেখপার জন্যি বইচ্যা আছি? এই গিরামে ছিল হাসেন নিকারী, কথায় বলে হাসেন নিকারীর খ্যালা, তিনডা ভেঁকি হাতের উপর লয়া শূন্যের উপর খেলা দেখাইত। তারোয়ালখানা ওই নাইরকেল গাছটার উপর ছুঁইড়্যা ফেলাইত, বো বো কইরা তারোয়াল যায়া গাছের নাইরকেল কাইট্যা আইন্যা আবার ফিরা আইস্যা হাসেন নিকারীর পায়ের কাছে সেলাম জানাইত।"

দীনু বুড়ো বলিয়া উঠিল, "আপনার মনে নাই বড়-মিঞা! ওই জঙ্গলডার মদ্দি ছিল হাকিম চান আর মেহের চান্দের বাড়ি, দুইজনে যহন জারীগান গাইত বনের পশু-পক্ষী গলাগলি ধইরা কানত?"

"মনে নাই ছোটমিঞা?" মোড়ল বলে, "ফৈরাতপুরির মেলায় যায় গান গায়া রূপার দুইডা ম্যাডাল না কি কয়, তাই লয়া আইল। আমার সামনে তাই দেখায়। কয়, "মোড়ল, এই দুইডা আমাগো বাবির পরন লাগবি। পাগলা কানাইর সঙ্গে গান গায়া তারে হারায়া আইছি। তারই পুরস্কারি পাইছি এই দুইডা, আমাগো বাবি যেন গলায় পরে। অনেক মানা করলাম, অনেক নিয়ারা করলাম, হুনল না। হেই দুইডা মেডিল এহনো আমার বাড়িওয়ালীর গলায় আছে। কিন্তুক হেই মানুষ আইজ কোথায় গেল?"

"মনে আছে বড়মিঞা?" দীনু বুড়ো আগাইয়া আসিয়া কয়, "দিগনগরের হাটের মদ্দি আমাগো গিরামের হনু গেছিল কুশাইর বেচতি, কি একটা কতায় মুরালদার লোকেরা

দিল তারে মাইর। আমাগো গিরামের কমিরদ্দী গেছিল মাছ কিনতি। হুইন্যা, একটা আস্ত জিকা গাছ ভাইঙ্গা সমস্ত মুরালদার মানষিরে আট থইনে বাইর কইর‍্যা দিয়া আইল।”

“মনে সবই আছে ছোট-মিঞা! সেই কমিরীর ভিটায় আইজ ঘু ঘু চরত্যাছে। সন্ধ্যা-বাত্তি জ্বালনের একজনও বাইচ্যা নাই।” একটা দীর্ঘ নিশ্বাস লইয়া মোড়ল আবার বলিতে আরম্ভ করিল, “আমাগো তাম্বুলখানার গিরামখানা গমগম করত মানষির। কতাবার্তায়। এ যেন কালকার ঘটনা। স্বপনের মতন মনে হইত্যাছে। রাত-দিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি গান, কত আসি, কত তামাসা? এই ম্যালোয়ারী বিমারে সব শেষ কইর‍্যা দিল। আর কি সেই সব দিন ফিরা পাব? গোরস্তানের মদ্দি বুইড়্যা পাহাড়াদার খাড়ায়া আছি। নিজের দুস্কির কতা তোমাগো আর কয়া কি করব? সারা রাইত আমার গুম আসে না। জনমের মত যারা চইল্যা গ্যাছে গিরাম ছাইড়া, নিশির রাত্তিরকালে গোরের থইনে উইঠ্যা তারা আমারে জিগায়, ‘মোড়ল! আমরা ম্যালোয়ারীতে মরলাম, তোমার গিরামের কোন মানুষ এমন হেকমত কি কোন দিন বাইর করতি পারবি, যাতে ম্যালোয়ারী জ্বরের হাত। থইনে আমাগো আওলাদ-বুনিয়াদ যারা বাইচ্যা আছে তাগো বাঁচাইতে পারে? এ কতার আমি কুনু জবাব দিব্যার পারি না। নিজের দুস্কির কাহিনী কইলে ফুরাইবার নয়। আর কত কমু? বাইরা! তোমরা যার যার বাড়ি যাও। আমারও শরীরডা জ্বরায়া আসত্যাছে। এহনই কাঁথার তলে যাইতি অবি। কিন্তুক কাইলকার কতা যেন মনে থাহে। আমি সন্ধ্যা। বেলা যাব নতুন বাড়িতি দাওয়াৎ খায়নের লাগ্যা।”

গ্রামের লোকেরা যে যার মত বাড়ি চলিল। অনেকেরেই শরীরে মৃদু জ্বরের কাঁপন অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত ছাপাইয়া কি একটা গভীর বিষাদে যেন সকলের অন্তর ভরা।

অতীত দিনের অন্ধকারতল হইতে মোড়ল আজ এই গ্রামের যে বিস্মৃত গৌরব-কথার খানিক প্রকাশ করিল, তাহার মৃদু স্পর্শ সকলকেই অভিভূত করিয়া তুলিতেছে।

.

১৮.

সন্ধ্যার কিছু আগেই লাঠি ভর দিয়া মোড়ল আজাহেরের নতুন বাড়ি দেখিতে আসিল। আসিয়া যাহা দেখিল, মোড়লও তাহাতে তাজ্জব বনিয়া গেল। বাঘার ভিটার মাঝখানে দু'খানা ঘর উঠিয়াছে। ঘরের পাশে ধরন্ত কলাগাছ। উঠানের একধারে জাঙলায় শ্রীচন্দনের লতা, তাহাতে রাশি রাশি শ্রীচন্দন ঝুলিতেছে। উঠানের অন্য ধারে লাল নটের খেত। কার যেন রাঙা শাড়িখানা রৌদ্রে শুখান হইতেছে।

"ছ্যামড়ারা তোরা ত যাদু জানস্ দেহি! এত সমস্ত কোন হেকমতে করলিরে তোরা?" কথা শুনিয়া সমস্ত লোক কলরব করিয়া মোড়লকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মোড়ল-গিন্নী ঘরের ভিতর হইতে ডাকিল, "আমাগো বাড়ির উনি এদিক আসুক একটু।" ঘরের মধ্যে যাইয়া মোড়ল আরো অবাক হইয়া গেল। ঘরের চালার আটনে একটা ফুলচাঙ পাতা। তাহার সঙ্গে কেলীকদম্ব সিকা, সাগরফানা সিকা, আসমান তারা সিকা, কত রঙ বেরঙের সিকা ঝুলিতেছে। সেই সব সিকায় মাটির বাসন। ছোট ছোট (হড়ি) বাতাসে দুলিতেছে। ঘরের বেড়ায় কাদা লেপিয়া চুন-হলুদ আর আলো-চালের গুঁড়া দিয়া নতুন নকসা আঁকা হইয়াছে। মোড়ল বুঝিতে পারিল তাহার গৃহিণী সমস্ত গায়ের মেয়েদের লইয়া সারা দিনে এইসব কাণ্ড করিয়াছে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মোড়ল খুব তারিফ

করিল, “বলি তোমরাও ত হেকমত কম জান না?” শুনিয়া খুশীতে ঘরে উপবিষ্ট সমবেত মেয়েদের মুখ রঙীন হইয়া উঠিল। মোড়লের বউ তখন বলিতে লাগিল, “এই সিকাডা দিছে বরান খার বউ, এইডা দিছে কলিমদ্দীর ম্যায়া, আর এই সিকাডা দিছে মোকিমির পরিবার।”

মোড়ল বলিল, “বড় সুন্দর ঐছে। আমাগো গিরামে এমন কামিলকার আছে আগে জানতাম না।” বলিতে বলিতে মোড়ল বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

মোকিম বুড়ো তখন আসিয়া বলিল, “মোড়ল-বাই! তুমি না কইছিল্যা আজাহেরের বাড়ি আইজ খাইবা। সামান্য কিছু খিচুড়ী রান্না ঐছে। তুমি না বসলি ত ছ্যামড়ারা উয়া মুহি দিবি না।”

“তয় তোমরা কোনডাই বাহি রাহ নাই। আইজ বুঝতি পারলাম তোমাগো অসাদ্য কোনু কাম নাই,” বলিয়া মোড়ল আসিয়া খাইতে বসিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে যাহাদের ইতিমধ্যেই জ্বর আসিয়াছে তাহারা যাহার যাহার বাড়ি চলিয়া গেল; অবশিষ্ট লোকেরা একতারা দোতারা বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল। প্রায় অর্ধেক রাত অবধি গান গাহিয়া যে যাহার বাড়িতে চলিয়া গেল। আজাহের নতুন ঘরে ছেলে-মেয়ে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত না হইতেই চারিধারের বন হইতে কত রকমের পাখি ডাকিয়া উঠিল। সেই পাখির ডাকে আজাহেরের ছেলে বছিরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এখনও ভাল মত সকাল হয় নাই। বছিরের কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। পাশেই তার ছোট বোন বড়

অঘোরে ঘুমাইতেছে। সে বড়কে ডাকিয়া বলিল, “ও বড়ু উঠলি না? চল গুয়া কুড়ায়া আনি।” বড়ু। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

দুই ভাই-বোনে অতি সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। মা বাপ জাগিলে হয়ত এত ভোরে তাহাদের বাহিরে যাইতে দিবে না।

সুপারি গাছের তলায় আসিয়া দেখে, বাদুড়ে কামড়াইয়া কত সুপারি ফেলিয়া গিয়াছে। দুই ভাই-বোনে একটি একটি করিয়া সুপারি কুড়াইয়া এক জায়গায় আনিয়া জড় করিয়া ফেলিল। কড়াইতে কি আনন্দ!

“ওই একটা–ওই একটা, মিঞা বাই! তুমি ওদিক কুড়াও। এদিকটা আমার,” বলিয়া। বড়ু একটু জঙ্গলের মধ্যে গিয়াছে, অমনি একটা বন-সজারু সামনে দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল, “ও মিঞা বাই! এইডা যেন কি?”

বছির দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, “বড়ু! ডরাইস না। ওডা সজারু। আয় দেহি, জঙ্গলের মদ্দি সজারুর কাটা আছে কিনা। সজারুর কাঁটা দিয়া বেশ খেলা করা যায়।” দুই ভাই-বোনে তখন জঙ্গলের মধ্যে সজারুর কাটা খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে আজাহের ঘুম হইতে উঠিয়া ভাবিতে বসিল। নতুন বাড়ি ত তাহার হইল। কিন্তু তাহারা খাইবে কি! অবশ্য সাত আট দিনের আন্দাজ চাল ডাল মোড়ল গিন্নী দিয়া গিয়াছে। তাহা ফুরাইতে কয়দিন? পরের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া কয়দিন চালান যাইবে? ভাবিয়া ভাবিয়া আজাহের কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আবার কি সে আগের মত জন খাঁটিয়া মানুষের বাড়িতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে? কিন্তু যেখানে

লোকে তাহাকে এত আদর-যত্ন করিয়াছে তাহাদের বাড়িতে জন খাঁটিতে গেলে কি সেই খাতির থাকিবে? আর জন খাঁটিয়া যাহারা খায় গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে সম্মানের চোখে। দেখে না। আজাহের ভাবিল, আজ যদি তাহার গরু দুইটি থাকিত তাহা হইলে সে লাঙ্গল লইয়া খেত চষিতে পারিত। কিন্তু খেত চষিতে গেলেও বীজধান লাগে! আর খেতে ধান ছড়াইয়া দেওয়া মাত্রই তো ফসল ফলে না। বউকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস করে, "কও ত এহন কি কাম করি?"

বউ ভাবিতে বসে। অনেক ভাবিয়া বলে, "আমি একটা কতা কইবার চাই। এহানকার জঙ্গলে কত কাঠ। তুমি কাঠ ফাঁইড়া খড়ি বানায়া ফইরাতপুরির বাজারে নিয়া বিককিরি।

"ভাল কতা কইছাও বউ। এইডাই কয়দিন কইরা দেহি।" বলিয়া আজাহের মোড়ল-বাড়ি হইতে কুড়াল আনিয়া জঙ্গলের মধ্যে গেল। যাইয়া দেখে তাহার ছেলে-মেয়ে । দুইটি আগেই আসিয়া সেখানে কি কুড়াইতেছে।

"ও বাজান! দ্যাহ আমরা কত স্যাজারের কাটা কুড়ায়া পাইছি। একরাশ সজারুর কাঁটা আনিয়া ছোট মেয়েটি বাপকে দেখাইল। বছির বলিল, "বাজান! এই দিক একবার চায়াই দেহ না কত গুয়া কুড়াইছি?"

"বেশতরে, অনেক গুয়া কুড়ায়া ফেলছাস। বাড়ির থইনে ঝকা আইন্যা এগুলা লয়া যা!"

ছেলে দৌড়াইয়া গেল কঁকা আনিতে। আজাহের কুঠার লইয়া একটি গাছের উপর দুই। তিনটি কোপ দিল। কুঠারের আঘাতে গাছটি কাঁপয়া উঠিল। গাছের ডালে কয়েকটি পাখি বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা করুণ আর্তনাদ করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। আজাহেরের

কুঠার কাপিয়া উঠিল। কুঠার মাটিতে রাখিয়া আজাহের সমস্ত গাছটির উপর একবার চোখ। বুলাইয়া লইল। কত কালের এই গাছ। বনের লতা জড়াইয়া পাকাইয়া এ-ডালের সঙ্গে ও-ডালে মিল করিয়া দিয়াছে। কত কালের এই মিতালী! শত শত বৎসরের মায়া-মমতা যেন লতা-পাতা শাখার মূক-অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। অত শত আজাহের ভাবিতে পারিল কিনা জানি না। কিন্তু সামান্য গাছটির উপর চোখ বুলাইতে কি যেন মমতায় আজাহেরের। অন্তর আকুল হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে বাস করিত, তখন এই গাছগুলি ছিল মানুষের দোসর। সেই আদিম প্রীতি তাহার অবচেতন মনে আঘাত করিল কিনা জানি না–গাছের যে স্থানটিতে সে কুঠারের আঘাত করিয়াছিল সে। স্থান হইতে টস্ টস্ করিয়া গাছের কস বাহির হইতেছে। আজাহের তাহা গামছার খেটে মুছিয়া দিয়া বলিল, “গাছ! তুই কান্দিস না। আর আমি তোগো কাটপ না।” এই গাছটির। মত সে নিজেও মূক। নিজের দুঃখ-বেদনা সে ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। সেই। জন্য এই মূক-বৃক্ষের বেদনা সে বুঝি কিছুটা বুঝিতে পারে। কুঠার কাঁধে লইয়া আজাহের। সমস্ত জঙ্গলটার মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কত কালের ভুলিয়া যাওয়া আপনজনের সান্নিধ্যে যেন সে আসিয়াছে। এ-গাছের আড়াল দিয়া ও-গাছের পাশ দিয়া লতাগুল্মের মধ্য দিয়া বনের সরু পথখানি আঁকিয়া বাকিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পথে কাহারা চলে! বন-রহস্যের এই মায়াবি অন্তরখানি যাহাদের কাছে কিঞ্চিৎ উদঘাটিত হয় তাহারাই বুঝি চলিয়া চলিয়া এই পথ করিয়াছে। এক জায়গায় যাইয়া আজাহের দেখিল, একটা গাছের ডালে চার পাঁচ জায়গায় মৌমাছিরা চাক করিয়াছে। কি বড় বড় চাক! চাক হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় মধু ঝরিয়া পড়িতেছে। অন্য। জায়গায় আজাহের দেখিল, একটা গাছের খোড়লে কটায় বাসা করিয়াছে। তাহাকে

দেখিয়া কটা পালাইয়া দূরে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বাসায় চার পাঁচটি ছোট ছোট কালো বাচ্চা চিঁ চিঁ করিতেছে। বাচ্চাগুলিকে ধরিয়া আজাহের বুকের কাছে লইয়া একটু আদর করিল, তারপর অদূরবর্তী বাচ্চাদের মায়ের দিকে চাহিয়া অতি সন্তর্পণে সে তাহাদের গর্তের মধ্যে রাখিয়া অন্য পথ ধরিয়া চলিল। বনের পথ দিয়া সে যতদূর যায় তাহার তৃষ্ণা যেন মেটে না। যত সে পথ চলে বন যেন তাহার চোখের সামনে রহস্যের পর রহস্যের আবরণ খুলিয়া দেয়। এমনি করিয়া সারাদিন জঙ্গল ভরিয়া ঘুরিয়া আজাহের সন্ধ্যা বেলা গৃহে ফিরিয়া আসিল। বউ বলিল, "বলি কাঠ না কাটপার গেছিলা? তয় খালি আতে আইল্যা ক্যান?"

আজাহের তাহার উত্তরে কিছুই বলিল না। কি এক অব্যক্ত আত্মীয়তার মমতায় তাহার সকল অন্তর ভরপুর। তাহার এতটুকু প্রকাশ করিয়া সেই মনোভাবকে সে ম্লান করিতে পারে না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আজাহের চাহিয়া দেখে উঠানের এক কোণে একটি ছোট্ট কটার বাচ্চা লইয়া তাহার ছেলে-মেয়েরা খেলা করিতেছে। "বাজান! দেইখ্যা যাও। আমরা জঙ্গল থইনে কটার বাচ্চা ধইর্যা আনছি।" ছোট মেয়ে বড় আল্লাদে ডগমগ হইয়া বাপকে আসিয়া বলিল।

"পোড়ামুখী! এ কি করছস? বুনো জানোয়ার, আহা ওগো মা-বাপ য্যান কতই কানত্যাছে।"

"বাজান! এডারে আমরা পালব। এরে উড়ুম খাইতে দিছি। একটু বাদে ভাত খাওয়াব।"

“কিন্তুক ওরা যে মার দুধ খায়। তোর কাছে ত ওরা বাঁচপ না।” আজাহের ভাবিল, কটার বাচ্চাটিকে লইয়া সে তাদের বাসায় দিয়া আসিবে। কিন্তু তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের পথ সে এখন চিনিবে না। আর চিনিলেও এখন সেখানে যাওয়া অবিবেচনার কাজ হইবে। বুনো শূকর আর বাঘ সেখান দিয়া এখন নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। মেয়েটিকে সে খুব বকিল। তাহার বকুনীতে মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল।

“ও বাজান! আমি ত জানতাম না কটার মা আছে। তারা ওর জন্যি কানব। তুমি বাচ্চাডিরে নিয়া যাও। ওগো বাসায় দিয়া আইস গিয়া।”

কিন্তু এ অনুরোধ এখন নিরর্থক। আজাহের বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ছোট কটার বাচ্চাটি চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। ও যেন মূক-বনের আপন সন্তান। ওর কান্নায় সমস্ত বন আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। সারা রাত্র কটার বাচ্চাটির চিন্তায় আজাহেরের ঘুম আসিল না। বারবার উঠিয়া যাইয়া বাচ্চাটিকে দেখিয়া আসে। শেষ রাত্রে উঠিয়া যাইয়া দেখিল বাচ্চাটি শীতে কাঁপিতেছে। আজাহের অতি সন্তর্পণে নিজের গামছাখানি বাচ্চাটির গায়ের উপর জড়াইয়া দিয়া আসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাত না হইতেই আজাহের জাগিয়া দেখিল, তাহার ছেলে-মেয়ে দুইটি বাচ্চাটিকে সামনে করিয়া কাঁদিতেছে। আজাহের আগাইয়া আসিয়া দেখিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের পানিতে আজাহেরের দুই গণ্ড ভিজিয়া গেল। মেয়ে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “বাজান! আমরা যদি জানতাম, তা ঐলে বাচ্চাডারে এমন কইরা আনতাম না। আমাগো দোষেই বাচ্চাটা মইরা গ্যাল।”

উত্তরে আজাহের কোন কথাই বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল আজ যেন তাহার কি এক সর্বনাশ ঘটিল। মহাজনে তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া তাহাকে পথের ফকির বানাইয়াছে–কত লোকে তাহাকে ঠকাইয়াছে কিন্তু কোন দিন সে নিজকে এমন অসহায় মনে করে নাই। কটার মায়ের সেই অপেক্ষমান ম্লান মুখোনি বারবার আজাহেরের মনে পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আজাহের কাল যে গাছটি কাটিতে গিয়াছিল সেই গাছটির তলায় একটি ছোট্ট কবর খুঁড়িয়া যেমন করিয়া মানুষ। মরিলে গোর-দাফন করে তেমনি করিয়া বাচ্চাটিকে মাটি দিল। জানাজার কালাম সে-ই পড়িল। তাহার ছেলে মেয়ে দুটি পিছনে দাঁড়াইয়া মোনাজাত করিল। তারপর সে বলিল, "জঙ্গল! আমার বাচ্চা দুইটা অবুঝ। তুমি ওগো মাপ কইর।"

ঐ কাজ সারিয়া কুঠার কান্ধে করিয়া আজাহের আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলে বছির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এক জায়গায় যাইয়া তাহারা দেখিল, গাছের তলায় কত ঢেকিশাক। ডগাগুলো লকলক করিতেছে। গ্রামের লোকেরা ঢেকিশাক বেশী পছন্দ করে না। কিন্তু শহরে এই শাক বেশী দামে বিক্রি হয়। বাবুরা কাড়াকাড়ি করিয়া এই শাক কিনিয়া লইয়া যায়। বাপ-বেটাতে মিলিয়া তাহারা অনেক ঢেকিশাক তুলিল। তারপর শাকগুলি গামছায় বাঁধিয়া আজাহের আরও গভীর জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইল। এক জায়গায় যাইয়া দেখিল, একটি কড়াই গাছ। তাহার কয়খানা ডাল শুখাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। আজাহের সেই গাছে উঠিয়া ডালগুলি ভাঙ্গিয়া তলায় ফেলিতে লাগিল। কড়াই গাছ। হইতে নামিয়া আজাহের একটি জামগাছে উঠিয়া আরও কতকগুলি শুকনা ডাল ভাঙ্গিল। তারপর নামিয়া ডালগুলি একত্র করিয়া লতা দিয়া বোঝা বাধিয়া মাথায় লইল। চেঁকিশাকগুলি গামছায় বাঁধিয়া গাছতলায় রাখিয়া দিয়াছিল। সেগুলি উঠাইয়া বছিরের মাথায় দিল। বাপ-বেটাতে বাড়ি ফিরিল, তখন বেলা একপ্রহর হইয়াছে। কাঠের বোঝা

নামাইয়া আজাহের ছেলে-মেয়ে লইয়া তাড়াতাড়ি খাইতে বসিল। ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া আজাহের দেখিল যে সবগুলি পান্তা-ভাত বউ তাহাদের পাতে ঢালিয়া দিয়াছে। নিজের জন্য কিছুই রাখে নাই। বউ-এর সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া সে নিজের মাটির সানকি হইতে অর্ধেকটা পরিমাণ ভাত তুলিয়া হাঁড়িতে রাখিল। তারপর অবশিষ্ট ভাতগুলিতে সানকি পুরিয়া পানি লইয়া তাহাতে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ ও লবণ মাখাইয়া শব্দ করিয়া গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। ভাতগুলি সে চিবাইয়া খাইল না। পাছে তাহারা পেটে যাইয়া অল্প সময়ে হজম হইয়া যায়। ভাত খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই বউ তাহার হাতে হুঁকা আনিয়া দিল। দুই তিন টানে কার কলিকায় আগুন জ্বালিয়া নাকে মুখে ধুয়া ছাড়িয়া সমস্ত গৃহখানা অন্ধকার করিয়া দিল। লাকড়ির বোঝা মাথায় করিয়া আজাহের ফরিদপুরের বাজারে রওয়ানা হইল।

এই ভাবে মাসখানেক লাকড়ি বিক্রি করিয়া কোন ক্রমে তাহাদের দিন যাইতে লাগিল।

.

১৯.

সেদিন আজাহের হাটে যাইবে, ছেলে বছির বায়না ধরিল, “বাজান, আমিও হাটে যাব!”

–”তুই আটপার পারবি? কত দূরির পথ, আমার সুনা, আমার মানিক, তুমি বাড়ি থাহ।”

কিন্তু ছেলে কথা শুনে না–”না বাজান, আমি আটপার পারব।”

অগত্যা ছেলেকে সঙ্গে লইতে হইল। একটি ডালিতে দুই তিনখানা মৌমাছির চাক, সুপারী, কুমড়ার ফুল, কয়েকটা কলার মোচা সাজাইয়া আজাহের ছেলের মাথায় দিল। বাকের দুই ধারে আটকাইয়া সে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল কাঠের বোঝা।

এত দূরের পথ। মাথার উপর দুপুরের রৌদ্র খা খা করিতেছে। ছোট ছেলে বছির, চলিতে চলিতে পিছনে পড়িয়া থাকে। বাপ পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে। এমনি করিয়া তাহারা বদরপুরের পাকা ইঁদারার কাছে আসিয়া বোঝা নামাইল। কয়া হইতে পানি তুলিয়া আজাহের নিজের চোখে মুখে দিল। ছেলেকে পানি খাওয়াইল। তারপর কিছুক্ষণ ঝাউ গাছের ঠাণ্ডা হাওয়ায় জিড়াইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

শহরের নিকটে আসিতেই ছোট ছেলে বছির শুনিতে পাইল, কোথায় যেন ঝড় বৃষ্টি হইয়া গর্জন করিতেছে। বছির বাপকে জিজ্ঞাসা করে, "বাজান, এই শব্দ কিসির?"

বাপ বলে, "আমরা ফরাতপুরির আটের কাছে আইছি।"

অজানা রহস্যের আবেশে বছিরের বুক দুরু দুরু করিতে থাকে। বছির আরও জোরে জোরে হাঁটে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোয়াল চামটের পুল পার হইয়া বামে ঘুরিয়া দুই পাশের মিষ্টির দোকানগুলি ছাড়াইয়া মেছো বাজারের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় আজাহের কাঠের বাকটি নামাইল। বছিরের মাথা হইতেও বোঝাটি নামাইয়া দিল। বাপের কাছে কতবার বছির ফরিদপুরের হাটের গল্প শুনিয়াছে। আজ সেই হাটে সে নিজে আসিয়াছে। কত লোক এখানে জড় হইয়াছে। বছির এত লোক একস্থানে কোথাও দেখে নাই। তাহাদের তাম্বুলখানার হাট এতটুকু, এক দৌড়ে ঘুরিয়া

আসা যায়। কিন্তু ফরিদপুরের হাটে কত লোক! বছির যে দিকে চাহে শুধু লোক আর লোক। তাহাদের গ্রামের জঙ্গলের মত এও যেন মানুষের জঙ্গল। ইহার যেন কোথাও শেষ নাই।

সাদা ধবধবে জামা কাপড় পরিয়া ভদ্রলোকেরা আসিয়া আজাহেরের কাঠের দাম জিজ্ঞাসা করে, "কিরে, তোর এই কাঠের দাম কত নিবি?"

আজাহের বলে, "আজ্ঞা, পাঁচ সিহা।"

কাঠের বোঝা হইতে কাঠগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলে, "এযে ভিজে লাকড়ীরে। আখায় দিলে জ্বলবেও না। এর দাম চাস পাঁচ সিকে? পাঁচ আনা পাবি।"

আজাহের বলে, "এমুন শুকনা খড়ি, আপনি ভিজা দেখলেন? পাঁচ আনায় দিব না কর্তা।"

"আচ্ছা তবে ছ'আনা নে। চল আমার বাড়িতে দিয়ে আসবি।"

আজাহের বলে, "আপনারা ঐলেন বড় লোক। আতখান ঝাড়া দিলি আমরা গরীবরা বাঁচতি পারি। হেই তাম্বুলখানা ঐতে আনছি এই খড়ি। কন ত কর্তা, আপনাগো চাকরেও যদি এই খড়ি বিনা পয়সায় আনত তার মায়না কত দিতেন?"

"তুই ত কথা জানসরে। আচ্ছা তবে সাত আনা নে।"

কর্তা আপনারা কি আমাগো না খায়া মরবার কন নাকি? আইজকা আধাদিন বইরা খড়ি কুড়াইছি। আধাদিন গ্যাল খড়ি আনতি। তাতে যদি সাত আনা দাম কন, আমরা গরীবরা বাঁচপ কেমন কইরা?”

আচ্ছা, যা। আট আনা দিব। নিয়ে চল খড়ি।”

আজাহের হাল ছাড়ে না।”আইচ্ছা বাবু আর একটু দাম বাড়ান।”

“আর এক পয়সাও দিব না।”

“তয় পারলাম না কর্তা,” আজাহের বিনীত ভাবে বলে। লোকটি চলিয়া গেল। বছির ভাবে, এমন ধোপদোরস্ত কাপড়-পরা–এরাই ভদ্রলোক। এমন সুন্দর এদের মুখের কথা কিন্তু তার বাবাকে ইনি তুই বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? তাদের তাম্বুলখানা গ্রামে । সবাই তাহার বাবাকে তুমি বলে। তাহার বাবাও তাহাদের তুমি বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু এই লেখাপড়া জানা ধোপদোরস্ত কাপড় পরা ভদ্রলোক তার বাবাকে তুই বলিয়া সম্বোধন করিল! সে যদি ভদ্রলোক হইত–সে যদি এমনি বোপদোরস্ত কাপড় পরিয়া তারই মত বই-এর মত করিয়া কথা বলিতে পারিত? কিন্তু সে ভদ্রলোক হইলে তার বাপের বয়সী লোকদের এমনি তুচ্ছ করিয়া তুই বলিয়া সে সম্বোধন করিত না।

কতক্ষণ পরে আর একজন লাকড়ী কিনিতে আসিল। তাহার সঙ্গে দরাদরি করিতে বাপের উপস্থিত কথাবার্তায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাইয়া মনে মনে বছির বড়ই গৌরব অনুভব করিতে লাগিল।

"আরে কর্তা! আমার শুকনা খড়ি কিন্যা নিয়া যান। বাড়িতি গেলি মা ঠাকুরনরা তারিফ করব্যানে। আর ওই দোকান ঐতে যদি বিজা খড়ি কিন্যা নেন, ঠাকুরনরা ওই খড়ি চুলায় দিয়া কানতি বসপি।"

শুনিয়া ভদ্রলোক খুশী হইয়া লাকড়ীর দাম বারো আনা বলিল। আজাহের বলে, "আপনারা বড়লোক মানুষ, আপনাগো কাছে খড়ির দাম কি চাব? মা ঠাকুরনরা খুশী হয়া যা দ্যান তাই নিবানি।"

"আচ্ছা চল তবে।" আজাহের বছিরকে বসাইয়া রাখিয়া লাকড়ী লইয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে চলিল।

"বছির তুই বয়। আমি এহুনি আসপানি। ডেহিশাগ চাইর আঁটি কইরা পয়সায়। আর এই মধুর চাক সগল যদি কেউ নিবার চায় দ্যাড় টাহা চাবি। এক টাহা কইলি দিয়া দিস।"

যাইবার সময় আজাহের পাঁচ ছয় আঁটি ঢেঁকিশাক লইয়া গেল। এই বিরাট হাটের মধ্যে বসিয়া বছিরের যেন কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। একজন আসিয়া শাকের দাম জিজ্ঞাসা করিল।

"কিরে ছোকরা! কয় আঁটি করে ঢেঁকিশাক?"

প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া যাত্রাদলের নতুন অভিনেতার মত সে বলিল, "আমার শাকের দাম পয়সায় চাইর আঁটি।"

“বলিস কি, চার আঁটি পয়সায়? আট আঁটি করে দিবি নাকি?”

বছির বাপের মত করিয়া বলিতে চেষ্টা করিল, “না কর্তা! আট আঁটি কইরা দিব না।” কিন্তু কথার সুর বাপের মতন মুলাম হইল না।

লোকটি বলিল, “আচ্ছা, তবে ছয় আঁটি দে এক পয়সায়।” এ কথার জবাবে বছির কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পায় না। এমন সময় তাহার বাপ আসিয়া উপস্থিত হইল।

“আসেন বাবু। এমন চেঁকিশাক বাজারে পাবেন না। দ্যাহেন না, পোলাপানের মতন ল্যাক ল্যাক করত্যাছে ইয়ার ডগাগুলান। পয়সায় চাইর আঁটির বেশী দিব না।”

লোকটি তখন আঁটিগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সবগুলি শাক কিনিয়া লইল। লোকটি চলিয়া গেলে আজাহের ছেলেকে বলিল, “খড়ির সঙ্গে পাঁচ আঁটি চেঁকিশাক দিয়া আইলাম মা ঠারহ্যানরে। খুশী অয়া মা ঠারহ্যান আমারে আরো চাইর আনা বকশিস দিছে।”

বাপের এই সাফল্য দেখিয়া বছির মনে মনে গৌরব বোধ করিল। সুপারি আর কলার মোচা বেচিয়া আজাহের ছেলেকে লইয়া বেনে দোকানে যায়। বেনেরা মৌমাছির চাক কিনিয়া কলিকাতায় চালান দেয়। তাহারা বড়ই চতুর। অনেক ঠকিয়া আজাহের এখন কিছুটা তাহাদের চালাকি ধরিতে পারে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন লোক দিয়া পাশাপাশি দুইটি দোকান দিয়া বসে। এক দোকান মৌচাকের দাম যাহা দিতে চাহে, পার্শ্ববর্তী অপর দোকানে গেলে তাহার চাইতে কম দাম বলে। আজাহের তাহা জানে। সেইজন্য সে

দূরের দুরের দুই তিন দোকান যাচাই করিয়া তাহার মৌচাক বিক্রি করিল। কিন্তু দোকানদার মৌচাক মাপিতে হাত সাফাই করিয়া বেশী লইতে চাহে। আজাহের বলে, “সা’জী মশায়! রাইতরে দিন করবেন না। আমার চাক আমি মাইপ্যা আনছি।”

দোকানী বলে, “গো-মাংস খাই, যদি বেশী লয়া থাকি। তোমার ওজনে ভুল ঐছে।”

আজাহের বড়ই শক্ত ব্যক্তি, “আমি ওজন কইরা আনছি দুই স্যার! যদি তাই স্বীকার কইরা লন তয় নিবার পারেন, তা না ঐলে দেন আমার মধুর চাক। আর এক দোকানে যাই।”

দোকানী তবু হাল ছাড়ে না, “আরে মিঞা! ওজন ত ঠিক কইরা দিবা। আমার ওজনে ঐল পৌনে দুই স্যার। আচ্ছা ওসব রাইখ্যা দাও। তোমার মৌচাকের দাম চৌদ্দ আনা ন্যাও।”

“তা অবি না কর্তা।” বলিয়া আজাহের মৌচাকের উপর হাত বাড়ায়।

“আরে মিঞা! রিয়াইত-মুরিতও তো করতি অয়; আচ্ছা পোনর আনা দাম।” বলিয়া দোকানী আজাহেরের হাতখানা ধরে।

এ যেন কত কালের ভিখারী!

চাইরটা পয়সা কম নাও বাই। দোকানী আজাহেরের হাতে একটা বিড়ি খুসিয়া দিল। “আরে বাই, অত নিষ্ঠুর ঐলা ক্যান? তামুক খাও।”

আজাহেরকে চারটি পয়সা ছাড়িয়া দিতে হয়। বছির ভাবে এরা কত বড় লোক। চারটি পয়সার জন্য এদের কি কাঙালী-পনা! অথচ এই চারটি পয়সা যদি তার বাবা পাইত, তাহা দিয়া মাছ কিনিয়া লইয়া যাইয়া তাহারা কত আনন্দ করিয়া খাইত। তার বাবাকে। মিঠা কথায় ভুলাইয়া এই চারটি পয়সা রিয়াইত লইয়া ইহাদের কি এমন লাভ হইবে? বেনের দোকান হইতে পয়সা গণিতে গণিতে আজাহের একটি অচল সিকি পাইল। তাহা ফিরাইয়া দিতে দোকানী বলিল, "আরে মিঞা! এডা বাল সিকি। যদি কেওই না লয়, ফিরায়া দিয়া যাইও।"

আজাহের বলিল, "সা'জী মশায়! হেবার একটা অচল টাহা দিছিলেন ফিরায়া নিলেন । আইজ আবার আর একটা নিয়া কি করব? জানেন ত আমরা দিন আনি দিন খাই। এহনি পয়সা দিয়া ত্যাল, নুন কিনতি অবি। আমারে সিহিডা বদলাইয়া দেন।"

কোনদিক হইতেই আজাহেরকে না ঠকাইতে পারিয়া দোকানী বড়ই নিরাশ হইয়া তাহাকে সিকিটি ফিরাইয়া দিল।

রাস্তার দুইধারে নুনের দোকানদারেরা ছালার উপর নুন লইয়া বসিয়া আছে; আজাহের জানে একসের নুনে ইহারা পোনর ছটাক মাপিবেই। সেই কমটুকু সে ফাও চাহিয়া পূরণ করিবে। আজাহের নুন লইয়া দোকানীকে বলে, "একটু ফাউ দাও মিঞা বাই!" দোকানী তোলাখানেক নুন ফাউ দেয়।

আজাহের আবার বলে, "মিঞা বাই! আরও একটু দাও।" বিরক্ত হইয়া দোকানী আরও এক তোলা নুন তাকে দেয়।

ওধারে গুড়ের হাট। মৌমাছি গুনগুন করিতেছে! গুড়ের বেপারীরা খড়ের বুন্দা জ্বালাইয়া ধূয়া করিয়া মৌমাছিদের তাড়াইতেছে। গুড়ের বাজার বড়ই চড়া। সের প্রতি দুই আনার কমে কেহই গুড় দিতে চাহে না। গুড়ের টিন হইতে কানি আঙ্গুলে গুড় লাগাইয়া আজাহের ছেলের মুখে ধরে, “খায়া দেখ ত গুড় খাটা ঐছে কিনা।”

ছেলে গুড় মুখে দিয়া বলে, “না বাজান, খাটা না।”

“তুই কি বোঝোস? আমি একটু মুহি দিয়া দেহি।” বলিয়া আজাহের আঙুলে আর একটু গুড় লইয়া চাখিয়া দেখে। দরে দোকানীর সঙ্গে আজাহেরের বনে না। দোকানী চায় দুই আনা। আজাহের বলে ছয় পয়সা সের। এইরূপে তিন চার দোকানের গুড় পরীক্ষা করে সে। আহা বেচারী ছেলেটা মিষ্টির মুখ দেখে না। চাখিয়া চাখিয়া খাক যতটা খাইতে পারে। এক দোকানী ধমকাইয়া বলে, “আরে মিঞা! গুড় ত নিবা এক সের। বাপ বেটায় চাখিয়াই ত এক তোলা খায়া ফ্যালো।” শুনিয়া বছিরের বড় অপমান বোধ হয়, কিন্তু বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে সেখানে কোনই রূপান্তর ঘটে নাই। এইরূপ অনেক যাচাই করিয়া আজাহের এক দোকানের গুড় ছয় পয়সা সের দরে ঠিক করে। এই গুড় সাধারণতঃ লোকে তামাক মাখাইবার জন্য কিনিয়া লয়। বছির চাখিয়া দেখিল, গুড়টি টকটক কিন্তু তার বাপ আঙুলে একটু গুড় মুখে দিয়া বলিল, “নারে বছির! বেশ মিঠা। তাছাড়া দামেও দুই পয়সা কম।” বাড়ি হইতে আজাহের গুড় কিনিবার জন্য খুটি লইয়া আসিয়াছিল। খুব ঠিক মত গুড়ের ওজন করাইয়া আরও কিছু ফাও লইয়া আজাহের কাপড়ের হাটে আসিল। কত রঙ-বেরঙের গামছা, শাড়ি লইয়া তাতিরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খদ্দেরদের ডাকিতেছে। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া আজাহের আসিয়া দাঁড়াইল রহিমদ্দী কারিকরের পাশে। “কেমুন আছ আজাহের?” রহিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে।

"তুমরা যেমুন দোয়া করছ চাচা।"

"এ কিডা? আমার মিঞা বাই নাহি? আরে আমার মিঞা বাই দেহি ডাঙর ঐছে? এবার তোমার সঙ্গে লড়ন লাগবি? দেখপ কার কত জোর।" বলিয়া দুই হাতের কাপড় এক হাতে লইয়া রহিমদ্দী বছিরের গায়ে মুখে হাত বুলায়।

"একদিন যাইও চাচা আমাগো তাম্বুলখানার আটে।"

"কয়াক মাস পরেই যাব।"

"মাতবর ক্যামুন আছে? ক্যাদাইরার মারে কইও আমাগো কতা।"

কাপড় দর করিতে খরিদ্দার আসে। রহিমদ্দী বলে, "আরেক আটে আইস আজাহের। অনেক কতা আছে!" বলিয়া রহিমদ্দী খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তায় মনোযোগ দেয়।

আজাহের ছেলেকে লইয়া মেছো হাটে আসে। ইলিশ মাছের দোকানের চারধারে বেশী ভীড়। তাম্বুলখানা যাইয়া অবধি আজাহের ইলিশ মাছ খায় নাই। আলীপুর থাকিতে মাঝে। মাঝে পদ্মা নদীতে যাইয়া সে ইলিশ মাছ মারিয়া আনিত। লোকের ভীড় ঠেলিয়া আজাহের ইলিশ মাছের ডালির কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। বছির তাহার পিছনে। নাড়িয়া চাড়িয়া বড়টা ছোটটা ইলিশ মাছ ধরিয়া দেখিতে আজাহেরের আরাম লাগে। পয়সা দিয়া ত সে কিনিতে পারিবে না।

"বলি, এই মাছটার দাম কত অলদার মশায়?" যাহারা বাজারে মাছের ব্যবসা করে তাহাদিগকে হাওলাদার বা কৈবর্ত বলে। আজাহেরের হাত হইতে মাছটি লইয়া পরীক্ষা করিয়া কৈবর্ত বলে, "দাম পাঁচ সিহা।"

আজাহের জানে মাছের বেপারীরা খরিদ্দারের কাছে মাছের ডবল দামের মতন প্রথমে চাহে। অর্ধেক দামের উপরে দুই একআনা বেশী বলিলেই সে মাছটি তাহাকে দিবে। আজাহের বলে, "আট আনা নেন অলদার মশায়।"

"আরে মিঞা! যে আতে মাছ দরছাও হেই আতখান বাড়ি যায়া ধূইয়া তাই রাইন্দা খাও গিয়া। আট আনায় ইলশা মাছ খাইছ কুনুদিন?"

আজাহেরের গায়ের শত ছিন্ন মলিন কাপড় দেখিয়া দোকানী তাহাকে গরীব বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে।

"আইচ্ছা নয় আনা লেন।" মাছের বেপারী অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলে। আজাহেরের কথার উত্তর দেয় না। বাপের অপমানে বছিরের কাদিতে ইচ্ছা করে। সে ভীড়ের ভিতর হইতে বাপকে টানিয়া লইয়া আসে। "কাম নাই বাজান, আমাগো ইলিশ মাছ কিনুনের।" আজাহের ওধারের পুঁটি মাছের ডালির কাছে যাইয়া মাছ দর করে। ডালির ঢাকনির উপরে ভাগে ভাগে পুঁটি মাছ সাজানো।

"কত কইরা বাগ দিছ অলদার মশায়?"

"চাইর পয়সা কইরা ভাগ।" মাছের উপর পানির ছিটা দিতে দিতে বেপারী বলে।

“আরে বাই! এক পয়সা বাগ ন্যাও।”

“তা অবিন্যা মিঞা বাই!”

পুঁটি মাছের বেপারীর কথায় তেমন ঝাঁজ নাই। বরঞ্চ একটু দরদ মিশানো।

দুই পক্ষে অনেক কাকুতি-মিনতি কথা বিনিময়ের পরে দুই পয়সা করিয়া পুঁটি মাছের ভাগ ঠিক হয়। ধামার মধ্যে মাছ উঠাইতে উঠাইতে আজাহের অনুনয়-বিনয় করিয়া আরও কয়েকটি মাছ চাহিয়া লয়।

এইভাবে হাট করা শেষ হইলে আজাহের বাড়ি রওয়ানা হয়। মেছো বাজার পার হইলেই রাস্তার দুই ধারে মেঠায়ের দোকান। বছির বলে, “বাজান! পানি খাব।” ছেলের মুখ শুকনা। সেই সকালে খাইয়া আসিয়াছে। আহা কত যেন ক্ষুধা লাগিয়াছে! পয়সা থাকিলে পেট ভরিয়া সে ছেলেকে মিষ্টি খাওয়াইত। তবু খাক, পানির সঙ্গে কিছু সে খাক। মিষ্টির দোকানে সব চাইতে সস্তা দামে বিক্রি হয় জিলিপি। অনেক দরদস্তুরের পর দোকানী এক পয়সায় দুইখানা জিলিপি বেঁচিতে স্বীকৃত হইল। পাতায় করিয়া দুইখানা জিলিপি শূন্য হইতে দোকানী বছিরের হাতে ঘুড়িয়া দিল। পাছে মুসলমানের ছোঁয়া লাগিয়া। তাহার দোকানের সমস্ত মিষ্টি নষ্ট হইয়া যায়। বছির দুই হাত পাতিয়া সেই মিষ্টি গ্রহণ করিল। দোকানের বাহিরে টুল পাতা। তাহার আশেপাশে গা-ভরা ঘা-ওয়ালা কুকুরগুলি শুইয়া আছে। সেই টুলের উপর বসিয়া মুসলমান খরিদ্দারেরা মিষ্টি খাইয়া থাকে। হিন্দু খরিদ্দারেরা দোকানের মধ্যে যাইয়া চেয়ারে বসিয়া খাবার খায়। সেই কুকুরগুলিরই পাশে পিতলের দুই তিনটি নোংরা গ্রাস মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহারই একটিকে বাম

পায়ে খাড়া করিয়া দোকানী শূন্য হইতে ঘটিভরা পানি ঢালিয়া দিল। আস্তে আস্তে সেই দুইখানা জিলাপী বছির বহুক্ষণ ধরিয়া খাইল। তারপর সেই গেলাসের পানিটুকু ঢক ঢক করিয়া খাইয়া দোকানীর কাছে আরও পানি চাহিল। দোকানী তাহার গ্লাসে পূর্ববৎ শূন্য হইতে ঘটিভরা জল ঢালিয়া দিল। যতক্ষণ ছেলে খাইতেছিল ততক্ষণ আজাহের মিষ্টির দোকানের কঁচের আবরণীতে রক্ষিত সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া প্রভৃতি স্তরে স্তরে সাজানো নানারকমের মিষ্টিগুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইতেছিল। ইহাতে তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে কি যেন আরাম বোধ হইতেছিল।

তাহাদেরই মত বহুলোক হাট হইতে বদরপুরের রাস্তা বাহিয়া নানা গাল-গল্প করিয়া । বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছিল। কে আগে-হাটে দুধ বেচিয়া দুই পয়সা জিতিয়া আসিয়াছে; কে কোন বড়লোক মাড়োয়ারীকে তোষামোদ করিয়া কাপড়ের দাম কম করিয়া লইয়াছে, এই সব গৌরবজনক কথায় সকলেই মশগুল। আজাহেরও সুযোগ বুঝিয়া কি করিয়া পাঁচ আঁটি চেঁকি শাক দিয়া এক ভদ্রলোকের বউ এর কাছ হইতে চার আনা বকশিস্ লইয়া আসিয়াছে। সেই গল্পটি বলিয়া ফেলিল। পার্শ্ববর্তী শ্রোতা শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল, “কওকি মিঞা! চাইর আনা বকশিস পাইলা?”

আজাহের খুশী হইয়া তার হাতে একটা বিড়ি আগাইয়া দেয়। “খাও মিঞা, তামুক খাও।”

অপর পাশের লোকটি আজাহেরের এই গৌরবের কাহিনী শুনিয়া হিংসায় জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে আরও জোরের সঙ্গে বলিতে লাগিল, “এড়া আর কি তাজ্জবের ব্যাপার? হোন মিঞা! আমার একটা গল্প হোন আগে।”

“আচ্ছা কন বাই কন।” সকলে তাহার কথায় মনোযোগী হইল। লোকটি একটু কাশিয়া আরম্ভ করিল,–

“আইজকা আটে গেলাম তরমুজ লয়া। এক বাবু আইসা কয়, তরমুজের দাম কত নিবি? আমি জানি তরমুজির দাম চাইর আনায়ও কেও নিবিন্যা, কিন্তু আল্লার নাম কইরা দশ আনা চায়া বসলাম। বাবু কয়, অত দাম কেনরে? আট আনা নে? আমি বাবি আরও একটু বাড়ায় নি। আমি কইলাম, বাবু! এত বড় তরমুজডা দশ আনার কম দিব না। বাবু তহন নয় আনা কইল। আমি অমনি দিয়া ফেলাইলাম। হেই বাবুরে চিনছ তোমরা? গোল তালাপের পূর্ব কোণায় বাড়ি।”

একজন বলিয়া উঠিল, “চিনব না ক্যান? করিম খার ছাওয়াল। ওর বাবা সুদীর টাহা জমায়া গ্যাছে। কত লোকের বিট্যা-বাড়ি বেইচা খাইছে।”

আর একজন বলিল, “ওসব তলের কতা দিয়া কি অবি। আরে মিঞা খুব বাল জিতন জিতছাও। বিড়ি দেও দেহি?”

তলের খবর ইহারা কেহই জানিতে চাহে না। সহজ সরল এই গ্রাম্য লোকগুলি। কত শত শত শতাব্দী ভরিয়াই ইহারা ধনিকদের হাতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। কতই অল্পে ইহারা তুষ্ট–কতই সামান্য ইহাদের আকাঙ্ক্ষা। শহরের আরাম-মঞ্জিলে বসিয়া যাহারা দিনের পর দিন ইহাদের যথা-ধ্বস্ব লুটিয়া লইতেছে, দিনের পর দিন যাহারা ইহাদিগকে অর্ধাহার অনাহারের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তাহাদের প্রতি ইহাদের কোনই অভিযোগ নাই।

লোকটি গামছার খোঁট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া আশেপাশের সকলকেই একটা একটা করিয়া দিল।

বাড়ি ফিরিতে আজাহেরের প্রায় সন্ধ্যা হইল। সারাদিনের পথ চলায় এবং ক্ষুধায় ছেলেটি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য কিছু খায়াই সে ঘুমাইয়া পড়িল। ছোট বোন বড়ু আসিয়া কত ডাকাডাকি করিল। সারাদিনে এ-বনে ও-বনে ঘুরিয়া কত আশ্চর্য জিনিস সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সেগুলি মিয়াবাইকে না দেখাইলে কিছুতেই সে তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু গভীর ঘুমে বছির অচেতন হইয়া পড়িল। ছোট বোন বড় মুখ ফুলাইয়া অভিমান করিয়া খানিক কাদিল। তারপর বাপকে ডাকিয়া তাহার আশ্চর্য জিনিসগুলি দেখাইতে লাগিল। বয়স্ক পিতা সেগুলি দেখিয়া অভিনয় করিয়া যতই আশ্চর্য হউক তার মিয়া ভাই-এর মত আনন্দে ডগমগ হইতে পারিল না। বারবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। ছোট্ট বক্তার কাছে ইহা ধরা পড়িতে বেশী সময় লাগিল না। তখন সে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইল।

প্রভাত না হইতেই আজ বড়ু আগে উঠিল, "ও মিয়া বাই! শিগগীর উঠ। দেহ আমি জঙ্গলের মদ্দি কি হগল কুড়ায়া পাইছি!"

চোখ ডলিতে ডলিতে বছির ঘুম হইতে উঠিয়া ছোট বোনের সংগৃহীত জিনিসগুলি দেখিতে লাগিল। লাল টুকটুক করে এত বড় একটা মাকাল ফল। রাশি রাশি লাল কুঁচ, এক বোঝা কানাই লাঠি আরও কত কি।

“এ হগল কনহানে পাইলিরে?” বড় ভাই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। ঘাড় দোলাইয়া দোলাইয়া সুন্দর মুখোনি বাকাইয়া, ঘুরাইয়া ছোট বোন তাহার বিশদ বর্ণনা দিতে লাগিল।

“ওই জঙ্গলডার মদ্দি আমগাছের উপর বায়া গ্যাছে মাকাল ফলের লতা। কত ফল ঝুলত্যাছে গাছে। এহেবারে হিন্দুরের মত লাল টুকটুক করতাছে। তুমি চল মিয়া বাই, আমারে পাইড়্যা দিব্যানে।”

“চল,” বলিয়া বছির ছোট বোনটিকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যে আমগাছটিতে মাকাল ফল ঝুলিতেছিল সেই গাছের তলায় আসিয়া তাহারা দেখিল, ফুলু তার বড় বাই নেহাজদ্দী ও গেদাকে সঙ্গে লইয়া পূর্বেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক লাফে বছির গাছে উঠিয়া মাকাল ফল ছিঁড়িয়া তলায় ফেলিতে লাগিল। নেহাজদ্দী ও গেদার কাছে এ কার্যে কোনই উৎসাহ জাগিতেছিল না। নেহাজদ্দী বনের মধ্য হইতে একটা গুইসাপ ধরিয়া লতা দিয়া বাধিয়া সেই গাছের তলায় টানিয়া আনিল। তাহা দেখিয়া বড় চিৎকার করিয়া উঠিল। ফুলু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সব জন্তু তাহাদের নিত্য খেলার সাথী। তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইতে সে কাহাকেও দেখে নাই। গুইসাপ দেখিয়া বছিরও গাছ হইতে নামিয়া আসিল। তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল–গুইসাপের একটা বিবাহ নিশ্চয় দিতে হইবে। কিন্তু কাহার সঙ্গে ইহার বিবাহ দেওয়া যায়। প্রথমেই নেহাজীর বাড়ির কুকুরটির কথা মনে হইল। কিন্তু এমনতর রাগী বরের সঙ্গে উহার বিবাহ হইলে কনে কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। দিনরাত বরের। মুখের ঘেউ ঘেউ দাঁত খিচুনী আর কামড় খাইতে হইবে। তখন অনেক যুক্তি করিয়া

স্থির। হইল, ফুলুর আদরের বিড়ালটির সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে। দৌড়াইয়া যাইয়া ফুলু বাড়ি হইতে বিড়ালটিকে লইয়া আসিল। বরের মা কিছুতেই ভয়ে মেয়ের কাছে যাইতে পারে না। সে গুই-সাপের দড়িটি ধরিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক টানাটানিতে গুইসাপটি হয়রান হইয়া স্থির হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব হইতেই ঠিক হইয়াছিল বছির মোল্লা হইয়া বিবাহ পড়াইবে। বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিয়া বিবাহের কলমা পড়িল। কিন্তু গুইসাপটিকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইল। তাহারা কাঠি লইয়া এত তাহাকে খোঁচাইল-হাতে থাপড় দিয়া শব্দ করিল, কিছুতেই সে কলমা পড়িবে না। তখন বড় যেই হাতের লতাটায় একটু ঢিল দিয়াছে অমনি গুইসাপ দৌড়। তাহারাও কলরব করিয়া তাহার পিছে পিছে চলিল।

ইতিমধ্যে আজাহের কাঠ কুড়াইতে জঙ্গলে আসিয়াছিল। ছেলেদের কলরব শুনিয়া সে নিকটে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিল। গুইসাপটির মাথায় লতা বাধা ছিল বলিয়া সে বেশী দূর দৌড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কাটা গাছের সঙ্গে লতা জড়াইয়া আটকা পড়িয়াছে। সে গুইসাপটি ধরিয়া তাহার মাথা হইতে লতার বাঁধন খুলিয়া দিল। সাপটি দৌড়াইয়া গভীর কাটা বনে প্রবেশ করিল।

এইবার আজাহের সব ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিল, “গুইসাপ মারিতে নাই। মারিলে জঙ্গলে এত সাপ হইবে যে তাহার ভয়ে কেহই বনে আসিতে পারিবে না।”

বছির জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বাজান?”

আজাহের বলিল, “গুইসাপ হগল সাপ ধইরা খায়। যেহানে গুইসাপ আছে আর হগল সাপ সেহানত্যা পলায়া যায়।”

তারপর সে সকলকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে খড়ি টুকাইতে লাগিল।

আজ আর ঢেকিশাক পাওয়া গেল না। আজাহের অনেকগুলি বেতের আগা কাটিয়া লইল। শহরের লোকেরা বেতের আগা খাইতে খুব পছন্দ করে। কালকের পরিশ্রমে আজ আর বছির বাপের সঙ্গে শহরে যাইতে চাহিল না। আজাহের একাই লাকড়ীর বোঝার উপর কতকগুলি বেতের আগা লইয়া বাজারে চলিল।

এইভাবে এক একদিন আজাহের বন হইতে এক একটা জিনিস শহরে লইয়া যায়। বিক্রি করিয়া যাহা পায় তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র পরিবারের অন্নসংস্থান হইয়া সামান্য কিছু উদবৃত্ত থাকে। বউও সারাদিন বসিয়া থাকে না। সেই যে বিদায়ের দিন মিনাজদী মাতবরের স্ত্রী তাহাকে ঢাকাই-সীমের বীজ দিয়াছিল, শ্রীচন্দনের বীজ দিয়াছিল তাহা সে ভালমত করিয়া উঠানের এ-পাশে ও-পাশে রোপিয়া দিয়াছে। দীনু মাতবরের বাড়ি হইতে বেগুনের চারা আনিয়া বাড়ির পালানে পুঁতিয়াছে। উঠানের অর্ধেকখানি ভরিয়া লাল নটে। শাকের ক্ষেত আরো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। লাল টুকটুকে হইয়া ছোট ছোট নটে চারাগুলি উঠান ভরিয়া হাসি ছড়াইতেছে।

রাতের বেলা ছেলে-মেয়েদের পাশে লইয়া বউ ঘুমাইয়া পড়ে। চারিদিকে নিশুতি স্তব্ধ রাত্রি। আজাহেরের চোখে ঘুম আসে না। তাহার জীবনের ফেলে-আসা অতীত দিনগুলি সাপের মত তাহাকে যেন কামড়াইয়া মোচড়াইয়া দংশন করিতে থাকে। দিনের বেলা

নানা। কাজের চাপে সে মনকে শক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু রাতের বেলা যখন সকলেরই চোখে ঘুম, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, তখন সেই অতীত দিনগুলি একে একে জীবন্ত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিতে থাকে। আজাহের ভুলিয়া যাইতে চায়। আবার নতুন করিয়া ঘর-বাড়ি গড়িবে, নতুন করিয়া সংসার পাতিবে, নতুন দিনের সুখ দিয়া অতীতকে ঢাকিয়া রাখিবে। কিন্তু বালুর উপরে আঁক কাটিলে যেমন ঢেউ আসিয়া তাহা নিমিষে মুছিয়া ফেলে তেমনি তাহার ভবিষ্যতের সকল চিন্তা মুছিয়া ফেলিয়া অতীত আসিয়া সুস্পষ্ট হইয়া কথা কয়। সারাটি জীবন ভরিয়া লোকের কাছে সে শুধু অবিচারই পাইয়াছে। জীবনের সেই। প্রথম-বেলায় কতজন কত আশা দিয়া তাহাকে খাটাইয়া লইয়াছে, তারপর বেতন চাহিলে তাহাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সেই শঠ পাটের বেপারী মিষ্টি কথা বলিয়া নানা গাল-গল্প করিয়া তাহাকে কেমন করিয়া ঠকাইয়াছে, সেই ভণ্ড-মওলানা সাহেব তাহার শিষ্য-উপশিষ্য লইয়া কত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া তাহাকে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই প্রবঞ্চক মহাজন,–তাহার কথা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে, কেন–কেন ইহারা এমন করে! আর কেন–কেন এতদিন সে নীরবে ইহাদের অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিল? কেন–কেন সে সাপের মতন ইহাদের ঘাড়ে ঝাপাইয়া পড়িল না? সে যে সব কিছু এতদিন নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে সে জন্য আজ সে নিজেকেই ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। অপমানে ধিককারে আজ তার নিজের দেহের মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া চিবাইয়া খাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কোন আদিম কালের হিংস্র রক্ত-ধারা যেন তাহার সকল অঙ্গে নাচিয়া উদ্দাম হইয়া উঠে। তারই সঙ্গে সঙ্গে তার মনের গহন অন্ধকারে অভিনব হিংস্র বৃত্তিগুলির জন্ম হইতে থাকে। আজাহের কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। রাতের অন্ধকারের ফলকে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠে–এত স্পষ্ট–এত জীবন্ত–এত হিংস্র–এত বিষাক্ত। দেশে দেশে যুগে যুগে

এরাই মানুষকে পথে চলিতে দেয় না। মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যায়–মুখের হাসি-দীপ এক থাপড়ে নিবাইয়া দিয়া যায়–কোলের শিশু-কুসুম ঝরিয়া পড়ে, মায়ের বুক-ফাটা আর্তনাদে খোদার আসমান ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে, কিন্তু ইহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। কেন–কেন এমন হইবে? এমন কি কেহ কোথাও নাই যে ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে? যাহার হুংকারে মুহূর্তে ইহাদের সকল অত্যাচার থামিয়া যায়?

আজাহের গৃহের মধ্যে চাহিয়া দেখে তাহার ছেলে বছির মায়ের গলা ধরিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। এই ছেলেকে সে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। তিলেতিলে তাহার অন্তর সে এই সব অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিবে। আজাহের বাঁচিয়া থাকিবে। শুধু এই একটি মাত্র আশা বুকে লইয়া সে আবার নূতন করিয়া ঘর গড়িবে। দরকার হইলে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিবে, একবেলা খাইবে–আধ পেটা খাইবে, তবু সে তাহার ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবে। তাহার হাতের লাঠিতে বনের বাঘ পালায়হিংস্র বিষধর সাপ গর্তে লুকায় কিন্তু কলমের লাঠির সঙ্গে সে যুদ্ধ করিতে জানে না। সেই কলমের লাঠি সে তাহার ছেলের হাতে দিবে। ভাবিতে ভাবিতে আজাহেরের চোখ ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসে। শেষ রাত্রের শীতল বাতাসে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

পাঠশালার কথা

২১.

সকালে উঠিয়া আজাহের ছেলেকে বলিল, “আইজ তুই দূরি কুনহানে যাবিন্যা। তোরে নিয়া আমি পাঠশালায় দিব। লেখাপড়া করতি অবি তোর, আমি ঘুইর‌্যা আসি, তারপর নিয়া যাব তোরে।”

কিন্তু পাঠশালার কথা শুনিয়া ভয়ে বছিরের সমস্ত গা শিহরিয়া উঠিল। সে শুনিয়াছে। পাঠশালায় গুরু মশায় ছাত্রদিগকে মারে। কত রকমের শাস্তি দেয়। সে তাড়াতাড়ি না। খাইয়াই একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুপুর বেলা বাপ আসিয়া তাহাকে এ-বনে ওবনে কত খুঁজিল, কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। বনের মধ্যে ঢুকিয়া সারাদিন বছির এখানে সেখানে ঘুরিল। গাছের পেয়ারা পাড়িয়া খাইল। জঙ্গলের কুল পাড়িয়া স্তূপাকার করিল–তারপর সন্ধ্যাবেলায় চুপি চুপি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে গ্রামের মোড়লের সঙ্গে তাহার বাপ আলাপ করিতেছে।

মোড়ল বলিল, “বলি, আজাহের-বাই, তুমি নাকি তোমার ছাওয়ালডারে ইস্কুলি দিব্যার চাও? জান লেখাপড়া শিখলি হগলের মানায় না।”

“আপনার কতা বুজবার পারলাম না মোড়ল সাব,” আজাহের বলে।

“হোন তবে,” মোড়ল উত্তর করিল, “মুরালদার সৈজদ্দী তার পুলাডারে ঈস্কুলি দিছিল। দুই মাস না যাইতেই ছাওয়ালডা মইরা গ্যাল। সগলের উয়া সয় না।”

আজাহের বলিল, “আমি আইজ ইন্দু পাড়ায় যাইয়া দেইখ্যা আইছি। কতজনের পুলাপাইন লেখাপড়া করত্যাছে; কিন্তু তারা ত মরে না?”

“আরে মিঞা! এইডা বুজবার পারলা না? ওরা ওইল ইন্দু। ওগো মদ্দি লেহাপড়ার চইল আছে। হেই জন্যি ওগো কুনু ক্ষেতি হয় না।”

“এ কতা আমি মানি না মোড়লসাব। আমাগো দ্যাশে অনেক মোছলমানের ছেলে লেহাপড়া শিকত্যাছে। ফইরাতপুরির শহরে এমন মোছলমান দেখছি, আল্লার দইন্যার যত বিদ্যা প্যাটের মদ্দি বইরা রাখছে।” গর্বের সঙ্গে আজাহের বলে।

মোড়ল তাজ্জব হইয়া জিজ্ঞাসা করে, “আরে কও কি আজাহের বাই? মোছলমানের ছেলে লেহাপড়া জানে?”

“শুধু কি জানে মোড়লসাব? মোছলমানের ছেলে লেহাপড়া শিখ্যা হাকিম ঐছে। সারাদিন বয়া বয়া কলম দিয়া কাগজের উপর দাগ কাটে।”

“আমি ত জানি, আমরা মোছলমান জাত ছোট-জাত। আমাগো লেহাপড়া অয় না।”

“আমাগো মৌলবীসাব কন, আমরা গরীব ঐতে পারি কিন্তুক আমরা ছোট-জাত না। জানেন মোড়লসাব! একজন আমারে কইছে এক সময় আমরা এই দ্যাশের বাদশা ছিলাম। এহন লেহাপড়া জানি না বইল্যা আমরা ছোট অয়া গেছি।”

“এ কতাডা তোমার মানি আজাহের বাই। লেহাপড়া না জাইন্যা চোখ থাকতেও আমরা কানা হয়া আছি। আর যারা লেহাপড়া জানে তারা আমাগো মানুষ বইল্যাই মনে করে না। তা তুমার ছাওয়ালডারে যদি ইস্কুলি দিবা, তয় আমারডারেও লয়া যাই। দেহি কি অয়।”

“হেই কতাই ত কইবার চাইছিলাম। আপনার ছাওয়াল নেহাজদ্দী আর আমার পুলা। বছির কাইল ইস্কুলি দিয়া আসপ।”

“আইচ্ছা বাই নিয়া যাইও। কিন্তুক আর একটা কতা। সাত দিনের চাউল হেদিন তোমারে দিয়া গেছিলাম। আইজকা সাতদিন পুরা ঐল। তুমি আমার ওহান ত্যা দুই ছালা দান নিয়া আইস গ্যা। পুলাপান গো খাওয়াইবা ত।”

“দান আনতি লাগব না মাতবর সাব!”

“ক্যা? তয় খাইবা কি?”

“এই কয়দিন জঙ্গল ত্যা খড়ি নিয়া ফৈরাতপুর বেচছি। তাতে রোজ দেড় টাহা, দুই। টাকা ঐছে। তাতে আমাগো কুনু রকমে চইল্যা যায়?”।

“কও কি আজাহের? তয় ত তুমি খুব কামের মানুষ! কিন্তু বাই! যহন যা দরকার। আমার ওহানে যায়া চাবা, বুঝলা বাই? যাই দেহি, শরীরডা যেমুন জ্বর জ্বর করতাছে– শুইয়া থাকিগ্যা।”

মোড়ল চলিয়া গেল। আজাহেরের ছেলে বছির ইতিমধ্যে খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া শুইয়া মোড়ল ও তার বাপের মধ্যে যেসব কতাবার্তা হইয়াছে সকল শুনিয়াছে। মোড়ল যে তাহার বাপের কাছে যুক্তিতে হারিয়া গেল সেজন্য সে বড়ই দুঃখিত হইল। হায়, হায়, কাল আর সে পালাইয়া যাইতে পারিবে না! তাহাকে স্কুলে যাইতে হইবে। সেই গুরু মহাশয়ের বেত যেন তাহার চোখের সামনে লকলক করিয়া নাচিতেছে।

বছির কিছুতেই ভাবিয়া পায় না, কাল হইতে সে জঙ্গলে জঙ্গলে ইচ্ছামত বেড়াইতে পারিবে না। বনের ভিতর হইতে মাকাল ফল পাড়িয়া আনিতে পারিবে না। এই দুঃখ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে। বাপের সহিত বহুবার শহরে যাইয়া সে বিদ্বান লোকদের দেখিয়াছে। তাহারা মোটা মোটা বই সামনে লইয়া সারাদিন বসিয়া থাকে। এই গরমের দিনেও জামা কাপড় গায়ে পরিয়া থাকে। দুনিয়ার বাদশা বানাইয়া দিলেও সে কখনো এমন জীবন যাপন করিতে পারিবে না। আধ ঘন্টা এক জায়গায় চুপ করিয়া থাকিলে তাহার দম আটকাইয়া আসিতে চায়। আর এই সব শহরের পড়ুয়া লোকেরা সারাদিন বই সামনে করিয়া বসিয়া থাকে। গরমের দিনেও জামা কাপড় গায়ে রাখে। সে হইলে দুঃখে গলায় দড়ি দিত। কিন্তু হায়! কাল হইতে তাহাকে সেই জীবনই বরণ করিয়া লইতে হইবে। আচ্ছা, আজকের রাতের মধ্যে এমন কিছু ঘটিয়া উঠিতে পারে না, যার জন্য তাহাকে স্কুলে যাইতে হইবে না। এমন হয়, খুব ঝড় হইয়া তাহাদের বাড়ি-ঘর উড়াইয়া লইয়া যায়, সকালে তার বাপ তাহাকে বলে, বছির! তুই আইজ ইস্কুলে যাইস ন্যা।

এমনও হইতে পারে তার খুব জ্বর হইয়াছে, জ্বরের ঘোরে বছির আবোলতাবোল বকিতেছে, তার বাপ আসিয়া বলে, বছির! কাজ নাই তোর স্কুলে যাইয়া।

স্কুলে যাওয়াটা বন্ধ হউক, তাহার জন্য যে-কোন ক্ষতি বা সর্বনাশ তার উপরে কিংবা তার বাড়ি-ঘরের উপরে হউক তাতে বছির কোনই পরোয়া করে না। এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল : তাহার সামনে অনন্ত অন্ধকার, সেই আন্ধারের উপর একখানা লাঠি আগুনের মত ঝকঝক করিতেছে।

পরদিন কোরবানীর গরুর মত কাপিতে কাঁপিতে বছির আর নেহাজদ্দী ভাটপাড়া গায়ে সেন মহাশয়ের স্কুলের পথে রওয়ানা হইল। আজাহের আগে আগে যাইতে লাগিল। বছির আর নেহাজী পিছাইয়া পড়ে। আজাহের দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করে। এইভাবে আধ ঘন্টার মধ্যে তাহারা সেন মহাশয়ের স্কুলে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে দুইটি তরুণ বালকের মন ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। স্কুলের বারান্দায় চার পাঁচজন ছেলে 'নিল ডাউন' হইয়া আছে। আর একজন ছেলেকে 'হাফ নিল ডাউন' করাইয়া তাহার কপালটা আকাশের দিকে উঠাইয়া সেখানে এক টুকরা ভাঙা চাড়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। সামনে মাষ্টার বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যদি কপাল হইতে চাড়া পড়িয়া যায় তখন মাষ্টার বেত দিয়া সপাসপ তাহার পায়ে বাড়ি মারিতেছেন। ছেলেটি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াআবার মাটি হইতে চাড়াখানা কুড়াইয়া কপালের উপর রাখিয়া দিতেছে। তাহার পা দুইটি কাঁপতেছে আর সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে।

এই অবস্থার মধ্যে আজাহের ছেলে দু'টিকে সঙ্গে লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের সামনে যাইয়া খাড়া হইল।

মাষ্টার মহাশয় ছেলে দুটির দিকে চাহিয়া খুশী হইলেন। কারণ স্কুলের ছাত্রদের নিকট হইতে যাহা বেতন পাওয়া যায় তাহাই মাষ্টার মহাশয়ের একমাত্র উপার্জন। তিনি প্রসন্ন হাসিয়া বছিরের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভয়ে বছির কথা বলিতে পারিতেছিল না। আজাহের আগাইয়া আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, “কও বাজান! নামডা কয়া ফ্যালাও।”

কাঁপতে কাঁপতে বছির বলিল, “আমার নাম বছির।”

“বেশ, বেশ। আচ্ছা তোমার নাম কি বাপু?” মাষ্টার মহাশয় নেহাজদ্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভয়ে নেহাজদ্দীন হামলাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আজাহের বলিল, “উয়ার নাম নেহাজদ্দীন।”

মাষ্টার আর নাম জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না। তাহার খাতার মধ্যে বছির আর নেহাজদ্দীনের নাম লিখিয়া লইলেন। মাসে দুই আনা বেতন আর ভর্তির ফিস দুই আনা, দুইজনের একত্রে আট আনা দিতে হইবে। মাষ্টারের মুখে এই কথা শুনিয়া আজাহের পরিধানের কাপড়ের খোট হইতে সযত্নে বাধা আট আনার পয়সা বাহির করিয়া দুইবার তিনবার করিয়া গণিয়া মাষ্টার মহাশয়কে দিলেন। মাষ্টার মহাশয় আবার সেই পয়সাগুলি দুই তিনবার করিয়া গণিলেন। পয়সাগুলির মধ্যে একটি আনি ছিল! সেটিকে ভালমত পরীক্ষা করিয়া কোঁচার খুঁটে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইলেন। তারপর আজাহেরকে বলিলেন “এবার তুমি যাইবার পার। উরা এহন থাক!”

যাইবার জন্য আজাহের পা বাড়াইতেছে এমন সময় বছির তাহার হাত ধরিয়া কাদিয়া। ফেলিল, “বাজান, আমাগো ছাইড়্যা যাইও না।”

মাষ্টার মহাশয় তার বেতখানা দিয়া সামনের মাটিতে একটা বাড়ি মারিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, “বাপের হাত ছাইড়্যা দাও।” মাষ্টারের ধমকের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুকোমল হাতের বন্ধনী তার বাপের হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

বাপ ফিরিয়া মাষ্টারের দিকে চাহিয়া যেমন আর দশজন অভিভাবক মাষ্টারকে বলে, তেমনি চিরাচরিত প্রথায় তাহাকে বলিয়া গেল, “দ্যাহেন মাষ্টার-সাব! ছাওয়াল দিয়া গেলাম আপনারে। সেই সঙ্গে উয়ার চামও দিয়া গেলাম আপনারে কিন্তুক হাড্ডি রইল আমার। ছাওয়াল মানুষ করতি যত খুশী ব্যাতের বাড়ি মারবেন।” সেকালে অভিভাকদের ধারণা ছিল মাষ্টার ছেলেকে যত বেত মারিবে তাহার তত বিদ্যা বাড়িবে। একজন শিক্ষিত বাপের মতন এই অশিক্ষিত চাষাবাপও যে মাষ্টারকে তাহার ছেলেকে মারিবার জন্য এমন ভরসা দিতে পারিল তাহা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বড়ই খুশী হইলেন। এই সব অশিক্ষিত লোকের ছেলেদের পড়ান সব সময় নিরাপদ নয়। একবার এক গ্রাম্য মোড়লের ছেলেকে মাষ্টার বেত মারিয়াছিলেন। মোড়ল হাটের মধ্যে মাষ্টারকে ধরিয়া যেভাবে প্রহার করিয়াছিল তাহা এদেশে প্রবাদ-বাক্য হইয়া আছে। মাষ্টার আজাহেরকে বলিলেন, “সে কতা আর কইতি অবিন্যা মিঞা! বুঝতি পারছি, তুমার মদ্দি গিয়ান আছে।” খুশী হইয়া মাষ্টারকে সালাম করিয়া আজাহের চলিয়া গেল।

বছির আর নেহাজদ্দীনকে সে যেন চিরজনমের মত বনবাস দিয়া গেল। ডাক ছাড়িয়া তাহাদের কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু মাষ্টারের চোখের দিকে চাহিয়া তাহাদের সমস্ত

কান্না যেন কোথায় উবিয়া গেল। আর কিন্তু মাষ্টার তাহাদের কিছু বলিলেন না। এতক্ষণ মাষ্টার আজাহেরের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। এই অবসরে গণশা তাহার চৌদ্দ পোয়া অবস্থা হইতে কপালের চাড়াখানা হাতে লইয়া পাশের একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিবামাত্র মাষ্টার বেত লইয়া গণশার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। চীৎকার করিয়া গণশা শুইয়া পড়িল। সেই অবস্থায়ই মাষ্টার তাহার সারা গায়ে সপাসপ বেতের বাড়ি মারিতে লাগিলেন। বাবারে মারে চীৎকার করিয়া গণশা আকাশ-পাতাল ফাটাইতেছিল। তাহার কান্না শুনিয়া স্কুলের সামনে বহুলোক আসিয়া জড় হইল। কিন্তু তাহারা মাষ্টারকে কিছু বলিল না। বরঞ্চ মাষ্টার যে গণশাকে এইরূপ। নির্মম ভাবে মারিতেছিলেন, সে গণশার ভালর জন্যই করিতেছিলেন, তাহাদের নীরব সমর্থনে ইহাই প্রমাণ পাইল। অনেকক্ষণ গণশাকে মারিয়া বুঝিবা হয়রান হইয়াই মাষ্টার তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর আর আর ছেলেদের পড়া লইতে লাগিলেন।

মাষ্টার ছেলেদের পড়াইতে লাগিলেন, না তাহাদের মারিতে লাগিলেন তাহা বুঝিয়া। উঠা বড়ই মুস্কিল। এই স্কুলের ছেলেরা প্রায় সকলেই গরীবের ঘর হইতে আসিয়াছে। তাহাদের অভিভাবকেরা কেহই লেখাপড়া জানে না। সেইজন্য বাড়িতে তাহাদের পড়া বলিয়া দিতে পারে এমন কেহই নাই। স্কুলে মাষ্টার পড়া দিয়া দেন, কিন্তু পড়া তৈয়ার করাইয়া দেন না। ছাত্রদের বাড়িতে কেউ লেখাপড়া জানে না। কে তাহাদের পড়া বলিয়া দিবে? সুতরাং পরের দিন মাষ্টার যখন পড়া ধরেন কেহই উত্তর করিতে পারে না। এই স্কুলে কোন কোন ছেলে সাত আট বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে একই ক্লাশে পড়িতেছে কিন্তু বর্ণ পরিচয়ের বইখানাও তাহারা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। স্কুল তাহাদের নিকট পীড়নের স্থান। শুধুমাত্র অভিভাবকদের তাড়নায়ই তাহারা এখানে আসিয়া সহ্যের অতীত নির্যাতন ভোগ করিয়া থাকে। এইভাবে ঘণ্টা খানেক ছেলেদের ঠেঙ্গাইয়া মাষ্টার তাহাদের

ছুটি দিয়া দিলেন। গণশাও চৌদ্দপোয়া অবস্থা হইতে রেহাই পাইল। মহাকলবর করিয়া তাহারা স্কুল ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বছির আর নেহাজদ্দীনও বাড়ি রওয়ানা হইল।

বছির বাড়ির কাছে আসিয়া দেখে, মা পথের দিকে চাহিয়া আছে। ছোট বোন বড় কলরব করিয়া দৌড়াইয়া আসিল। তাহার বাপ খেতে কাজ করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সেও বাড়িতে আসিল। আজ সকলেই যেন তাহাকে কি একটা নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছে। বছিরের নিজেরও মনে হইতেছিল, সে যেন আজ কি একটা হইয়া আসিয়াছে। সেই সুখের চেতনায় সে স্কুলের সকল অত্যাচারের কাহিনী ভুলিয়া গেল। মা আজ নতুন চাউলের পিঠা তৈরী করিয়াছে। তাই খাইতে খাইতে বছির তাহার স্কুলের সকল কাহিনী বলিতে লাগিল। মা ও বাপ সামনে বসিয়া অতি মনোযোগের সঙ্গে শুনিতে লাগিল। এ যেন কত বড় মহাকাব্য তাহারা শুনিতেছে।

.

২২.

পরের দিন বছির আর নেহাজদ্দীন পাঠশালায় চলিল। মাষ্টারের নির্দেশ মত রান্না করা। হড়ীর পিছনে লাউপাতা ঘসিয়া তাহাতে পানি মিশাইয়া তাহারা কালি তৈরী করিয়াছে। তাহা দোয়াতে ভরিয়া সেই দোয়াতের মুখে রশি বাধিয়া হাতে করিয়া ঝুলাইয়া লইয়া তাহারা স্কুলে চলিয়াছে। খাগড়া-বন হইতে লাল রঙের খাগড়া বাছিয়া তাহা দিয়া কলম তৈয়ার করিয়াছে। আর কলা পাতা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়াছে। তাহার উপরে

মাষ্টার মহাশয় ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালা লোহার কাঠি দিয়া লিখিয়া দিবেন। তাহারা উহার। উপরে হাত ঘুরাইয়া বর্ণমালা লেখা শিক্ষা করিবে।

গাঁয়ের আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া ছোট গাঙ। তার উপরে বাঁশের সাঁকো! তাহা পার হইয়াই সেন মহাশয়ের পাঠশালা। মাষ্টার মহাশয় পাঠশালায় আসেন বেলা বারটায়, কিন্তু ছাত্রদের অনেকেই নয়টা বাজিতেই পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা গোল্লাছুট, হাডুডু প্রভৃতি গ্রাম্য খেলা খেলিয়া এর গাছ হইতে,ওর গাছ হইতে, যখন যে-কালের যে ফল ফুল চুরি করিয়া পাড়িয়া মহাকলরবে এই সময়টা কাটাইয়া দেয়। কাহারও মাচানের শশা ছিঁড়িয়া, কাহারও কাঁদিভরা নারিকেল পাড়িয়া, কাহারও খেতের তরমুজ চুরি করিয়া, তাহারা নিরীহ গ্রামবাসীর আতঙ্কের কারণ হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে তাহারা পরস্পরে মারামারি করিয়া মাথা ফাটাফাটি করে। যে যে পথে মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সেই পথে ছেলেরা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। দূর হইতে মাষ্টার মহাশয়ের ভাঙা ছাতাখানা যার দৃষ্টিতেই আগে পড়ুক সে দৌড়াইয়া আসিয়া আর আর ছেলেদের খবর দেয়। অমনি ছাত্রেরা যে যেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া উচ্চ শব্দ করিয়া পড়িতে মনোযোগ দেয়। দূর হইতে মনে হয় পাঠশালা ঘরখানিতে যেন সমুদ্র গর্জন হইতেছে।

মাষ্টার মহাশয় আসিয়াই প্রথমে গায়ের জামাটা খুলিয়া ঘরের বেড়ার সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিয়া হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়েন। অমনি দুই তিনটি ছাত্র মাষ্টার মহাশয়কে বাতাস করিতে আরম্ভ করে। মাষ্টার মহাশয়ের হুঁকোটিকে লইয়া একটি ছাত্র দৌড়াইয়া পানি ভরিতে যায়। আর একজন দৌড়াইয়া যায় কলিকায় তামাক ভরিয়া পাশ্ববর্তী বাড়ি হইতে আগুন আনিতে। এই কার্য প্রায়ই গণশা সমাধা করে। পূর্বে কায় পানি ভরা আর কলিকায় আগুন দেওয়ার ভার গণশার উপরেই পড়িত কিন্তু একজন

ছাত্র নাফরমানি করিয়া একদিন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ করিয়া দিয়াছিল, “মাষ্টার মহাশয়! গণশা আপনার হুঁকায় জোরে জোরে টান দিয়া আনিয়াছে।” অবশ্য গণশা তখনই ঠাকুর দেবতার নাম লইয়া দিব্যি করিয়া বলিয়াছিল সে উহা করে নাই, কিন্তু কোতে টান দিয়া মাষ্টার মহাশয় যখন দেখিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র তামাক অবশিষ্ট নাই এবং গণশার নাক দিয়া তখনও কিঞ্চিৎ ধূম্র বাহির হইতেছে, তখন বেত লইয়া গণশাকে প্রচুর শিক্ষা দিয়া সেই হইতেই নিয়ম করিলেন যে গণশা হুঁকায় পানি ভরিতে পারিবে না, সে শুধু। কলিকায় তামাক ভরিয়া আগুন দিয়া আনিবে। এই ব্যবস্থার ফলে যদিও গণশা মাঝে মাঝে কলিকায় টান দিয়া তামাকের অর্ধেকটা পোড়াইয়া আনে তবু তার মত পরিপাটি করিয়া কলিকায় তামাক ভরিয়া আগুন দিতে আর কেহই পারে না বলিয়া একাজের ভার এখনও গণশার উপরেই রহিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয়ের ধূমপান শেষ হইলেই আরম্ভ হইল নালিশের পালা। ও-পাড়া হইতে কমিরউদ্দীনের বিধবা বউ আসিয়া হামলাইয়া কাঁদিয়াপড়িল, “মাষ্টার মহাশয়! আমার ধরন্ত শশা গাছটি আপনার পাঠশালার আবদুল টানিয়া ছিঁড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। তখনই আবদুলকে ডাকিয়া আনিয়া মাষ্টার মহাশয় সূর্য-ঘড়ির ব্যবস্থা করিলেন। সূর্য-ঘড়ি মানে ‘হাফ নিল ডাউন হইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকা। ফটিকের বাপ আসিয়া নালিশ করিল, ইয়াসিন ঢিল মারিয়া তাহার ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। এই মতে বহু নালিশ এবং তাহার বিচার সমাধান করিয়া মাষ্টার মহাশয় নাম প্রেজেন্ট আরম্ভ করিলেন। নাম প্রেজেন্ট করিয়া দেখা গেল মধু, আজিজ আর করিম আসে নাই। অমনি তিন চারজন ঢেঙা ছাত্র মাষ্টার মহাশয়ের নির্দেশ মত তাহাদের খুঁজিতে ছুটিল। এইবার যথারীতি মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত ছাত্রদিগকে পড়ান আরম্ভ করিলেন। পড়ানোর সময় তাঁহার মুখ যতটা চলিল তাহার অধিক হাতের বেতখানা ছাত্রদের পিঠে পড়িতে লাগিল।

নেহাজদ্দী আর বছির নূতন আসিয়াছে। কলাপাতার উপর বর্ণমালা লিখিয়া দিয়া মাষ্টার মহাশয় তাহাদিগকে তাহার উপর হাত ঘুরাইবার নির্দেশ দিলেন। অপটু হাতে কলম ধরিতে হাত কাপিয়া যায়। কলমটি কালির দোয়াতে ডুবাইয়া সেই খাড়া পাতার উপর বুলাইতে কলমের আগা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া যায়। তবু অতি মনোযোগের সঙ্গে সেই খাড়া পাতার উপর তাহারা হাত বুলাইতে থাকে। বছিরের কেবলই বাড়ির কথা মনে হয়। ছোট বোন বড় যেন এখন কি করিতেছে। নেহাজদ্দীনের বোন ফুলী বুঝি এখন আম বাগানের ধারে তার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছে। কে বাশঝাড়ের আগায় উঠিয়া তাহার নাকের নথ গড়িবার জন্য বাঁশের কচি পাতা পাড়িয়া দিবে। এইসব কথা তাহার কলমের আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলির মধ্যে প্রকাশ হয় কিনা জানি না, কিন্তু এইসব ভাবিতে তাহার কলমের আগা কলাপাতায় খাড়া অক্ষরের বেড়া ডিঙাইয়া এদিকে ওদিকে যাইয়া পড়ে। অমনি হাতের তালু দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া সেই খাড়া অক্ষরের উপর হাত বুলাইতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে পাঠশালার ঢেঙা ছাত্ররা সেই অনুপস্থিত তিনটি ছাত্রকে ধরিয়া আনিল। বলির পাঠা যেমন কাঠগড়ায় উঠিবার আগে কপিতে থাকে তাহারাও সেইভাবে কপিতেছিল। তাহাদের একজন মাছ ধরিতে গিয়াছিল। হাতে-পায়ে কাদা লাগিয়া আছে। অপর দুইজন গহন জঙ্গলে মৌমাছির চাক হইতে মধু পাড়িবার জন্য সাজ-সরঞ্জাম তৈরী। করিতেছিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাদিগকে এমন পিটান পিটাইলেন যে তাহাদের কান্না শুনিয়া বছিরের চোখ দিয়া জল আসিতেছিল।

বহুক্ষণ পরে পাঠশালার ছুটি। বছির আর নেহাজুদ্দীন বাড়ি ফিরিল।

.

২৩.

এইভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। একদিন গণশার সঙ্গে বছিরের আলাপ হইল। গণশার বাপ এদেশের একজন বর্ধিষ্ণু চাষী। বাড়িতে কোন কিছুরই অভাব নাই। বাপের বড় ইচ্ছা গণশাকে লেখাপড়া শেখায়। বাপ নিজে তিন চার গ্রামের মধ্যে সব চাইতে ধনী হইলেও লেখাপড়া জানে না বলিয়া লোকে তাহাকে সম্মানের চোখে দেখে না। সেইজন্য গণশাকে লেখাপড়া শিখাইয়া নিজের দৈন্যকে সে কতকটা ঢাকিতে চায়। কিন্তু মূর্খ পিতা ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত। কি করিয়া ছেলের পড়াশুনার তদারক করিতে হয় জানে না। পাঠশালার মাষ্টার মহাশয়ের সেই মান্ধাতার আমলের শিক্ষা-প্রণালীর যাতাকলে পড়িয়া চার পাঁচ বৎসরেও ছেলে লেখাপড়ায় এতটুকুও অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু পুস্তকের বিদ্যা না শিখিলেও তাহার মানস-বৃত্তি চুপ করিয়া থাকে নাই। কোন গাছের আম পাকিলে কি ভাবে চুরি করিয়া আনিতে হইবে, কোন জঙ্গলের ধারে কাহার গাছের কাঁঠাল পাড়িয়া আনিতে হইবে, এইসব বিদ্যায় তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। এই সব চুরি-করা ফল-ফলারির একটাও সে নিজে মুখে দিয়া দেখে না। খেলার সাথীদের বিলাইয়া দিয়া আনন্দ পায়। এসব কথা প্রবাদের মত পাঠশালার সকল ছেলেই জানে।

বছির তাকে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা গণেশ ভাই! তুমি ত একটা ফলও মুহি দাও না। তয় মানষীর বাড়িত্যা চুরি কইরা পাইড়া আইন্যা সকলেরে বিলাও ক্যান?”

গণশা বলে, “দেখ বছির! তুই বুঝবি ন্যা। যাগো আমি ও-সগল আইন্যা দেই তাগো বাড়িতে ফল-ফলারি একটাও নাই। তারা ওগো গাছের ফল-ফলারির দিকে চায়া থাকে। আমার ইচ্ছা করে কিন্যা আইন্যা ওগো খাওয়াই। পয়সা নাই বইল্যা কিন্যা যহন আনবার পারি না, তহন চুরি কইরা নিয়া আসি। আয় বছির! আয় নেহা! ওই জঙ্গলের মদ্দি কুশাইর চুরি কইরা আইন্যা রাখছি। তোগো ভাগ কইরা দেই।”

বছির বলিল, “ধেৎ, তা ঐলে গুনা ঐব।”

গণশা হাসিয়া বলিল, “গুনা কিরে! ওগো খ্যাতে এত আছে! আমি ত মাত্তর কয়খানা নিয়া আইছি। চল তোগো জায়গা দেখায়া দেই। কাউকে কবি না কিন্তুক। ও-পাড়ার নেয়াজ আর মনসুর, তাগো নিজের বাড়ির কাঁঠাল চুরি কইরা আইন্যা খাওয়াইলাম। তারা কিনা মাষ্টার মশায়রে কয়া দিল। তা কয়া কি করল? মাষ্টার আমারে একটু মারল। এ মাইর ত আমার লাইগ্যাই আছে।”

এই বলিয়া গণশাবছির আর নেহাজদ্দীনকে টানিয়া লইয়া চলিল। সাহাপাড়া ছাড়িয়া আদুর ভিটা। তারপরে মাঠ। সেই মাঠের ওপারে শোভারামপুরের জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝ দিয়া সরু একখানা পথ। সেই পথের উপরে দুই পাশের গাছের ডাল হইতে লতাপাতা আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কোথাও বেতের শিষা আসিয়া পথ আটকাইয়াছে। অতি সন্তর্পণে তাহা সরাইয়া গণশাবছির আর নেহাজদ্দীনকে আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। দুই পাশ হইতে কুব কুব করিয়া কানা কুয়া ডাকিতেছিল। সামনের জলো-ডুবায় বাচ্চা লইয়া ডাহুক ডাহুকী ডাকিতেছিল। তাহাদের শব্দ শুনিয়া উহারা ঘন বেত ঝাড়ের মধ্যে লুকাইল। ডোবার একধারে সইলের পোনা কিলবিল করিতেছিল। গণশা

পানির মধ্যে হাত ডুবাইয়া ধীরে ধীরে টোকা দিতে লাগিল। পোনাগুলি আসিয়া তাহার চারিধারে জড় হইল! তখন সে পকেট হইতে মুড়ি বাহির করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দিল। এরূপ ভাবে খানিকক্ষণ খেলা করিয়া গণশা সামনের দিকে আরও আগাইয়া গেল। পথের ওই ধারে একটি গর্ত। হাতের ইশারায় বছির ও নেহাজদ্দীনকে শব্দ করিতে বারণ করিয়া গণশা যাইয়া সেই গর্তের সম্মুখে আরও কতকগুলি মুড়ি ছড়াইয়া দিল। খানিক বাদে গর্তের ভিতর হইতে তিন চারিটি শেয়ালের ছানা আসিয়া সেই মুড়ি খাইতে লাগিল। গণশা তাহার দুই তিনটাকে ধরিয়া কোলে করিয়া এমন ভাবে তাহাদের আদর করিতে লাগিল যেন উহারা তাহার মায়ের পেটের ভাই-বোন। আদর করিতে করিতে গণশা বলিল, "এগো আদর কইরা সুখ আছেরে। পাঠশালার ছাত্তরগো মত বেইমান হয় নালিশ করে না।" এখান হইতে গণশা আরও খানিক দূরে ঘন ফুলখড়ি গাছের জঙ্গলের মধ্য হইতে চার পঁচখানা গেণ্ডারী টানিয়া বাহির করিয়া বলিল, "তোরা খা।"

গেণ্ডারী খাইতে খাইতে তাহাদের অনেক কথা হইল। সন্ধ্যার পর কালো চাদর মুড়ি দিয়া কিভাবে গণশা শেখ হনুর খেত হইতে গেণ্ডারী চুরি করিয়াছিল, এমনি করিয়া দা ধরিয়া গেণ্ডারী কাটিলে শব্দ হয় না, গেণ্ডারী খেতের মধ্যেই বাঁশের চালার টং পাতিয়া হনু জাগিয়া খেত পাহারা দিতেছিল। তাহার কাশির শব্দ শুনিয়া গণশার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপতেছিল। সে টের পাইলেই তাহার প্রতি হাতের তীক্ষ্ণধার টেটা ছুঁড়িয়া মারিত, ইহার আনুপূর্বিক কাহিনী গণশা তাহাদের নিকট এমন করিয়া বর্ণনা করিল যেন সমস্ত ঘটনা তাহাদের চক্ষের সামনেই ঘটিতে দেখিতেছে। এই দুইটি শ্রোতার সামনে সমস্ত কিছু বলিতে পারিয়া গত রাত্রের অভিযানের সমস্ত দুঃসাহসিক ঘটনা তাহার নিকট কত বড় একটা গর্বের ব্যাপার হইয়া পড়িল।

খানিক পরে গেণ্ডারী চিবাইতে চিবাইতে-বছির বলিল, “আচ্ছা গণেশ ভাই! তুমি এত কাজ করবার পার কিন্তু রোজকার পড়াডা কইর্‌যা আস না ক্যান?”

গণশা বলে, “দেখ বছির! পড়বার ত আমারও মনে কয় কিন্তু পড়াডা মাষ্টার মশায় ক্যাবল একবার কয়া দ্যান। আমি মনে রাখপার পারি না। বাড়ি যায়া হে পড়া আমারে কিডা দেহায়া দিবি? আমাগো বাড়ির কেওই লেহাপড়া জানে না। সেন মশায়ের পুলারা বাল লেহাপড়া করে, ঘোষ মশায়ের পুলারা বাল পাশ করে, ওগো বাড়িতি পড়া দেহায়া দিব্যার লোক আছে, বাড়িতি মাষ্টার রাইখ্যাও ছাওয়ালপানগো পড়ায়।”

বছির বলে, “ঠিকই কইছ বাই। আমাগো বাড়িতি পড়া দেহায়া দিবার কেওই নাই। আমারেও মাষ্টার মশাইর মাইর খাইতি অয়। কিন্তুক আমাগো বাড়িতি যে বিদ্বান লোক নাই হে তো আমাগো অপরাধ না।”

গণশা বলে, “হে কতা কে বোঝে ভাই? তোরাও আমার মতন পোড়া কপাল্যা। সেই জন্যিই ত তোগো আমার এত ভাল লাগে!”

বছির গণশার কাছে আরও আগাইয়া আসে। গণশা বলে, “আর এক কর্তা হোন বছির! ওগো পুলারা দেমাগে আমার লগে কতা কয় না। হে দিন যে নারক্যাল চুরি কইরা আনলাম না? স্যান মশার আর গোষ মশার পুলাগো দিলাম না দেইখ্যা আমার নামে মাষ্টার মশার কাছে নালিশ করল। আচ্ছা ক তো বছির! ওগো গাছ ভরা কত নারক্যাল, তার একটাও ওরা কাউরে কুনুদিন দিয়া খায়? আমার চুরি করা নারক্যাল ওগো আমি

দিব ক্যান? নালিশ পায়া মাষ্টার মশায় আমারে যা মারল! তা আমিও কয়া দিলাম বছির! একদিন কায়দায় পাইলে আমি ওগো পিঠে তার শোধ তুলব।”

বছির বলে, “গণেশ ভাই। তোমারে যহন মাষ্টার মশায় ব্যাত দিয়া মারল আমার হামলায়া কানবার ইচ্ছা করল। কানলাম না ভয়ে যদি তানি আইসা আমারেও ওইভাবে। মারে।”

এই কথা বলিতেই কোথাকার সাতসমুদুরের কান্দন যেন গণশাকে পাইয়া বসিল। মাষ্টারের অকথিত অত্যাচারের জ্বালা সে দিনের পর দিন মাসের পর মাস সহ্য করিয়া আসিতেছে, তার এত যে আদরের বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন তারা কেউ কোনদিন এর জন্য এতটুকু সহানুভূতি তাকে দেখায় নাই। একবার মাষ্টার তাহাকে বাঁশের কঞ্চি দিয়া পিটাইয়া মাথার একস্থানে জখম করিয়া দিয়াছিল। সেই অবস্থায় বাপের কাছে গেলে বাপ বলিল, “তোরে পিটাইয়া মাইরা ফালাইল না ক্যান? মাষ্টার ত বিনি কারণে মারেন নাই। নিশ্চয়। কুনু দোষ করছিলি।” এই বলিয়া বাপ তাহার চোয়ালে আরও দুইটা থাপড় দিয়াছিল। ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে সে যত দুঃখ পাইয়াছে সুবিশাল দুনিয়ার মধ্যে আজ এই একটি মাত্র লোক তাকে সহানুভূতি দেখাইল। মাষ্টারের এত যে মার তাতে সে কোনদিন চোখের জল ফেলে নাই। কিন্তু আজ এই ক্ষুদ্র বালকের কাছে সমবেদনার স্পর্শ পাইয়া তার সকল দুঃখ যেন। উথলাইয়া উঠিল। গায়ের জামা খুলিয়া গণশা বলিল, “দেখ বছির! মাষ্টার মাইরা আইজ আমারে রাখে নাই।”

বছির চাহিয়া দেখিল, তাহার পিঠ ভরা শুধু লাঠির দাগ। কোন কোন জায়গায় কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে। সেই ক্ষত স্থানে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বছির বলিল, “আহারে গণেশ বাই! তোমারে এমন কইরা মারছে?”

গণশা বলে, "দেখ বছির। আমি সন্ন্যাসী হয়া জঙ্গলে যায়া তপস্যা করব। দেবতা যদি আমার তপে তুষ্ট হয়া বর দিতি আসে তবে কইমু, আমারে এমন বর দাও ওই মাষ্টারের লাঠি গাছারে আমি যা হুকুম করুম ও যেন তাই করে। তহন আবার আইস্যা পাঠশালায়। পড়বার যামু। মাষ্টার যহন আমারে লাঠি দিয়া মারতি আইব অমনি লাঠিরে কইমু, লাঠি ফিরা যায়া মাষ্টারের পিঠি পড়, খানিকটা লাঠির বাড়ি পিঠি পাইলি তহন বুঝবি মাষ্টার, লাঠির মাইরের কেমুন জ্বালা।"

বছির বলে, "আচ্ছা গণেশ ভাই! এমন মন্তর সেহা যায় না? যহন মাষ্টার মশায় তোমারে মারতি আসপি তহন মন্তর পইড়া আমি ফুঁক দিব, অমনি মাষ্টারের আত অবশ হয়া যাবি।"

এইভাবে তিন কিশোর বালকের জল্পনা-কল্পনায় বনের মধ্যে অন্ধকার করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া যে যার বাড়িতে চলিয়া গেল।

বছির বাড়ি আসিতেই বড় আগাইয়া আসিল, "মিঞা বাই! তুমি এত দেরী করলা ক্যান? তোমারে না কইছিলাম, আমার জন্যি সোনালতা লয়া আইবা? তা আনছ নি?" চৌধুরীদের বাড়ির সামনে একটি কুল গাছে প্রচুর সোনালতা হইয়াছে। সোনালতা দিয়া হাতের পায়ের অলঙ্কার গড়া যায়–মালা করিয়া গলায় পরা যায়। বছির যেখানে যা কিছু। ভাল জিনিস দেখে ছোট বোন বড়ুকে আসিয়া বলে। সেদিন এই সোনালতার কথা বলিতেই বড় সোনালতা আনিবার জন্য বড় ভাইকে বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছিল। বছির বড়ই

অনুতপ্ত হইয়া বলিল, “আরে যা; সোনালতার কতা আমার মনেই ছিল না।”

মুখ ফুলাইয়া বোন বলে, “আচ্ছা, আচ্ছা। আমার কতা তোমার মনেই থাহে না।”

বছির বলে, “আমার সোনা বইন রাগ করিস না। কালকা আমি তোর জন্যি অনেকগুলিন সোনালতা আইনা দিব।”

বোন খুশী হইয়া বলে, “শুধু আমার জন্যি না। ফুলুর জন্যিও আইনো। আমরা দুইজনে তোমার জন্যি ডুমকুরির মালা গাইথা রাখছি। ফুলু অনেকক্ষণ দেরী কইরা এই এহন চইলা গেল।”

হাসিতে হাসিতে বড় ডুমকুরির মালা আনিয়া বছিরের গলায় পরায়া দিল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া বছিরের অনেকক্ষণ ঘুম হইল না। গণশার জীবনে যে অবিচারের কাহিনী সে আজ শুনিয়া আসিয়াছে, রাত্রের কালো পর্দায় কে যেন তাহা বার বার অভিনয় করিয়া দেখাইতেছিল। কিন্তু সে যে বড় অসহায়! কে তাহাকে এমন তেলেসমাতি শিখাইয়া দিবে যার বলে এক মুহূর্তে সে গণশার জীবন হইতে সমস্ত অত্যাচার মুছিয়া দিতে পারে?

.

২৪.

রবিবারের দিন পাঠশালার ছুটি। ভোর না হইতেই নেহাজদ্দীন আর তার বোন ফুলী আসিয়া উপস্থিত।

“ও বছির-বাই! তোমরা নি এহনো ঘুমায়া আছ?” ফুলের মতন মুখোনি নাচাইয়া ফুলী ডাকে, “ও বড়ু! শিগগীর আয়।”

বড়ু তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডাক দেয়, “ও মিঞা-বাই! ওঠ, ফুলী আইছে–নেহাজ-বাই আইছে।”

হাতের তালুতে ঘুমন্ত চোখ ডলিতে ডলিতে বছির তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসে।

বাড়ির ওধারে গহন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে নাভিওয়ালা আমের গাছ। সিন্দুইরা-আমের গাছ। গাছের তলায় ঘন বেত ঝাড়। তারই মাঝ দিয়া সরু পথখানি গিয়াছে। সকলকে পিছনে ফেলিয়া বড় তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইয়া একটা সিন্দুরে-আম কুড়াইয়া পাইল, তারপর আর একটা। ওদিকে ফুলী নাভিওয়ালা আম গাছের তলায় যাইয়া চার পাঁচটা আম পাইল। নেহাজ যাইয়া উঠিল সিন্দুরে-আমগাছে, আর বছির উঠিল গিয়া নাভিওয়ালা আমগাছে। নাভিওয়ালা আম গাছে লাল পিঁপড়ে ভর্তি। হাতে পায়ে অসংখ্য পিঁপড়া আসিয়া বছিরকে কামড়াইয়া ধরিল। সে তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

“ও মিঞা-বাই! তোমারে যে পিঁপড়ায় কামড়ায়া চাকা চাকা কইরা দিছে। এদিকে ফেরো ত দেহি। হায়! হায়! তোমার মাথার চুলী লাল পিঁপড়া জট মেইলা রইছে। ও ফুলী! খাড়ায়া দেহস কি? মিঞা-বাইর গার ত্যা পিঁপড়া বাছ।” বড় আর ফুলী দুইজনে। মিলিয়া বছিরের গা হইতে লাল পিঁপড়ে বাছিতে লাগিল। সিন্দুরে-আমের গাছ খুব লম্বা। তার

আগডালে সাত আটটি আম পাকিয়া লাল টুক টুক করিতেছে কিন্তু নেহাজদ্দী অত উপরে উঠিতে পারিল না। সেও নামিয়া আসিল।

বড় বলিল, “আইজ আর আম পাড়ার কাম নাই। আইস আমরা খেলি। আমার বড় ভাইর যেন বিয়া ঐব।”

ফুলী ভুরু নাচাইয়া বলিল, “বড় ভাইর বোনের বিয়া আগে ওক।”

“না আগে ত বড় ভাই, তবে না বোন। বড়র থইনাই না আরম্ভ করতি অয়।”

ফুলী বলে, “আ’লো তুই ত নেহাজ-ভাইর ছোট বোন। তোর বিয়া আগে ওক।”

“না, তোর,” “না তোর,” “তোর,” “তোর।”

বছির তখন মিমাংসা করে, “আচ্ছা, তোগো দুই জনের বিয়াই একত্তর হোক।” বড় বলে, “তবে তোমাগো বিয়াও একত্তর হোক।” বছির হাসিয়া বলে, “বেশ।” তখন বছিরের বউ সাজিল ফুলী, আর নেহাজদ্দীনের বউ হইল বড়। ফুলীর বিয়ার পর সে চলিয়াছে বরের বাড়ি ডোলায় চাপিয়া। দুইটা বাঁশের কঞ্চি বাকাইয়া কৃত্রিম ডোলা তৈরী হইয়াছে। ডোলার মধ্যে বসিয়া বউ কান্দে, “হু-উ-উ।” বর নেহাজদ্দী বলে, “বউ তুমি কান্দ ক্যান? বউ সুর করিয়া গান ধরে ও।

“মিঞা ভাইর বাঙেলায় খেলছি হারে খেলা সোনার গোলা লয়া নারে।

আমার যে পরাণ কান্দে সেই না গোলার লাইগারে।”

বর নেহাজী বলে, “আমার সাত ভাই-এর সাত বউ, তারা তোমারে হিরার গোলা বানাইয়া দিব খেলনের জন্যি।”

বউ তবু কান্দে, “হু-উ-উ।” বর জিজ্ঞাসা করে, “বউ! তুমি আবার কান্দ ক্যান?” বউ তখন সুর করিয়া বলে,–

“এত যে আদরের, এত যে আদরের
ও সাধুরে মাধন কোথায় রইল নারে।”
বলে বর, “আমার দ্যাশে আছে হারে মাধন
ও সুয়ারে মাধন বলিও তারেরে।”
কনে তখন বলে,
“আম্ব গাছের বাকলরে সাধুর কুমার! চন্দন গাছে ওকি লাগেরে।
তোমার মায়ের মিঠা কথারে সাধুর কুমার, নিম্ব যেমুন তিতা নারে!
আমার মায়ের মুখের কথারে সাধুর কুমার! মধু যেমন মিষ্ট নারে।”

গান শেষ হইতে না হইতেই ফুলী বলে, “ও কিলো। তোরাই বুঝি কতা কবি? আমরা বুঝি কিছু কব না?”

তখন বড় বলে, “আমি ত বউ অয়া তোগো বাড়িতি আইলাম। তুই এহন আমার লগে কতা ক।”

ফুলী তখন নতুন বউ এর ঘোমটা খসাইতে খসাইতে বলে, “ও বউ! আইস বাগুন। কুইট্যা দাও।”

বউ বলে, “বাগুন ত বালা না, পোকা লইগ্যাছে।”

ফুলী বলে, “ও মিঞা-ভাই! শোন কতা। তোমার বউ বাগুন কুটতি পারে না।”

তখন বর নেহাজদ্দীন বউকে লাঠি লইয়া যায় মারিতে।

ফুলী আবার বউকে জিজ্ঞাসা করে, “ও বউ ঘর সুইরা বিছানা কর।”

বউ বলে, “ঘরের মদ্দি মশা ভন ভন করতাছে।”

ফুলী কয়, “ও বউ! কোথায় যাও?”

“মশার জ্বালায় ঘরের পিছনে যাই।”

“ও বউ! আবার কোথায় যাও?”

“ঘরের কাঞ্জি সাপে পট মেলছে। আমি তার ভয়ে মাঠে যাইত্যাছি।”

“ও বউ! আবার কোথায় যাও?”

“মাঠের মদ্দি কোলা গড়গড় করে। আমি গাঙের গাটে নাইতে যাই।”

গাঙের ঘাটে যাইয়া বউ দেখে তার বাইরা অনেক দূরি নাও বাইয়া যায়। বউ তাগো। ডাইকা কয়–

ও পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক টুক করে,
গুণবতী ভাই! আমার মন কেমন করে।
হাড় হল ভাজা ভাজা মাংস হৈল দড়ি,
আয়রে কারিন্দার পানি ডুব দিয়া মরি।"

ফুলু ঘাড় দুলাইয়া বলে, "না লো! এ খেলা আমার বাল লাগে না। খালি কান্দন আসে। আয় একটা হাসি-তামাসার খেলা খেলি।"

বড়ু বলে, "আচ্ছা! তোর বরের কাছে একটা জিনিস চা।" কনে ফুলী এবার উ-উ করিয়া কান্দে।

বর বছির তাড়াতাড়ি যাইয়া বলে, "ও বউ! তুমি কান্দ ক্যান?"

বউ বলে, "আমার যে সিন্যা খালি রইছে। আমার জন্যি সিন্দুর আনছ নি?"

পর কচু পাতায় পাকা পুঁই ডাটা ঘসিয়া বলে, "এই যে সিন্দুর আনছি, কপালে পর।"

বউ টান দিয়া সিন্দুরের পাতা ফেলাইয়া দেয়। বড়ু গান ধরে :

"দেশাল সিন্দুর চায় নারে ময়না,
আবেরি ময়না ঢাকাই সিন্দুর চায়,

ঢাকাই সিন্দুর পরিয়া ময়দার গরম লাগে গায়।”

তখন বর ইন্দুরের মাটি আনিয়া বউ-এর হাতে দিয়া বলে, “এই যে ঢাকাই সিন্দুর আইনা দিলাম, এইবার কপালে পর।”

বউ আবার কান্দে, “উ-উ-উ।”

বর বলে, “বউ! আবার কান্দ ক্যান?”

বউ বলে, “আমার পরণের শাড়ী নাই। শাড়ী আছনি?”

বর কলাপাতার শাড়ী আনিয়া দেয়, “এই যে শাড়ী পর।” বউ থাবা দিয়া শাড়ীটা ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

বড়ু আবার গান ধরে :

দেশাল শাড়ী চায় নারে ময়না,
আবেরি ময়না ঢাকাই শাড়ী চায়;
ঢাকাই শাড়ী পরিয়া ময়নার গরম লাগে গায়।
ডান হস্তে শ্যামলা গামছা,
বাম হস্তে আবের পাখা;
আরে দামান চুলায় বালির গায়।

গান গাহিতে গাহিতে বড় বলে, "ও মিঞা ভাই! তোমার কনেরে আবের পাখা, আর শ্যামলা-গামছা দিয়া বাতাস করতাছ না ত?"

ডাইনের ঝাড় হইতে একটি কচুপাতা আনিয়া বছির কনেকে বাতাস করিতে থাকে।

এই ভাবে শিশু-মনের সহজ কল্পনা লইয়া অভিনয়ের পর অভিনয় চলে। এ অভিনয়ের রচনাকারী, নট-নটি আর দর্শক তারাই মাত্র চারিজন বলিয়া ইহার মধ্যে ত্রুটি থাকে না, শুধুই অনাবিল আনন্দ। এমনি করিয়া খেলিতে খেলিতে দুপুর হইয়া আসিল। তাহারা খেলা শেষ করিয়া কুড়ানো আমগুলি লইয়া বাড়ি চলিল।

হঠাৎ বড় উঠিয়া কান্দিয়া বলিল, "ও মিঞা ভাই। আমার নাকের ফুল আরায়া ফেলাইছি।" গ্রাম্য সুনারুর নিকট হইতে তাহার মা রূপার একটি নাকফুল তাহার জন্য গড়াইয়া দিয়াছিল। চারজনে মিলিয়া সমস্ত জঙ্গল ভরিয়া কত আতিপাতি করিয়া খুঁজিল, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র নাক-ফুলটি কোন্ পাতার তলে লুকাইয়া আছে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। বড়ু কেবল ফুপাইয়া ফুপাইয়া কান্দে। গামছার খোট দিয়া বোনের চোখ মুছাইতে মুছাইতে বছির বলে, "বড়ু! আমার সোনা বইন। কান্দিস না। আমি বড় হয়া চাকরী করব। তহন। সোনা দিয়া তোর নাক-ফুল গড়ায়া দিব।"

বোন চোখের পানি মুছিতে মুছিতে বলে, "দিবি ত মিঞা বাই?"

বোনকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া বছির বলে, "আল্লার কছম দিব।"

.

২৫.

তাম্বুলখানার হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজাহের বউকে বলে, "আমাগো বাড়ির উনি গ্যাল কই? চায়া দেহুক কারে আনছি!"

রহিমদ্দীন কারিকরকে দেখিয়া বউ মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তার পায় হাত দিয়া সালাম করে, "এই যে চাচাজান আইছে যে।"

বউকে দোয়া করিয়া রহিমদ্দীন হাসিয়া বলে, "কই, আমার বুবুজান কই?"

মায় ডাকে, "ও বড়ু! এদিকে আয়। তোর কারিকর দাদা আইছে।" বড়ু একটু কৃত্রিম লজ্জা ভাব দেখাইয়া হাসিয়া আগাইয়া আসে। রহিমদ্দীন বলে, "এই যে বুবুজান! তোমার

জন্যি একখানা শাড়ী আনছি। তা এই বুইড়া জামাই তোমার পছন্দ অবি নি?"

মা ঘোমটার তল হইতে হাসিয়া উত্তর করে, "জামাইর গান হুনলি মাইয়া এহনই। কোলে যায় বসপ্যানে।"

রহিমদ্দী গান ধরে :

"মাগো মা, কালো জামাই ভালো লাগে না।"

গান ছাড়িয়া দিয়া রহিমদ্দী ডাকে, "আমার মিঞা ভাই গেলা কোথায়?" বছির আগাইয়া আসিয়া রহিমদ্দীনকে সালাম করে। বছিরের হাতে একখানা লাল গামছা দিয়া রহিমদ্দী বলে, "তোমার দাদী এই গামছাহানা বুনাইছে। বলে, নাতীরে দেহী না কত বচ্ছর। তারে গামছাহানা দিয়া আইস গিয়া। তা আইলাম তালখানার আটে। কাপড় নিয়া আইছিলাম। তা বিককিরিও বাল ঐল। এহন তোমাগো বাড়ি বেড়ায়া যাই।"

আজাহের বলে, "ও বছির! তোর কারিকর দাদার কতা মনে নাই? সেই যে ছোটবেলায় তোরে কোলে লয়া নাচাইত আর কত গান গাইত।"

বছিরের একটু একটু মনে পড়ে। তাকে নাচাইবার সময় কারিকর দাদা গান করিত :

"নাচেরে মাল, চন্দনে কপাল,
ঘেতমধু খায়া তোমার টোবা টোবা গাল।"

আজাহের বউকে বলিল, "বড় মোরকডা দরো। আর চাইল বিজাও। পিটা বানাইতে অবি। আমি এদেক গিরামের হগল মানুষরে ডাক দেয়। আজ রাইত বইরা তোমার গান। হুনব চাচা।" রহিমদ্দী বাধা দিয়া বলে, "না, না অত কাণ্ড-বেকাণ্ড করণের লাগবি না। রাইত অয়া গ্যাছে। রাত্তির কালে বউ চাইল ভিজাইও না। সারা রাইত জাইগা ওসব করণের কি দরকার?" বউ বলে, "হোন কতা। জামাই শ্বশুর বাড়ি আইলি জামাইর আদর না করলি ম্যায়া যে আমারে খুঁটা দিবি। আপনিত রাইত বইরা গান করবেন, আমিও গান হুনব আর পিটা বানাব।"

আজাহের হুঁকোটি সাজিয়া আনিয়া রহিমদ্দীর হাতে দেয়। রহিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে, “তা আজাহের! কেমুন আছ কও!” আজাহের উত্তর করে, “আল্লার দোয়ায় বাল আছি চাচা। আমাগো আলীপুরীর খবর কও। মেনাজদ্দী মাতবর কেমুন আছে?”

“সবাই ভাল আছে।” বলিয়া কোঁচার খোট হইতে লাউয়ের বীজ আর কনেসাজানী সীমের বীজ বাহির করিতে করিতে রহিমদ্দীন বলে, “আমার মনেই ছিল না। মোড়লের বউ এই বীজগুলি পাঠাইছে বউরে। তোমাগো হেই কন্যাসাজানী সীম গাছের বীজ। তোমরা ত চইলা আইলা। তোমাগো গাছে কি সীমই না দোরল! কিন্তুক মোড়ল-বউ এর একটাও কাউরে ছিড়বার দিল না। মানষীর কাছে কইত, আমার কন্যা গেছে বিদ্যাশে। কন্যাসাজানী সীম আমার কে ছিঁড়ব? আমি ওদিগে চায়া চায়া আমার কন্যারে দেখপার। পাই।” রহিমদ্দীর হাত হইতে সীমের বীজগুলি লইতে লইতে বউর চোখ দুইটি ছলছল করিতে লাগিল।

আজাহের জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা চাচা! আগের মত গীদটি আর গাও না?” রহিমদ্দীন বলে, “তোমরা চইলা আসার পরে গাজীর গানের দল করছিলাম। কয় বছর চলছিলও বেশ, কিন্তু বিনা তারের গান না কি কয়, হেই যে বাক্সের মদ্দি ত্যা গান বাইর অয়, সগল লোক তাই হুনবার জন্যি ছোটে। আমাগো গান কেউ পোছেও না। দিনি দিনি বাপু কাল বদলায়া যাইত্যাছে। এহন এসব গান কেউ হুনবার চায় না। ওই যে থিয়েটার না কি কয়, নাচনাআলীরা যে সব গান গায় লোকে হেই রহম গান হুনবার চায়। তা হে গান ত আমার জানা নাই।”

আজাহেরও উৎসাহিত হইয়া উঠে বিনা তারের গানের কথায়, কিন্তু রহিমদ্দীকে যেন একটু সমবেদনা দেখাইবার জন্যই বলে, "তা দেহ চাচা! পেরথম দুই একদিন ওই বিনি তারের গান বাল লাগে। কিন্তুক যে মানুষ গীদ গাইল তারেই যদি না জানলাম, তার চেহারা, তার ভঙ্গী-ভাঙ্গী যদি না দেখলাম তয় গান শুইনা কি আরাম পাইলাম?" রহিমদ্দী খুশী হইয়া বলে, "তুমি জানি তা বুজলা। কিন্তু ওই যে কলে কথা কয়। সগগলি তাই কলের পাছে পাছে দৌড়ায়।" আজাহের যেন রহিমদ্দীকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলে, "কিন্তুক আমি কয়া দিলাম চাচা, মানষীর মন ফিরবি। নতুন জিনিস দেখপার নিশা বেশী দিন থাহে না। আবার পুরান জিনিসের জন্যি মানষীর মন কানবি। ওই কলের গান থুইয়া আবার তোমাগো গান হুনবার জন্যি মানুষ ঘুরবি।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রহিমদ্দী বলে, "হেই কাল যহন আইব তহন আমরা আর থাকপ না।"

আজাহের বলে, "কি যে কও চাচা? তা যা হোক, আইজ তোমারে গীদ গাইতি অবি। আমি ওদিক গিরামের সগলরে খবর দিয়া আসি।"

বউ রহিমদ্দীর সামনে মুড়ি আর গুড় আনিয়া দিয়া বলে, "চাচাজান খাউক।"

"আরে বেটি! তুমি কি লাগাইছাও আবার?" এই বলিয়া হাত পা ধুইয়া রহিমদ্দী মুড়ি খাইতে বসে।

বউ জিজ্ঞাসা করে, "চাচাজান! কেদারীর মা কেমন আছে?" "কেদারীর মা বাল নাই। বাতের বেদনায় বড়ই কাবু অয়া গ্যাছে। আসপার সময় কইল, বউরে কইস বাতের

ব্যথায় পইড়া আছি। নাতী নাতনীগো জন্যি কিছু দিবার পারলাম না। বউরে আমার দোয়া কইস।”

কেদারীর মার কথা মনে করিতে বউর চোখ ছলছল করিয়া ওঠে। বিপদে-আপদে যখন যার দরকার কেদারীর মা বিনা ডাকে তাহার উপকার করিয়া আসে। এমন মানুষ কোথায় পাওয়া যায়?

রহিমদ্দী নাস্তা খাইয়া আরাম করে। বউ ওদিকে চুলায় রান্না চড়াইয়া দিয়া চেঁকিতে চাউল কুটিতে যায়। বড়ু এখনো চাউল আলাইতে শেখে নাই। বছির আর বড় দুইজনে চেঁকিতে পার দেয়। মা চুরুনের ওঠা নামার মাঝখানে নোটের মধ্যে হাত দিয়া চাউলগুলি নাড়িয়া দেয়। মাঝে মাঝে সেই আধগুঁড়ি চাউলগুলি কুলার উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে মা কুলা দুলাইয়া গুঁড়িগুলি টেকিয়া লয়। কেমন দুই হাতে সুন্দর পরিপাটি করিয়া ধরিয়া মা কুলাখানা দোলাইতে থাকে। মায়ের হাতের চুড়িগুলি টুং টুং করিয়া বাজে। তারই তালে। তালে অভাঙ্গা মলকেগুলি নাচিয়া নাচিয়া মাকেই যেন খুশী করিবার জন্য কুলার একপাশে যাইয়া জড় হয়। গুঁড়িগুলি জড় হয় কুলার আর একপাশে। মা আস্তে করিয়া কুলায় একটি টোকা দিয়া সেই অভাঙ্গা মলকেগুলি নোটের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। গুঁড়িগুলি ধামার মধ্যে রাখে। সাজানো-গুছানো ভাবে সুন্দর করিয়া কাজ করিবার মায়ের কতই নিপুণতা। পেঁকির উপর হইতে চাহিয়া চাহিয়া বড়ু দেখে, আর ভাবে কতদিনে সে মায়ের মত যোগ্যতা লাভ করিবে।

চাউল কোটা শেষ হইলে মা চুলার উপরে পানি গরম দিয়া ধামায় সঞ্চিত গুঁড়িগুলি হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া দুই হাতের মুঠায় বড় বড় গোলা বানাইয়া উননের সেই গরম

পানির মধ্যে ফেলিতে থাকে। কিছুক্ষণ ঢেলাগুলি গরম পানিতে বলক দিয়া সেই পানিটুকুর কিছুটা গামলায় ঢালিয়া রাখে। এই পানির সঙ্গে ঢেলা হইতে কিছুটা চাউলের গুঁড়ি মিশিয়া গিয়াছে। বড় লোকেরা ইহা ফেলিয়া দেয়, কিন্তু মা ইহাতে নুন মিশাইয়া অতি তৃপ্তির সঙ্গে। খায়। তারপর মা গুঁড়ির ঢেলাগুলি থালের উপর রাখিয়া দুই হাতে আটা ছানিতে থাকে। কি আর এমন কাজ! কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুইটি তাহাই একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। এ যেন মায়ের পিঠা বানানোর নাট্যভিনয়! মাকে এই পিঠা বানাইতে তাহারা কতবার দেখিয়াছে, দেখিয়া দেখিয়া তবুও তৃপ্তি হয় না। শীতের দিনে মা শেষ রাতে উঠিয়া ভাপা পিঠা বানায়। ছেলে-মেয়ে দুইটি মায়ের সঙ্গে উঠিয়া কতবার তাকে ভাপা পিঠা বানাইতে দেখিয়াছে। প্রথম পিঠাটি সিদ্ধ হইলে মা তাদের খাইতে দেয় না। দ্বিতীয় পিঠাটি ভাঙ্গিয়া তাহাদের দুইজনকে খাইতে দেয়। তাদের খাওয়া দেখিতে মায়ের সকল পরিশ্রম স্বার্থক হইয়া ওঠে। আজাহেরের কাছে মা কতদিন হাসিয়া বলিয়াছে, "পুলাপান হওনের আগে পিঠা বানায়া সুখ ছিল না। চুলার পাশে বইসা পুলা-ম্যায়ারাই যদি না খাইল তবে পিঠা বানায়া কিসির সুখ?"

আটা ছেনা হইলে মা ছোট ছোট করিয়া এক একটা গড়া বানাইল। সেই গড়াগুলি লইয়া আবার হাতের তোলায় চ্যাপটা করিয়া দুই হাতে টিপিয়া টিপিয়া এক একটুক ছোট্ট রুটির মত করিল। তারপর বেলুন লইয়া মা রুটি বেলিতে আরম্ভ করিল। মায়ের ডান হাতের বুড়ী আঙ্গুলের পরে যে ফঁক আছে তার মধ্যে বেলুনের উঁটির একধার পুরিয়া বাম হাতের তেলো দিয়া মা বেলুন ঘুরাইতে থাকে। মায়ের সুন্দর হাতের কাঁচের চুড়িগুলি আগের মতই টুং টুং করিয়া বাজিয়া উঠে। মায়ের বেলুনের তলার আটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া রুটিতে পরিণত হয়। মায়ের আদরেই যেন এরূপ হয়। মায়ের এই কাজ দেখিয়া বছিরের বড়ই ভাল লাগে। মনে মনে ভাবে, মা যেন আরও কত কিছু বানাইতে পারে।

ছোট বোন বড় মার কাছ হইতে একটু আটা লইয়া তার ছোট্ট বেলুনটি লইয়া রুটি বানাইতে চাহে। অপটু হাতে রুটির এদিকে মোটা হয় ওদিকে পাতলা হয়, মাঝে মাঝে আবার ছিঁড়িয়াও যায়। মা মিষ্টি করিয়া বলে, "আরে আদাখলের বেটি! এই রকম কইরা বল।"

বছির বলে, "মা! তুমি আমারে আটা দিয়া একটা নৌকা বানায়া দাও–একখানা পাল্কী বানায়া দাও।"

মা বলে, "একটু সবুর কর। আগে কয়খানা রুটি বেইলা লই।" সাত আটখানা রুটি বেলা হইলেই মা কাঠখোলা চুলায় দিয়া রুটি সেঁকিতে থাকে। রান্না করিতে হাঁড়ি-পাতিল ঠুসিয়া গেলে তাহার অর্ধেকটা ভাঙ্গিয়া মা কাঠখোলা বানাইয়াছে। তাহাতে কয়েকখানা রুটি সেঁকিয়া সদ্য রান্না-করা মুরগীর তরকারী একখানা মাটির সানকিতে করিয়া মা বলে, "তোরা আগে খায়া দেখ, কেমুন ছালুন ঐছে।"

বছির আর বড় সেই তরকারীতে রুটি ভরাইয়া খাইতে খাইতে মায়ের তারিফ করে, "মা! ওমুন ছালুন তুমি কুনুদিন রান্দ নাই।" তৃপ্তিতে মার প্রাণ ভরিয়া যায়। আরও একটু ছালুন থালায় ঢালিয়া মা বলে, "বালো কইরা খা।"

বছির বলে, "মা! আর একটু ছালুন দাও। মাথাডা আমারে দ্যাও।"

মা বলে, "দেখছস না তোর দাদা আইছে? আজকার মাথাডা তারে দেই। আবার যহন মুরগী জবো করব তহন তোরে মাথাডা দিব। তুই আইজ মাইটাডা খা।"

ছেলে-মেয়ের খাওয়া হইলে আজাহের গ্রামের লোকদের গান শোনার দাওয়াত দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

রহিমদ্দীকে সঙ্গে লইয়া আজাহের এবার খাইতে বসিল। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকেরা একে একে আসিয়া আজাহেরের বাড়িতে জড় হইল। দীনু মাতবর, মোকিম, তাহের লেংড়া, ও-পাড়ার মিঞাজান সকলেই আসিল। ফুলীকে সঙ্গে লইয়া মোড়লের স্ত্রীও আসিল। তাহারা আজাহেরের বউ-এর সঙ্গে বারান্দায় বসিল।

উঠানের মধ্যে ছেঁড়া মাদুর আর খেজুরের পাটি বিছাইয়া পুরুষ লোকদের বসিতে দেওয়া হইল। মাঝখানে মোড়লের পাশে রহিমদ্দীকে বসিবার জন্য একখানা নক্সী কাথা বিছাইয়া দিল। খাওয়া শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সালাম আলেকম বলিয়া রহিমদ্দী সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। গরীবুল্লা মাতবর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই নক্সী কাঁথার আসন দেখাইয়া বলিল, “গায়েন সাহেব! বসেন।”

রহিমদ্দী বলে, “না, ও জায়গায় আপনি বসেন। আমি পাশে বসপ।” মোড়ল বলে, “আপনি ঐলেন আমাগো মেজবান। আপনাকে ওহানে বসতি ঐব।”

রহিমদ্দী বলে, “তা কি ঐতে পারে? আপনার মাইন্য ত আছে। আপনি ঐলেন মাতবর, তার উপর মুরব্বী। আপনি ওখানে বসেন।”

একে অপরকে টানাটানি করে, কেউ বসে না। তখন আজাহের বলিল, “আপনারা দুইজনেই ওই নক্সী কাথার উপর বসেন।” খুশী হইয়া মোড়ল রহিমদ্দীকে পাশে লইয়া সেই। নক্সী কাঁথার উপর বসিল। রহিমদ্দীর বিনয় দেখিয়া সভার সকলেই খুশী হইল।

মোড়লের পাশে বসিয়া রহিমদ্দীন একটা বিড়ি বাহির করিয়া মোড়লকে দিল, নিজেও একটি ধরাইয়া টানিতে লাগিল। এমন সময় আজাহের একটি একতারা আনিয়া রহিমদ্দীর হাতে দিল। রহিমদ্দী একতারাটি হাতে লইয়া টুং টুং করিয়া বাজাইতে লাগিল। সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে। না জানি কি মধুর কাহিনী সে আজ প্রকাশ করিবে তাহার ঐ একতারার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে। কিন্তু রহিমদ্দী কেবল বাজাইয়াই চলিয়াছে। সমবেত শ্রোতাদের ঔৎসুক্য আর ধৈর্য মানে না। মোড়ল বলে, "গায়েন সাব! এবার গান আরম্ভ করেন।"

রহিমদ্দী একতারা বন্ধ করিয়া একবার তার শ্রোতাদের উপর চারিদিকে চোখ ঘুরাইয়া দেখিয়া লইল। বুঝিতে পারিল, তাহাদের মন, কাহিনীর কম্পরাজ্যে ঘুরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে একটু কাশিয়া বলিল, "কি গীদ আমি গাব। গলাডাও বাল নাই। আপনাগো হুননির যোগ্য গান কি আমি জানি?"

মোড়ল বিনয় করিয়া জবাব দেয়, "আরে মিঞা! আপনি যা গাবেন তাই আমাগো বালো লাগবি। এইবার আরম্ভ করেন।"

রহিমদ্দী যেন মাটির সঙ্গেই নত হইয়া বলে, "দোহার পত্তর সঙ্গে আনি নাই। একলার গলায় কি গীদ হুনবেন?"

আজাহের বলে, "বছির। বড়ু। তোরা কই গেলি? তোর দাদার পাশে বইসা গানের গড়ান দর।"

মোড়ল বলে, "নেহাজ! ফুলী! তোরাও আয়। ও কুনা কিডা বরান নাকি? আরে মিঞা! তুমি ত এক সময় গাজীর গানের দলের দোহার ছিলা। আওগাইয়া আইস। গায়েন সাবের গানের গড়ান দর।"

দোহার ঠিক হইয়া গেল। হাতের বিড়িতে খুব জোরে আর একটা টান দিয়া নাকমুখ। দিয়া ধুয়া বাহির করিয়া রহিমদ্দী গান আরম্ভ করিল ।

ওকি আরে আরে আ—রে
দোহারেরা তাহার কণ্ঠ হইতে সুর কারিয়া গান লইয়া গায় :
ওকি আরে আরে আ-আ-রে।

রহিমদ্দী আর বরান খর মোটা গলার সঙ্গে ফুলু, বড়, নেহাজ আর বছিরের তরুণ কণ্ঠ মিলিয়া উপস্থিত গানের আসরে এক অপূর্ব ভাবের সমাবেশ হয়। রহিমদ্দীর মনে হয়। এমন মধুর সুর যেন কোনদিন তার কণ্ঠ হইতে বাহির হয় নাই। সঙ্গের দোহারদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সেও যেন তার নিজেরই। তার অন্তরের অন্তস্থল হইতে ভাব-তরঙ্গ উঠিয়া তাহাদের কণ্ঠে যাইয়া যেন আছড়াইয়া পড়ে। তার মনে হয়, আজ এই সুরের উপর। যে-কোন কাহিনীকে সোয়ার করিয়া তাহার সূত্র লইয়া সে যে-কোন দেশে যাইতে পারে। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, মানুষ, দেবতা, দানব, অতীত, বর্তমান সব যেন আজ তাহার মুঠার। মধ্যে। যখন যাহাকে ইচ্ছা সুরের সূতায় টানিয়া আনিয়া শ্রোতাদের সামনে সে দাঁড় করাইতে পারে। রহিমদ্দী আরম্ভ করে?

পূবেতে বন্দনা করলাম পূর্বে ভানুশ্বর,

একদিগে উদয় গো ভানু চৌদিগে পশর।
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা মদিস্তান,
উদ্দেশে জানায় সালাম মোমিন মুসলমান।
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত,
যাহার হাওয়াতে কঁপে সকল গাছের পাত।
দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীর-নদীর সায়র,
যেইখানে বাণিজ্য করে চান্দ সওদাগর।
সভায় যারা বইসা আছেন পূর্ণমাসীর চান,
তানগো উদ্দেশে আমি জানাইলাম সালাম।
সকল বন্দনা কইরা মধ্যে করলাম স্থিতি
এই খানে গাব আমি ওতলা সুন্দরীর গীতি।

ইরান তুরান মুল্লুকে আছে এক বাদশা নামদার। তার একহি কন্যা নাম ওতলা সুন্দরী। ওতলা সুন্দরী, যার রূপের কোন তুলনা নাই। সেই কন্যার

হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম মুখে পদ্ম দোলে,
আসমানের চন্দ্র যেন ভূমিতে পড়ল ঢ'লে।
হাইট্যা হাইট্যা যায় কন্যা খঞ্জন খঞ্জন পায়,
সোনার নূপুর বাজে যেখান দিয়া যায়।

গান শুনিতে শুনিতে বছিরের মনে হয় এ যেন তার বোন বড় আর ফুলীর রূপের বর্ণনা।

গায়েন গাহিয়া যায়, সেই কন্যার বিবাহ হইল এক সওদাগরের পুত্রের। সেই বিয়েতে কি কি শাড়ী পরছিল রাজকন্যা।

মোড়ল বলিল, "কি শাড়ী পরছিল গায়েন সাহেব? একটু নাইচা-পেইচা বলেন।"

রহিমদ্দী তখন তার গামছার খোট হইতে নূপুর জোড়া দুইপায়ে পরিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল :

প্রথমে পরিল শাড়ী নামে গঙ্গাজল,
হাতের উপর থইলে শাড়ী করে টলমল।
মৃত্তিকায় থইলে শাড়ী পিঁপড়ায় লয়া যায়,
জলেতে রাখিলে শাড়ী জলেতে মিশায়।
সেই শাড়ী পরিয়া কন্যা শাড়ীর পানে চায়,
মনমত না হইলে দাসীকে পিন্দায়।

দোহারেরা ধূয়া ধরে :

ও কালো মেঘ যেন সাজিলরে।

রহিমদ্দীর নাচনের যেন আজ বাধ ভাঙ্গিয়াছে। প্রত্যেকখানা শাড়ীর বর্ণনা, যে ভাবে পরিচারিকারা তাহা রাজকন্যাকে পরাইতেছে, মনের মত না হইলে যে ভাবে রাজকন্যা শাড়ীখানা দাসীদের দিয়া দিতেছে, সদ্য বিবাহম্মুখ রাজকন্যার মনের সলাজ আনন্দ সব কিছু তার নাচের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। রহিমদ্দী গাহিয়া যায়?

তারপরে পড়িল শাড়ী তার নাম হীত,
হাজারও দুঃখিতে পরলে তারও আইএ গীত।

এ শাড়ীও রাজকন্যার পছন্দ হইল না। সহচরীরা গুয়াফুল শাড়ী আনিল, আসমান-তারা শাড়ী আনিল, তারপর রাশমণ্ডল, কেলিকদম্ব, জলেভাসা, মনখুশী, দিলখুশী, কলমীলতা, গোলাপফুল, কোন শাড়ীই রাজকন্যার পছন্দ হয় না। তখন সব সখীতে যুক্তি করিয়া রাজকন্যাকে একখানা শাড়ী পরাইল।

তারপরে পরাইল শাড়ী তার নাম হিয়া,
সেই শাড়ী পিন্দিয়া হইছিল চল্লিশ কন্যার বিয়া।

এই শাড়ী রাজকন্যার পছন্দ হইল। এবার রহিমদ্দী সেই শাড়ীর বর্ণনা আরম্ভ করিল :

শাড়ীর মদ্দি লেইখ্যা থুইছে নবীজীর আসন,
শাড়ীর মদ্দি লেইখ্যা থুইছে আল্লা নিরাঞ্জন।
শাড়ীর মদ্দি লেইখ্যা থুইছে কেলীকদম্ব গাছ,
ডালে বইসা ঠাকুর কৃষ্ণ বাশী বাজায় তত।

দারুণ অভাবের মধ্যে যাহাদের দিন কাটে তাহারা ত এই সব বিলাসের উপকরণ কোনদিন চোখেও দেখে নাই। বড় লোকদের সুন্দর সুন্দর মেয়েরা কত অষ্ট-অলঙ্কার পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের জীবন কতই না মাধুর্যময়। সেই বিলাস উপকরণ–সেই রহস্যময় জীবনকে গানের সুরের মধ্যে ধরিয়া আনিয়া রহিমদ্দী তার সর্বহারা শ্রোতাদের

মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। বাস্তব জীবনে যারা সব কিছু হইতে বঞ্চিত, রহিমদ্দীর গানের সুরে তার কিছুটা পাইয়া হয়ত তাহাদের অবচেতন মনের কোন একটি স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। রহিমদ্দীন গান গাহিয়া যায় :

আনিল বেশরের ঝাপি খুলিল ঢাকনি,
ডান হস্তে তুলিয়া লইল আবের কাঙ্কনখানি।
চিরলে চিরিয়া কেশবাসে বানল খোঁপা,
খোঁপার উপর তুইল্যা দিল গন্ধরাজ চাপা।
সাজিয়া পরিয়া এই দিন কন্যা হৈল ক্ষীণ,
কোমরে পরিল কন্যা সুবর্ণের জিন।
তার দিল তরু দিল কোমরে পাশুলী,
গলায় তুলিয়া দিল সুবর্ণের হাসলী।
কোমরখানি মাঞ্জা সরু মুইটের মধ্যে ধরে,
কাকুনিয়া গুয়া গাছটি হেইলা দুইলা পড়ে।
সাজিয়া পরিয়া কন্যা বসল বড় ঠাটে,
নীমাসামের কালে যেমন সূর্য বইল পাটে।

সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া সওদাগরের পুত্র সারাদিন বারো বাঙলায় বসিয়া বউ-এর সঙ্গে পাশা খেলে। যাইট’ কাহন নৌকা সওদাগরের ঘাটে বান্ধা থাকে। লোকজন পথে-ঘাটে সওদাগরের নিন্দা করে। এই খবর সওদাগরের কানেও আসিল। তখন ওতলা সুন্দরীর কাছে বিদায় লইয়া সওদাগর দূরের বাণিজ্যে পাড়ি দিল। যাইবার কালে

অশ্রুসজল কণ্ঠে সওদাগর মায়ের কাছে বোনের কাছে বলিয়া গেল ।

"ঘরেতে রহিল আমার ওতলা সুন্দরী,
আমার মতন তারে রাইখ যত্তন করি।"

সওদাগর ছয় মাসের পথ চলিয়া গিয়াছে। কত ইরানী-বিরানীর বন্দর পাছে ফেলাইয়া, কত বউখাটা, গোদাগাড়ী, চিরিঙ্গার বাজারে নৌকা ভিড়াইয়া সওদাগর সাত সমুদুরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে এক পাখির কাছে ছয় মাসের পথ একদণ্ডে যাইবার ফিকির জানিয়া সওদাগর গভীর রজনী কালে ওতলা সুন্দরীর মহলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা-বোন জানিল না। কাক-কোকিলও টের পাইল না। ওতলার বাসর-শয্যায় রাত্র। যাপন করিয়া প্রভাতের তারা না উঠিতেই আবার মন্ত্রবলে সওদাগর সমুদ্র তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল।

দিনে দিনে হায়রে ভালা দিন চইলা যায়
গর্ভের চিহ্ন দেখা দিল ওতলার গায়।

প্রথমে কানাকানি-তারপর লোক জানাজানি। বাশুড়ী-ননদীর কাছে ওতলা সকল কথা কয়। কিন্তু কে বিশ্বাস করিবে ছয় মাসের পথ হইতে সওদাগর একদণ্ডে গৃহে আসিয়াছিল। তখন গায়ের অষ্ট-অলঙ্কার খুলিয়া ছেঁড়া চটের বসন পরাইয়া শ্বশুড়ী-ননদী ওতলা সুন্দরীকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিল। ছিল রাজনন্দিনী হইল পথের ভিখারিনী। গানের সুরের ঝঙ্কারে রহিমদ্দী এবার রাজসিংহাসন হইতে তার নায়িকাকে নামাইয়া

আনিয়া সর্বসাধারণের দলে মিশাইয়া দিল। কান্দিতে কান্দিতে ওতলা সুন্দরী পথে বাহির হইল :

“কান্দে কান্দে হায় ওতলা পন্থ চলে হায়
ওতলার কান্দনে আজকা আসমান ভাইঙ্গা যায়।”

গানের সুরে ঢেউ লাগাইয়া লাগাইয়া রহিমদ্দীন গাহিয়া চলে :

“গাছের পাতা ঝইরা পড়ে ওতলার কান্দনে,
খায় দানা না খায় পানি বনের মৃগী বনে।”

সেই কান্দনে সমবেত শ্রোতাদের চোখের পানি ঝরিয়া পড়ে। গামছার খোটে চক্ষু মুছিয়া রহিমদ্দী গাহিয়া যায়, এক বৃদ্ধ চাষা ওতলাকে আশ্রয় দিল। সেখানে ওতলার গর্ভে এক সোনার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। সেই বৃদ্ধ চাষী মরিয়া গেল, পুত্র কোলে লইয়া অভাগিনী ওতলা আবার ঘরের বাহির হইল।

“উচ্চ ডালে থাকরে কোকিল! অনেক দূরে যাও,
তুমি নি দেইখাছ পাখি আমার পতির নাও।
জাল বাউ জালুয়া ভাইরে! ছাইবা তোল পানি,
তুমি নি দেইখাছ আমার পতির নৌকাখানি।”

কিন্তু কেউ তার পতির সন্ধান দিতে পারে না। বনের মধ্যে থাকে এক দুষ্ট লোক। সে আসিয়া ওতলাকে বলে?

তোমার পতি মইরা গেছে নবলক্ষের দেশে
পান-গুয়া খাও ওতলা আমার ঘরে এসে।

ওতলা উত্তর করে :

আমার যদি মরত পতি শব্দ যাইত দূর,
রাম-লক্ষণ দুই গাছ শখ ভেঙে হইত চুর।
ভীন দেশে আমার পতি যদি মারা যাইত,
সিস্তার সিন্দুর আমার মৈলাম হইত।

সেই দুষ্টু লোক তখন কোল হইতে ওতলার ছেলেটিকে ছিনাইয়া লইল। ওতলা কান্দে :

"এখনো শেখে নাই যাদু মা বোল বলার বোল,
এখনো সাধ মেটে নাইরে তারে দিয়া কোল।
ওরে ডাকাত। আমার যাদুমনিকে তুই ফিরাইয়া দে।"

দুষ্টু তখন বলে :

"ফিরাইয়া দিব যাদু যদি যৌবন কর দান,
ফিরাইয়া দিব যাদু যদি খাও গুয়া-পান।"

ওতলা বলে :

“নাইকা মাতা নাইকা পিতা নাইকা সোদ্দের ভাই,
সোঁতের শেহলা হয়া ভাসিয়া বেড়াই।
তুমি আমার পিতা। আমার যাদুরে ফিরাইয়া দাও।” তখন সেই দুষ্টু লোক কি করে?

ওতলার ছেলেকে শূন্যে উঠাইয়া বলে, “যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাইবে তোমার এই সন্তানকে আমি আছড়াইয়া মারিব।” শুনিয়া ওতলা শিহরিয়া ওঠে। এই ভাবে কাহিনী করুণ হইতে করুণতর হইয়া আগাইয়া যায়। রহিমদ্দী গান গাহিতে গাহিতে গামছা দিয়া ঘন ঘন চোখ মোছে। নিদারুণ সেই দুষ্টুলোক প্রথমে ছেলের একখানা হাত কাটিয়া ফেলিল। তবু ওতলা রাজি হইল না তার কথায়। তারপর আর একখানা হাত কাটিল। তবু ওতলা অটল। তখন সেই নিদারুণ দুষ্টলোক ওতলার ছেলেটিকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিল। পুত্র শোকে উন্মাদিনী ওতলা মাথার চুল ছেড়ে, বুক থাপড়ায়, মাটিতে মাথা ঘসে। হায়রে?

কারবা গাছের জালি কুমড়া কইরা ছিলাম চুরি,
সেই আমারে দিছে গালি পুত্র শোগী করি।
কোব্বা দেশে যায়া দেখব আমি সোনার যাদুর মুখ,
কোন্ দেশে যায়া জুড়াব আমার পোড়া বুক।

উন্মাদিনী পথে পথে কান্দিয়া বেড়ায়। যারে দেখে তারই পায়ে ধরিয়া কান্দে–তোরা দে–আমার বাছাধনকে আনিয়া দে। ওতলার কান্দনে ভাটীর নদী, সেও উজান ধায়। আল্লার আরশ কুরছি কাপিয়া কাপিয়া ওঠে। গানের সুরে সুরে ঢেউ দিয়া কাহিনী আগাইয়া যায়। রাত্র ভোর হইতেই রহিমদ্দী গান শেষ করে। চোখের পানি মুছিতে মুছিতে শ্রোতারা। যার

যার ঘরে ফিরিয়া যায়। গায়েন সাহেবের তারিফ করিয়া তাহারা এই ভাবের আবেগে এতটুকুও স্নান করিতে চায় না। রহিমদ্দীও বোঝে তাহাদের অন্তরে সে আজ নিজেকে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। এই ত গায়কের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!

মূর্খ রহিমদ্দী এই গ্রামে মাত্র একটি রাত কাটাইয়া নিজের কথকতায় ছেলে-বুড়ো যুবক-যুবতী গ্রামের সকলকেই মুগ্ধ করিয়া দিয়া গেল। সে যেখানে যায় সেইখানেই এইরূপ আনন্দের হাট মেলে। তার কাহিনীর ভিতর দিয়া এই দেশের সব চাইতে যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেই। একনিষ্ঠ প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া গেল। সেই প্রেমের মর্যাদা রাখিতে এ দেশের মেয়েরা। কত দুঃখের সাগরে স্নান করিয়াছে, কত বেহুলার কলার মন্দাস গংকিনী নদীর সেঁতে। ভাসিয়া, কত চিরিঙ্গার ঘাট কত নিতাই ধুপুনীর ঘাট পার হইয়াছে, যুগে যুগে এই প্রেম, দুঃখের অনলে পুড়িয়া নিজের স্বর্ণজ্যোতি আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। অস্ত্র তাহাকে ছেদন করিতে পারে নাই, অগ্নি তাহাকে দাহন করিতে পারে নাই। রহিমদ্দীর মত বাঙলার গ্রামগুলিতে এইরূপ কত গায়ক, কত কবি, কত কথক রহিয়াছে। তাহারা বাঙলার অবহেলিত জনগণের মধ্যে আনন্দ-রসে ভরিয়া এই আদর্শবাদ আর নীতির মহিমা প্রচার করিতেছে। হয়ত সেই জন্যই আজও দেশে পুণ্যাত্মাদের সমাদর। অসৎ দুজন ব্যক্তিকে লোকে হেয় চক্ষে দেখে। কিন্তু রহিমদ্দীনের মত গুণী ব্যক্তিদের সমাদর ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কে তাহাদের সভ্য সমাজে ডাকিয়া আনিয়া উচ্চ সম্মানের আসনে বসাইবে?

আজাহের রহিমদ্দীকে থাকিতে বলিতে পারে না। একজন অতিথিকে আরও একদিন থাকিতে বলা মানে তাদের আর একদিন আধপেটা খাওয়া। দিন কামাই করিয়া দিন খায়। রহিমদ্দী। একদিন তাঁতের কাজ বন্ধ থাকা মানে তারও আর একদিন না খাইয়া

থাকা। অনেক বলিয়া কহিয়া আবার আসিব বলিয়া রহিমদ্দী বড়ুর সরু বাহুবন্ধনখানি ছাড়ায়। আজাহেরের বউ বলে, “চাচাজান! এই শিশুর-ত্যালটুক নিয়া যান। কেদাইরার মরে দিবেন। হুনছি শিশুর-ত্যালে বাতের ব্যামো হারে। ও-পাড়ার মোকিমীর বাড়িত্যা কাইল সন্ধ্যায় আমাগো বাড়ির উনিরে দ্যা আনাইছি। আর এই ঢ্যাপের বীজগুলান নিয়া যান। চাচীজান যেন অদ্দেক রাহে আর অদ্দেক মোড়লের বউরে পাঠায়া দ্যায়। আরে তারে কইবেন, গরীব আমরা। গরে মিটাই থাকলি ঢ্যাপের বীজদ্যা খই বাইজা মওয়া বাইন্দা দিতাম। তানি যেন মোড়ল সাবরে মওয়া বাইন্দা খাওয়ায়।” রহিমদ্দী ঢ্যাপের পোটলা আর তেলের শিশি তার বোচকার মধ্যে বাঁধিতে বাঁধিতে বলে, “তোমরা সব পাগল ঐলা নাকি? এত জিনিস নেওয়া যায়?”

বউ বলে, আর এক কর্তা। মোড়ল বউরে কইবেন তার ছাইলার যহন বিয়া অবি আমারে যেন নাইয়ারে নেয়। কতকাল গিরামডারে দেহি না। একবার যাইবার ইচ্ছা করে।”

বিদায় লইয়া রহিমদ্দী পথে রওয়ানা হয়। আজাহের তাকে গ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসে। ফিরিবার সময় আজাহেরের মনে হয়, আজ যে গান গাহিয়া রহিমদ্দীন সকলের অন্তর জয় করিয়া গেল, এ যেন তাহাদের নিজেরই কীর্তি। সে যেন নিজেই গান গাহিয়া সকলকে মাতাইয়া দিয়াছে। রহিমদ্দী উপলক্ষ মাত্র। কারণ সেই ত তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। গর্বে আজাহেরের নাচিতে ইচ্ছা করে।

এক কোচ বেথুন

২৬.

ভরদুপুরে কোন্ জঙ্গল হইতে এক কোচ বেথুন, সজারুর কাঁটা আর লাল মাকাল ফল কুড়াইয়া আনিয়া বড় বলে, “মা! আমার জানি কেমুন করতাছে।”

মেয়ের গায়ে কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মা বলে, “ক্যারে নক্কী! কি ঐছে?”

বড়ু কয়, “মা! আমার যিনি বমি বমি করতাছে।”

মা বলে, “গরের মাইজায় সপ মেইলা দিলাম। তুই একটু শুইয়া থাক।”

মায়ের মেলান সপের উপর শুইয়া বড়ু মার গলা জড়াইয়া ধরে, “মা! তুই আমার কাছে বইস্যা থাক।”

মায় কয়, “আমার নক্কী! আমার সুনা! কত কাম পইড়া রইছে। তুমি শুইয়া থাহ। আমি যাই।”

মেয়ে বলে, “আইচ্ছা মা! তবে তুমি যাও।”

মা একাজ করে ওকাজ করে কিন্তু কোন কিছুতেই মন টেকে না। ঘরে আসিয়া দেখে, বড় বমি করিতেছে। মা আসিয়া মেয়েকে জড়াইয়া ধরে। মেয়ে বলে, “একটুখানি বমি

ঐছে মা। য়্যাক্কনি সাইর‍্যা যাবি। তুমি কাম কর গিয়া। মিঞাবাই ত আসপ্যানে পাঠশালা ঐতে। তার বাত রান্দ গিয়া।”

মা মেয়েকে আদর করিয়া বলে, “ওরে আমার মা জননীরে। আমার মায়ের কত বুদ্ধি ঐছে!”

মেয়ে আবার বমি করে। এমন সময় বাপ আসিল। মা ডাকে, “আমাগো বাড়ির উনি এদিকে আইস্যা দেহুক। আমার বড় যে বমি করতাছে।”

বাপের প্রাণ ছ্যাত করিয়া উঠিল। ওদিকের হিন্দু পাড়ায় কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাপ আসিয়া মেয়ের পাশে বসিল। “কি মা! তোমার কেমন লাগতাছে?”

মেয়ে বলে, “আমারে যিনি অস্থির কইরা ফেলত্যাছে।”

মায় বলে, “আমাগো বাড়ির উনি ও-পাড়ায় মোকিম মিঞারে ডাইকা নিয়া আসুক। ম্যায়ার বাতাস লাগছে। হে আইসা ঝাইড়া দিলি বাল অয়া যাব্যানে।”

আজাহের তাড়াতাড়ি মোকিম মিঞাকে ডাকিয়া আনে। আসিয়া দেখে, মেয়ে বমিই। করিতেছে না–পানির মত পায়খানাও করিতেছে। মোকিম মিঞা নাড়ী ধরিয়া বলিল, “মাইয়ার বাতাস লাগছে। আমি পানি পইড়া দিয়া যাই। বাল অয়া যাব্যানে।” কিন্তু মোকিম মিঞার পানি পড়া খাইয়া মেয়ের কোনই উপকার হইল না। আস্তে আস্তে মেয়ে যেন নেতাইয়া পড়িতেছে। গায়ের সোনার বর্ণ কালো হইয়া গিয়াছে। বউ বলে, “এহন কি করবা? কেমুন কইরা আমার বড়ুরে বাল করবা?”

আজাহের ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়িয়া একটি ঘট বাহির করিল। তাহা হইতে কতকগুলি সিকি, আনি, দুয়ানী বাহির করিয়া গামছায় বাঁধিল। বউকে বলিল, “তুমি উয়ারে লয়া বইস। আমি বন্দর ঐতে ডাক্তার লয়া আসি।”

বাড়ি হইতে বন্দর মাত্র দুই মাইল। এই পথ কি আজাহেরের শেষ হয়? চলিতে চলিতে তার হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। বন্দরে তিনজন ডাক্তার। তারিণী ডাক্তার, সেন মশায় আর কাজী সাব। তার মধ্যে কাজী সাহেবেরই নাম ডাক বেশী। কলিকাতা হইতে পাশ করিয়া আসিয়াছে। আজাহের কাজী সাহেবের ডাক্তারখানায় যাইয়া কান্দিয়া ফেলিল। কাজী সাহেব বসিয়া বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কি চাই?”

আজাহের বলিল, “আমার ম্যায়াডার ভেদবমি ঐত্যাছে, আপনি আইসা একবার দেইখ্যা যান।”

কাজী সাহেব বলিলেন, “ভেদবমী হচ্ছে। তবে ত এ কলেরা!”

আজাহেরের পরাণ ছ্যাত করিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিল, “হুজুর, আপনি চলেন।”

কাজী সাহেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “যেতে ত বলছ। ভিজিটের টাকা এনেছ?”

গামছার খোট হইতে সিকি, দুয়ানীগুলি কাজী সাহেবের টেবিলে রাখিয়া আজাহের বলিল, "আমার এহন জ্ঞান গিরাম নাই। এই আমার যা সম্বল আছে আপনারে দিলাম। আপনি দয়া কইরা চলেন।"

টেবিলের পয়সাগুলি গুণিয়া কাজী সাহেব বলিলেন, "মাত্র দুই টাকা চার আনা হ'ল মিঞা। আমার ভিজিট লাগে পাঁচ টাকা। আগে আর টাকা নিয়ে এসো, তখন যাব।"

আজাহের কাজী সাহেবের পা জড়াইয়া ধরে, "হুজুর! এই আমার আছে আপনি দয়া কইরা আমার ম্যায়াডারে দেইখ্যা আসেন। ম্যায়া সারলে আপনার টেহা আমি দিব।"

কাজী সাহেব পা ছাড়াইয়া লইয়া বলেন, "ও কথা কত জনই কয় কিন্তু অসুখ সেরে গেলে আর কারো পাত্তা পাওয়া যায় না। দেখ মিঞা! দয়ার কথা বলছ? একটা ডাক্তারী পাশ করতে কত টাকা খরচ করেছি জান? সেই টাকাটা ত উসুল করতে হবে। আমাকে দয়া দেখালে চলবে না।"

আজাহের বলে, "হুজুর! আমার ম্যায়াডারে দেইখ্যা আসেন। আল্লা আপনার দিগে চাইব। আমি রোজ নমাজ পইড়্যা আপনার জন্যি দোয়া করব।

কাজী সাহেব বলে, "আরে মিঞা! ওতে আমার মন ভেজে না। পঁচটাকা যদি দিতে পার, আমি যাব আর যদি না পার, আমার সময় নষ্ট করো না। দেখছ না আমি ডাক্তারী বই পড়ছি?"

আজাহের তবু হাল ছাড়ে না। "হুজুর! আপনার গরেও ত ছাওয়াল-ম্যায়া আছে। তাগো মুহির দিগে চায়া আমার ম্যায়াডারে দেইখ্যা আসেন। আল্লার আসমান নাইমা পড়বি আপনারে দোয়া করনের জন্যি। আমার কেবলই মনে ঐত্যাছে আপনি গেলি আমার। ম্যায়াডা বাল অবি।"

কাজী সাহেব এবার চটিয়া বলিলেন, "আরে মিঞা! ছেলে-পেলে তুলে কথা বল? যাও এখান থেকে। পাঁচটাকা না জোটে ওই সস্তা ডাক্তার আছে তারিণী ডাক্তার, সেন। মশায় তাদের ডেকে নাও গিয়া।"

ইহা বলিয়া কাজী সাহেব অন্দরে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া মরার মত উঠিয়া আজাহের তারিণী ডাক্তারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারিণী ডাক্তার সেই কবে ফরিদপুরের এক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী করিত। ঔষধ চুরি করিয়া চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়া দেশে আসিয়া ডাক্তারী আরম্ভ করিয়াছে। পাড়া গাঁয়ের লোক। কোন ডাক্তারের কত বিদ্যা কেহ জানে না। নানা ভেলভাল দিয়া যে লোক ঠকাইতে পারে তাহারই বেশী পশার।

তারিণী ডাক্তারকে আজাহের যাহা দিল তাহাতেই সে তাহার বাড়িতে যাইয়া রোগী দেখিতে রাজি হইল। কারণ এ তল্লাটে তাহাকে বড় কেউ ডাকে না।

ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আজাহের যখন গৃহে ফিরিল তখন মেয়ে আরও অস্থির। কেবল ঘন ঘন পানি খায় আর বমি করে। তারিণী ডাক্তার রোগীর নাড়ী ধরিয়া অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর রোগীর চোখের পাতা উল্টাইয়া, পেট টিপিয়া দেখিয়া

অতি গম্ভীর হইয়া বাহিরে আসিয়া ঘুঁটের ছাই হাতে মাখিয়া হাত ধুইল। আজাহের আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, "ডাক্তার বাবু! কেমুন দেখলেন?"

ডাক্তার জিজ্ঞেস মতন গম্ভীর হইয়া বলেন, "ঠিক সময়েই আমাকে ডেকেছ। ডাকতে যদি ওই কাজী ডাক্তারকে তবে কিছুই করতে পারত না। জান ত বিলনাইলার মাতবর কি নাম জানি? হ হ অছিরদ্দী মুন্সী, তার ছেলের নামটি যেন কি?"

আজাহের আবার বলে, "আমার ম্যায়াডা কেমুন দেখলেন ডাক্তারবাবু?"

দাঁড়াও কই আগে, অছিরদ্দী মুন্সীর ছেলের নাম–হু হু মনে পড়েছে গইজদ্দী–তার হ'ল কলেরা। বড় লোক ত। ডাকল ঐ কাজী ডাক্তারকে। এ সব অসুখের চিকিৎসা ওকি জানবে? সাতদিন চিকিৎসা করার পরেও রোগী চিৎপাত। তখন এ-পাড়ার বরান খা সেই তাদের যেয়ে বলল আমার কথা। আমি যেয়ে এক গুলিতেই রোগ সারিয়ে দিয়ে এলাম।"

আজাহের বলে, "আপনার গুণপনার কতা ত আমরা জানিই। আমার ম্যায়াডারে কেমুন দেখলেন?"

ডাক্তার বলে, "তোমার মেয়ের অবস্থাটা ভাল না, তবে কোন চিন্তা নাই। আমারে যখন ডেকেছ, এমন ঔষধ দেব তোমার মেয়েটা ভাল হয়ে যাবে। তবে একটা কথা, জল দিতে পারবে না। জল খাওয়ান বন্ধ করতে হবে।"

আজাহেরের বউ বলে, ডাক্তারবাবু! পানি না খাওয়ায়া উয়ারে কেমুন কইরা রাখপ?" ডাক্তার বলে, "মেয়ে যদি বাঁচাতে চাও তবে তা রাখতেই হবে।"

ঔষধ দেওয়ার জন্য বাড়িতে কোন পরিষ্কার শিশি নাই। পানি খাওয়ার একটি কাঁচের গ্লাস ছিল। তাহাতেই ডাক্তারবাবু কয়েক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, “চার বারের ঔষধ দিলাম। সারা রাত্রে চারবার আন্দাজ মত ঢেলে খাওয়াবে। কাল ভোরে। যেয়ে আমাকে খবর দিও! ভাল কথা, ঔষধের দাম ত দিলে না মিঞা?”

আজাহের বলে, “আমার যা ছিল সবই ত আপনারে দিছি ডাক্তার বাবু।”

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে, “মুড়ির ধান আছে নি তোমার বাড়িতে? কাল সকালে যখন। যাবে আমার জন্য তিন কাঠা মুড়ির ধান নিয়ে যেয়ো। ওকি! তোমার ওই পালানে কেমন সুন্দর এক কাঁদি মর্তমান কলা হয়েছে। ভাল কথা আজাহের! আমার মনেই ছিল না। একটা সুন্দর ঔষধের কথা মনে পড়েছে। তুমি ওই কলার কাদিটা কেটে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। ঔষধটা এখনই নিয়ে আসতে পারবে। আর শোন আজাহের এক বোঝা খড় নিয়ে চল। আমার গরুটার খাবার নেই।”

মর্তমান কলার কাঁদি আর এক বোঝা খড় লইয়া আজাহের তারিণী ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ডাক্তার চলিয়া গেল। মেয়ে বারবার পানি চায়, “মারে আর একটু পানি দাও।”

মা মেয়ের গায়ে মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, “মা! ডাক্তার যে তোমারে পানি দিতে বারণ কইর‍্যা গ্যাল।”

মেয়ে কয়, “মা! পানি না খাইলি আমি বাঁচপ না। একটু পানি দাও।” মায়ের ত মন। মা মেয়ের মুখে একটু পানি দেয়।

মেয়ে বলে, “মা! অতটুকু পানিতে ত আমার কইলজা ঠাণ্ডা অয় না। আমারে এক কলসী পানি দাও।”

গরীবুল্লা মাতবরের বউ আসিয়াছিল খবর পাইয়া। সে বলিল, “বউ! সজ বিজান পানি ওরে দ্যাও। তাতে তেষ্টা কমবানে!” মা তাড়াতাড়ি নেকড়ায় সজ বাধিয়া পানিতে ভেজায়। সেই নেকড়া মুখের কাছে ধরে। দুই এক ফোঁটা পানি মেয়ের মুখে পড়ে!

মেয়ে বলে, “মা! ও-পানি না, আমারে ইন্দারার পানি দাও। আমারে পুকুইরের পানি দাও। মা! পানি–পানি–পানি”

মোড়ল-বউ এর গলা জড়াইয়া মা কান্দে, “বুবুগো! এ তো সওন যায় না।”

নিজেরই চোখের পানি গড়াইয়া পড়ে বউকে প্রবোধ দিতে যাইয়া, “কি করবা বউ। সবুর কইরা থাক।”

বছির পাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসে। “ও বড় তোর জন্যি সোনালতা আনছি।”

বড় ডাকে, “মিঞা ভাই! তুমি আইস্যা আমার কাছে বইস।” বছির যাইয়া বোনের পাশে বসিয়া মাথার চুলগুলিতে হাত বুলায়। আবার বড় বলে, “মা! তোমার পায়ে পড়ি আমারে অনেকটুকু পানি দাও।”

মা কান্দিয়া বলে, “ডাক্তার যে তোরে পানি দিবার মানা করছে।” রাগ করিয়া ওঠে বড়ু। “ছাই ডাক্তার। ও কিছুই জানে না। মিঞা বাই! তুমি আইছ। মা আমারে পানি দ্যায় না। তুমি আমারে পানি দাও।”

বছির মার দিকে চাহিয়া বলে, “মা দেই?”

চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়া মা বলে, “দে।”

গেলাস লইয়া ধীরে ধীরে বছির বোনের মুখে পানি দেয়। পানি খাইয়া বড় যেন কিছুটা শান্ত হয়। ভাইয়ের হাতখানা কপালে ঘসিতে ঘসিতে বলে, “মিঞা বাই! দেহা ত কেন সোনালতা আনছাস।” বছির সোনালতা গাছি বোনের হাতে দেয়। হাতের উর সোনালতাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বোন বলে, “মিঞা বাই। আমি ত এহন খেলতি পারব। এই সোনালতাগুলি তুমি রাইখা দাও। কালকা বিয়ানে ফুলী আসপি। তারে দিও! হে সোনালতার বয়লা বানায়া পরবি, হাসলী বানায়া পরবি।”

ফুলীর মা বলে, “অ্যালো ম্যায়া! তুই রইলি অসুখে পইড়া, হে সোনালতা লয়া কার সঙ্গে খেলা করবি লো?”

আজাহের তারিণী ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিল! বাপকে দেখিয়া মেয়ে আবার কাঁদিয়া উঠিল, “ও বাজান! আমারে পানি দাও–পানি দাও।”

বাপ বলে, “মারে একটু সহ্য কইরা থাক। ডাক্তার তোরে পানি দিতি নিষেধ করছে।”

মেয়ে তবু কান্দে, “পানি–পানি–পানি, আমারে পানি দাও।

মা পানিতে ভেজানো সজের পোটলাটা মেয়ের মুখের কাছে ধরে।

মেয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, “অতটুকু পানিতে আমার হয় নারে মা। আমারে কলসী কলসী পানি দাও।” ডাক ছাড়িয়া মেয়ে বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতে চাহে। বাপ তাকে জোর করিয়া বিছানার সঙ্গে ধরিয়া রাখে। মা জোড়হাত করিয়া আল্লার কাছে দোয়া মাঙে–”আল্লা রছুল–পাক পরওয়ারদ্দেগার! আমার বড়ুরে বাল কইরা দাও।”

পাড়া-প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া সকলেই বড়কে দেখিতে আসিয়াছে। গরীবুল্লা মাতবরেও আসিয়াছে। হলদে পাখির মত ডুগে ভুগে মেয়েটি, যার বাড়িতে বেড়াইতে। যাইত, সেই কাছে ডাকিয়া আদর করিত; কিন্তু তারা যে সকলেই আজ নাচার! কেউ আসিয়া এমন কিছু বলিয়া যাইত যা করিলে মেয়েটির সকল যন্ত্রণা সারে, সে কাজ যতই কঠিন হউক, তারা তা করিত! নীরব দর্শকের মত তারা উঠানে বসিয়া চোখের পানি ফেলিতে থাকে। সারা রাত্র এই ভাবে পানি পানি করিয়া মেয়ে ছটফট করে।

“ও বাজান! তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে পানি দাও। আমাকে পানি দাও। পানির জন্যি আমার বুক ফাঁইট্যা গেল।”

আজাহের মেয়েকে পানি দেয় না। ডাক্তার বলিয়াছে, যদি মেয়েকে বাঁচাইতে চাও, তবে তার মুখে পানি দিও না। আজাহের নির্মম পাষাণের মত নিষ্ঠুর হইবে, তবু সে মেয়েকে বাঁচাইবে। পানি না দিলে সে বাঁচিবে। ডাক্তার বলিয়াছে, যে অনেক কিছু জানে, যার

বিদ্যা আছে। বহু ঠকিয়া আজাহের শিখিয়াছে বিদ্বান লোকে বেশী বোঝে। তার কথা। পালন করিলে মেয়ে বাঁচিবে।

বউ কাঁদিয়া আজাহেরের পায়ে আছড়াইয়া পড়ে, "তুমি কি পাষাণ ঐছ! দাও উয়ারে একটু পানি। যদি বাঁচনের অয় এমনি বাঁচপি।"

না! না! মেয়েকে তার বাঁচাতেই হইবে। মেয়ে না বাঁচিলে আজাহের পাগল হইবে– আজাহের গলায় দড়ি দিবে। তাই মেয়েকে তার বাঁচাইতেই হইবে। ডাক্তার বলিয়াছে– বিজ্ঞলোকে বলিয়াছে, পানি না দিলে মেয়ে বাঁচিবে।

বছির বলে, "বাজান; একটু পানি ওর মুহি দেই।"

আজাহের রাগ করিয়া উঠিয়া যায়। "তোগো যা মনে অয় কর। আমার আর সহ্য অয় ।" বাপ চলিয়া গেলে মা আবার সেই সজ ভিজানো একটুকু পানি মেয়ের মুখে দেয়। অনেকক্ষণ পরে পানি পাইয়া মেয়ে যেন একটু শান্ত হয়। মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "মারে! কারা যিনি আসত্যাছে। আমারে কয়, আমাগরে সঙ্গে খেলতি যাবি? আমি কই? আমিত খেলি মিঞা বাইর সঙ্গে, ফুলুর সঙ্গে। ওই যে–ওই যে তারা আসত্যাছে। কি সুন্দর ওগো দেখতি, ওই যে দেহ মা।"

মা বলে, "কই আমিত কেওইরে দেহি না।" মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মেয়ে বলে, "মা! তুই আমার আরো কাছে আয়। ওরা আমারে নিয়া যাবার চায়। তুই কাছে থাকলি। আমারে কেওই নিবার পারবি না।"

মা মেয়েকে আরও বুকের কাছে টানিয়া আনে।

মেয়ে মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া বলে, "আমার সোনা মা! আমার নক্কী মা! তুমি। গিলাসে কইরা এক গিলাস পানি আমারে দাও। পানি খাইলি আমি মরব না।"

মা আর একটু পানি মেয়ের মুখে দেয়।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আজাহের মাঠের ধারে বসিয়া কান্দে। বাড়িতে বসিয়া কান্দিলে বউ আরও আওলাইয়া যাইবে, অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আজাহের তারিণী ডাক্তারের বাড়িতে গেল। মুড়ির ধান আনে নাই দেখিয়া তারিণী ডাক্তার রাগিয়া খুন। "আরে মিঞা! মনে করছ বিনে জলে চিড়ে ভিজবে। তা হয় না।"

আজাহের বলে, "ডাক্তার বাবু! মেয়ের অবস্থা দেইখ্যা আমার কুনু জ্ঞান গিরাম নাই। আমি কাইলই আপনারে মুড়ির দান আইনা দিবানি। আইজ আবার চলেন আমার ম্যায়াডারে দেখপার জন্যি।" কলেরার রোগী টাকা পাইলেও তারিণী ডাক্তার যাইয়া দেখিতে ভয় পায়। ছোঁয়াছে রোগ। কখন কি হয় কে বলিবে।

বিজ্ঞের মত ডাক্তার বলে, "আর দেখতে হবে না। যা ঔষধ দিয়াছি তাই খাওয়াও গিয়ে। কিন্তু পানি খেতে দিও না। পানি দিলে মেয়েকে বাঁচাতে পারব না।"

আজাহের বলে, "ডাক্তার বাবু! ম্যায়া আমার পানি পানি কইরা এমুন ছটফট করে যে । মদ্দি মদ্দি পানি না দিয়া পারি না। জানেন ত বাপ-মায়ের প্রাণ!"

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলে, “পানি দিলে মেয়ে বাঁচাতে পারব না। তোমরা মুখ মানুষ। তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা করে ওই ত এক দায়। যা বলেছিলাম করলে তার উল্টো।”

আজাহের কাঁদিয়া বলে, “ম্যায়ার পানি পানি কান্দা যে সইবার পারিনা ডাক্তার বাবু।”

ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলে, “হা! হা! মনে পড়েছে–একটা ঔষধের কথা মনে পড়েছে। এই ঔষধটা নিয়ে যাও। খুব দামী ঔষধ। কেবল তোমাকে বলে দিলাম। এই ঔষধ খাওয়ালে মেয়ে ঘুমিয়ে যাবে। আর পানি পানি করে কাঁদবে না। মনে থাকে যেন আজ বিকেলে মুড়ীর ধান দিয়ে যাবে।”

আজাহের ঔষধ লইয়া বাড়ি ফিরিল। মেয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস লইতেছে আর দমে দমে জপনা করিতেছে, ‘পানি–পানি–পানি। আমারে পানি দাও।”

আজাহের মেয়ের কাছে আসিয়া ডাকিল, “মা!”

মেয়ে জবাব দিল না কেবলই দমে দমে বলিতেছে, “পানি–পানি–পানি।” বাপ যে পানি দেয় নাই, সেইজন্য বাপের উপর মেয়ের অভিমান।

বছির বোনের কানের কাছে মুখ লইয়া বলে, “বড়ু এই যে বাজান আইছে। তোরে ডাকতাছে।”

চোখ মেলিয়া বড় বলে, “ও বাজান! পানি দাও।”

আজাহের বলে, “মারে! এই ঔষুধটুকু খায়া ফালাও। তোমার গোম আসপ্যানে।” মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করে, “না বাজান! আমারে গোম পাড়াইও না। গুমাইলে আমি মইরা যাব।”

আজাহের বলে, “আমার নক্কি! আমার সুনা! ওষুধটুকু খায়া ফালাও।” মেয়ে কাঁদিয়া বলে, “না বাজান! আমারে ওষইধ দিও না–আমারে পানি দাও।” বাপ জোর করিয়া মেয়ের মুখের মধ্যে ঔষধটুকু ঢালিয়া দেয়।

মেয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। “হায় হায়রে আমারে কি খাওয়াইলরে!”

মেয়ের চীৎকারে বাপের বুক দুরু দুরু করিয়া কাপিয়া উঠিল। মেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর কি মনে করিয়া চোখ মেলিয়া এদিক ওদিক চাহিল। মা মেয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, “বড়ু! আমার বড়ু!”

মেয়ে কয়, “মা! তুমি ঘরের কেয়াড়ডা খুইলা দেও ত। ওই যে আসমান না? ওই আসমানের উপর আল্লা বইসা আছে। কে জানি আমারে কইল, তোরে ওইহানে নিয়া যাব।” মেয়ে মায়ের মুখখানা আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলে, “মারে! আমি যদি সত্যি সত্যিই মইরা যাই, তুই আমারে ছাইড়া কেমুন কইরা থাকপি?”

মা বলে, “বালাই! বালাই! তুমি বালা অয়া যাবা। এই ওষইদে তুমি সাইরা যাবা।”

মেয়ে কয়, “আচ্ছা মা! আমাগো কারিকর দাদা আর আসপি না আমাগো বাড়ি?”

“কেন আসপি ন্যা? দুই এক মাস পরেই আসপি।”

“মা! আরও তুই কাছে আয়। কানে কানে হোন। আমি যদি মরি, তয় পানির পিয়াসেই আমি মরব। মা! মিঞা বাইরে ডাক দাও ত?”

বছির বোনের কাছে আগাইয়া আসে। “মিঞা বাই! আমি যদি মইরা যাই, মার বড় কষ্ট অবি। মার চুলায় জাল দেওয়ার কেওই থাকপি ন্যা। মা উড়ুম বাজার সময় খোলা দরবার কাউরে পাবি না। এই হগল কাম তুমি আমার অয়া মার জন্যি কইর।”

মা বলে, “ষাট ষাট! এ সব কতা তুই কেন কস বড়? এ যে আমি সইবার পারি না।”

মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া মেয়ে বলে, “মা! চুরি কইরা একটু পানি তুমি আমার মুখে দাও।”

মা আজাহেরের মুখের দিকে চায়। আজাহেরের মুখ কঠিন পাষাণ। মন্ত্রের মত সে বারবার করিয়া আওড়াইতেছে, ডাক্তার বলিয়াছে, বিজ্ঞলোকে বলিয়াছে। পানি দিলে মেয়ে বাঁচিবে না। পানি না দিলে মেয়ে বাঁচিবে। বিজ্ঞলোকের কথা–বিদ্বান লোকের কথা। এ কোনদিন অনড় হইবার নয়।

মেয়ে গড়াইতে গড়াইতে পানির কলসীর কাছে যাইয়া হাত দিয়া কলস ধরে। “মা! এই কলসীর ত্যা পানি ডাইল্যা আমারে দাও।” বাপ সযত্নে মেয়েকে টানিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। আস্তে আস্তে মেয়ের ছটফটানি থামিয়া আসিতে লাগিল। আজাহের ভাবে

ঔষধে কাজ করিতেছে। এবার মেয়ে ভাল হইবে। বিদ্বান লোকের জয় হোক–জানা শুনা লোকের জয় হোক। খোদা! তুমি রহম কর। তুমি মুখ তুলিয়া চাও।

ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশ কাল করিয়া রাত্র আসিল। মেয়ের এ-পাশে বসিয়া আজাহের, ও-পাশে বউ আর বছির। বড় আর নড়েও না, চড়েও না। আর পানি পানি করিয়াও কান্দে না। তবে কি আল্লা মুখ তুলিয়া চাহিলেন? রুগ্ন মেয়ের শিয়রে বসিয়া মা ভাবে, সুন্দলের মত হাত পা নাড়িয়া মেয়ে মায়ের সঙ্গে উঠান ঝাট দিতেছে। অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি আসিতেছে। উঠানের ধান পাট এখনি ভিজিয়া যাইবে। মায়ের সঙ্গে মেয়েও নামিয়া গিয়াছে। উঠানের কাজে। মেয়ে ধামায় করিয়া ধান ভরিয়া দেয়। মা তাড়াতাড়ি লইয়া গিয়া ঘরের মেঝেয় ঢালিয়া দিয়া আসে। মায়ের মুড়ি ভাজা দেখিয়া মেয়ে তার ছোট হাঁড়ি লইয়া ইঁদুরের মাটি দিয়া মুড়ি ভাজার অনুকরণ করে। কতদিনের কথা, মনে হয় কালই যেন ঘটিয়াছে। আসমান ভরা মেঘ, রহিয়া রহিয়া বৃষ্টি নামিতেছে। মা ঘরের মেঝেয় কথা বিছাইয়া তাহার উপর নক্সা আঁকিতেছে। পাশে বসিয়া লাল নীল সূতো লইয়া মেয়ে তার পুতুলের জন্য ন্যাকড়ার উপর ফুল তুলিতেছে।

“মারে! এই ফুলডা যেমুন বাল ঐল না! তুমি একটু দেহায়া দ্যাও ত।”

মেয়ের হাত হইতে উঁচ সূতা লইয়া মা মেয়েরই হাসি খুশী মুখের অনুকরণে আরেকটি ফুল ন্যাকড়ার উপর বুনট করিয়া দেয়। খুশীতে মেয়ে ডুগু ডুগু হয়। ছবির পরে ছবি– আরও কত ছবি। ও-পাড়া হইতে লাল নটে শাক দুই মুঠে ভরিয়া মেয়ে বাড়ি আসিতেছে। ও-বাড়ির মোড়লের বৌ ডাকিয়া বলিল, “ওমা! কার লাল নইটা ক্ষ্যাত ঐতে এই সুন্দর পরী উইঠ্যা আইল!” কিন্তু মেয়ে কতক্ষণ ঘুমায়? রাইত যেন কত ঐল?

মেয়ের নাকের কাছে মা হাত লইয়া দেখে। না, বালাই! বালাই! এই যে মেয়ে নিশ্বাস লইতেছে।

ঘরের চালে প্রভাত কালের শুয়া পাখি ডাকিয়া গেল। চারিদিকে ঘোর কুষ্টি অন্ধকার। বনের পথে আজ জোনাকি কেন? এ যেন দুনিয়ার সকল জোনাকি সাজিয়া আসিয়াছে। রহিয়া রহিয়া ভুতুম ডাকিয়া ওঠে। দুনিয়ায় যত ঝিঁঝিপোকা আজ একসঙ্গে কাঁদিতেছে। মায়ের বুক যেন তারা কাটিয়া চৌচির করিয়া দিয়া যায়। রাত তুই ভোর হইয়া যা। কুব কুব কুব। কি একটা পাখি রহিয়া রহিয়া ডাকে। এ পাখি ত রোজই রাত্রে ডাকে। তবে আজ এই পাখির ডাকে মায়ের পরাণ এমন করে কেন? রাত তুই পোহাইয়া যা। মেয়ের হাতে পায়ে হাত দিয়া মা দেখে। হাত যেন টাল টাল মনে হইতেছে। পা ও যেন টাল টাল।

স্বামীকে বলে, "উনি একটু দেখুক ত, ম্যায়ার যেন আত পাও ঠাণ্ডা লাগত্যাছে।"

বসিয়া বসিয়া আজাহের ঝিমাইতেছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মেয়ের পায়ে হাত দেয়, হাতে হাত রাখে। তাই ত মেয়ের হাত পা যে ঠাণ্ডা হিমের মত। নাকে হাত দিয়া দেখে, এখনও নিশ্বাস বহিতেছে।

"তুমি যাও আগুন কইর‍্যা আন! উয়ার আতে পায় স্যাক দিতি অবি।" তবে কি মা যা ভাবিয়াছিল তাই?

"সোনার বড়রে! একবার আখি মেইলা চাও।" মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। বাপ আগুন করিয়া লইয়া আসে। মায়ের কান্না থামে না। মা জানে এমনি হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া তার দাদী মরিয়াছিল।

আজাহের বলে, "এ্যাহন না কাইন্দা উয়ার আত পায় স্যাক দ্যাও।"

কি দিয়া স্যাক দিবে? গরীবের ঘরে কি ন্যাকড়া আছে? রহিমদ্দী যে লাল শাড়ীখানা কাল মেয়েকে দিয়া গিয়াছিল, তাই আগুনের উপর গরম করিয়া মা আর বাপ দুইজনে মেয়ের হাতে পায়ে সেঁক দেয়। আল্লা রসুল, তুমি রহম কররহমানের রহীম! তুমি দয়া কর।

মায়ের কান্দনে সমস্ত পাড়া জাগিয়া ওঠে। গরীবুল্লা মাতবর উঠানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "বড়ু এহন কেমন আছে?"

আজাহের আসিয়া মাতবরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিয়া ফেলে, "তারিণী ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ায়া ম্যায়াডারে মাইর‌্যা ফ্যালাইলাম, বৈকাল ব্যালা যায়া কইলাম, 'ডাক্তার বাবু, ম্যায়া যে পানি পানি কইর‌্যা কেবলি কান্দে। তার কান্দন যে সওয়া যায় না। ডাক্তার

তহন একটা ওষুধ দিল আর কইল এই ওষুধ খাওয়াইলি ম্যায়া গুমায়া পড়বি। আর পানি। পানি কইরা কানবি না। হেই ওষইদ আইনা খাওয়াইলাম। এহন ম্যায়া নড়েও না, কতাও কয় না। আত পা ঠাণ্ডা অয়া গ্যাছে। হায় হায়রে! আমার সোনার বড়ুরে আমি নিজ আতে মারলাম।"

আজাহের কান্দে আর উঠানে মাথা কোটে। মোড়ল ঘরে ঢুকিয়া বড়র গায়ে মুখে হাত দিল। এখনও রোগী তিরতির করিয়া দম লইতেছে। বাহিরে আসিয়া মোড়ল বলিল "আজাহের! তুমি উয়ার কাছে বইস। আমি কাজী ডাক্তাররে লয়া আসি।"

আজাহের কয়, "তারে যে আনবেন, টাহা দিবানি ক্যামন কইরা?"

মোড়ল উত্তর করে, "আরে মিঞা হে কতায় তোমার কাম কি? তোমার বাবির গায়ে ত কয়খান জেওর আছে।" এই বলিয়া মোড়ল বাহির হইয়া গেল।

মা আর বাপ দুইজনে বসিয়া মেয়েকে সেঁক দেয় কিন্তু ঠাণ্ডা হাত আগুনের সেঁকে গরম হয় না। কান্দিয়া কান্দিয়া ডাকে, "সোনার বড়রে! একবার মুখ তুইল্যা চা। যত পানি তুই চাস তোরে দিবানি।" ঝিনুকে করিয়া মা মেয়ের মুখে পানি দেয় কিন্তু কার পানি কে খায়! দুই ঠোঁট বহিয়া পানি গড়াইয়া পড়ে। ডানধারের তেঁতুল গাছে হুতুম আসিয়া ডাকে। একটা। কি পাখিকে যেন অপর একটি পাখি আসিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। পাখিটির ডাকে আল্লার। দুনিয়া ফাটিয়া যায়। ওধারের পালানে আজ এত জোনাকি আসিয়াছে কোথা হইতে! এধার হইতে ঘুরিয়া তারা ওধারে যায়। ওধার হইতে ঘুরিয়া এধারে আসে। ঝি ঝি পোকার ডাকে নিশুতি রাতে নীরবতা কাটিয়া কাটিয়া গুঁড়ো হইয়া যায়। রাত তুই পোহাইয়া যা, দুঃখের রাত তুই শেষ হইয়া যা। মায়ের কান্না শুনিয়া বছির ঘুম হইতে জাগিয়া বোনের কাছে আসিয়া বসে।

গরীবুল্লা মাতবর কাজী ডাক্তারকে লইয়া আসে। ডাক্তারের আগমন মায়ের মনে। আবার আশার সঞ্চার হয়। ডাক্তার রোগী দেখিয়া গম্ভীর হইয়া উঠানে যাইয়া ভিজিটের টাকার

জন্য অপেক্ষা করে। আজাহের আনুপূর্বিক সকল ঘটনা ডাক্তারকে বলে। ডাক্তার উত্তর করে, “মিঞা! পয়সা খরচ করে ডাক্তারী শিখেছি। ওই তারিণী ডাক্তার ছিল ফরিদপুরের বুড়ো শ্রীধর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। তখনকার দিনে ডাক্তারদের ভুল ধারণা ছিল কলেরার রোগীকে পানি খাওয়ালে রোগীর খারাপ হয়। তাই তখনকার ডাক্তাররা। রোগীকে পানি দিত না। কিন্তু এখনকার ডাক্তারেরা গবেষণা করে বের করেছে, কলেরার। রোগীকে পানি দিলে তার ভালই হয়। পানি না দিয়েই মেয়েটাকে মেরে ফেলল।”

আজাহের বলে, “ডাক্তারসাব! কেমুন দেকলেন। আমার বড় বাল অবি ত?”

এমন সময় ঘরের মধ্য হইতে বউ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, “আমার বড়র যে। নিশ্বাস বন্দ হয়া গ্যাছে।”

আজাহের ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরে, “ডাক্তারসাব। আর একটু দ্যাহেন।”

ডাক্তার বলে, “আর দেখে কি করব। সব শেষ।”

“ওরে বড়ুরে আমার!”–কাঁদিয়া আজাহের গড়াগড়ি যায়। কাঁদিয়া বউ আকাশ-পাতাল ফাটায়। “আমার বড়! ওরে আমার বড়! একবার শুধু সোনা মুহি মা বোল বইলা ডাক। আরে আমি কোথায় যায়া জুড়াবরে–আরে আমি কোথায় যায়া মার দেহা পাবরে।”

উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক্তার গরীবুল্লাকে বলে, “মিঞা! আমার ভিজিটের টাকাটা দাও। রাত করে এসেছি। কুড়ি টাকা লাগবে।”

গরীবুল্লা বলে, "ডাক্তারসাব! আপনি ত ওষুধ দিলেন না? গরীবের টাহাটা ছাইড়া দেওয়া যায় না?"

ডাক্তার উত্তর করে, "সেই জন্যই ত বলেছিলাম, ভিজিটের টাকাটা আগে দাও। রাত করে এসেছি। বুঝতে পারলে ত মিঞা? রোগী মরেছে বলে কি আমার ভিজিটের টাকাটাও মরেছে নাকি?"

গরীবুল্লা বলে, "আর কইতি অবি না ডাক্তারসাব। সবই আমাগো বরাত। যোমেই যহন ছাড়ল না, তয় আপনি ছাড়বেন ক্যান?"

আজাহের ধূলা হইতে উঠিয়া বলে, "মোড়ল বাই! আমার আতালের গরুডারে নিয়া যান। ওইডা বেইচা ডাক্তাররে দ্যান। আমার মার দেনা আমি রাহুম না।"

গরীবুল্লা বলে, "আরে থাম মিঞা! আসেন ডাক্তারসাব! আমার বাড়ির ত্যা আপনার টাহা দিয়া দিবানি!" ডাক্তার চলিয়া যায়।

রাত তুই যারে যা পোষাইয়া। রাইত পোষাইয়া যায় কিন্তু শোকের রজনী শেষ হয় না। মৎস্যে গহীন গম্ভীর চেনে, পক্ষি চেনে ডাল, মায় জানে বেটার দরদ যার কলিজায় শেল। রাত প্রভাত হইলে মা কার বাড়িতে যাইবে, ওমন মধুর মা বোল বলিয়া কে তাকে ডাকিবে, মা কারে কোলে লইয়া জুড়াইবে। রাইত তুই যারে পোষাইয়া।

কাউকে ডাক দিতে হইল না। মায়ের কান্না, বাপের কান্না, ভাইয়ের কান্না বাতাসে ঘুরিয়া আল্লার আরশে উঠে। সেই কান্না ডাক দিয়া আনে গ্রামের সকল লোককে। আনন্দ ওদের জীবনে নাই। শুধু অভাব আর দুঃখ। তাই দুঃখের ডাক ওরা অবহেলা করে না। অপরের কান্দনে নিজের কান্দন মিশাইয়া দিতে সুখ পায়। ওদের সব চাইতে মধুর গান তা-ই সব চাইতে দুঃখের গান।

বাড়ির পালানে কদম গাছটির তলায় বড় যেখানে সঙ্গী-সাথীদের লইয়া খেলিত সেইখানে কবর খোঁড়া হইল।

তাম্বুলখানার হাট হইতে আতর লইয়া আস–লোবান লইয়া আস। জলদি কইরা যায় মোল্লারে খবর দাও। কাফন কেনার টাকা কোথায় পাব। কারিকর দাদা যে শাড়ীখানা দিয়া গেছে তাই চিরিয়া কাফন করিয়া দাও। গরীবের মেয়ে আল্লা সবই জানেন। সাত তবক আসমানের উপর বসিয়া এই দুস্কের কাহিনী দেখিতেছেন।

কে মেয়েকে গোছল দিবে? মোড়লের বউ। অমনি পাঁচটি মেয়েকে গোছল দিয়া যে গোরের কাফন সাজাইয়া দিয়াছে তারেই ডাক দাও। মেয়ের গায়ের বন্নক এখনো কাঁচা হলুদের মত ডুগ ডুগ করে। গায়ে পানি ঢালিতে পানি পিছলায়া পড়ে। মুখখানা যেন। হাসী-খুশীতে ভরা। রোগের যন্ত্রণা নাই, পানির পিয়াসা নাই! তাই মরিয়া ও আরও সুন্দর হইয়াছে। এমনই বুঝি সুন্দর হয় যারা না খায়া মরে, যারা দুঃখের তাড়নায় মরে। মরিয়া তাহারা শান্তি পায়।

গোছল হইল, কাফন পরানো হইল, মাথায় শাড়ী দিয়া তৈরী রঙিন টুপি, গায়ে রঙিন। শাড়ী! আতর লাগাইয়া দাও–লোবান জ্বালাইয়া দাও। “বুবুলো বুবু! তোমরা চায়া চায়া দেহ নায়া-ধুইয়া আমার বড়ু শ্বশুর বাড়ি যাইত্যাছে!” গাঁয়ের মোল্লার কণ্ঠে কোরানের সুর কান্দিয়া কান্দিয়া ওঠে।

সকলে ধরাধরি করিয়া মেয়েকে বাঁশের মাচার উপরে শোয়াইয়া দেয়। তারপর সেই মাচার চার কোণার চার উঁটি ধরিয়া লইয়া যায় কবরের পাশে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। কবরের পাশে আনিয়া লাশ নামায়। লোবানের সরায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোবানের ধূয়া ওড়ে। কাফনের কাপড় দোলাইয়া বাতাস আতরের গন্ধ ছড়ায়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ–লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

সকলে কাতারবন্দী হও–জানাজা পড়া আরম্ভ হইবে। আল্লা এই বেহেস্তের শিশুকে তুমি দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলা, আবার তুমি তাহাকে তোমার কাছে লইয়া গেলা। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্।

আল্লা-হুঁম্মাজ আ’হা লানা ফারাতাও ওয়াজ আ’লহা লানা আজরাওঁ ওয়ায়ুখরাওঁ .. ওয়াজ আল্হা লানা শাফেয়া’তাও ওয়া মুশাফফায়াহ!

আল্লাহ! এর যদি কোন গুনাখাতা হইয়া থাকে তবে তারে তুমি মাফ কইর। লা-ইলাহা। ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। পড় মিঞারা রসুলের কলেমা পড়। ভাল করিয়া ধর।

গোরের ভিতরে লাশ নামাইয়া দাও। প্রথমে কে দিবে মাটি? আজাহের কই? হাতের। একমুঠি মাটি লইয়া কবরে ফেলিয়া দাও।

“মিঞারা! তোমরাও আমারে এই কবরের মধ্যে মাটি দিয়া থুইয়া যাও। আমার সোনার বড়ুরে এহানে থুইয়া শূন্য গরে আমি কেমুন কইরা যাব?” বছির কই, বোনের কবরে একমুঠি মাটি দাও–তারপর গরীবুল্লা মাতবর, তারপর মোকিম। একে একে সকলেই আসে। এবার ভাল মত মাটি চাপা দাও। উপরে সরষে বীজ নিয়া দাও। রাতে শেয়ালে যাহাতে খুঁড়িয়া মুর্দা না বাহির করে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। ভেস্তের ধরিয়া পায়া কান্দে ফাতেমায়, বেটার দারুণ লোগ হায়রে সহন না যায়। শূন্য পৃষ্ঠে দুলদুল ফিরিয়া আসিল, সাহের বানুর পুত্র শোগে আসমান ভাঙিল। আয়রে নিমাই আয়রে। কোলে, একবার বুক জুড়া বাছা মা বোল বলিয়ে। কান্দে শচীমাতা ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া। রসুলের মদিনা ভাইঙ্গা যায়। ফতেমার কান্দনে ভাসে সোনার বৃন্দাবন।

.

২৭.

তবুও আজাহেরকে আবার মাঠে যাইতে হয়। আবার মাঠে যাইয়া হাল বাহিতে হয়। মাঠের কাজে একদিন কামাই দিলে সামনের বছর না খাইয়া থাকিতে হইবে। বাইনের সময় বাইন করিতে হইবে। নিড়ানের সময় খেত নিড়াইয়া দিতে হইবে। একদিনও এদিক ওদিক। করিলে ফসল ভাল হইবে না। মাঠের কাজে অবহেলা চলে না।

বউকে আবার কেঁকিতে উঠিয়া ধান ভানিতে হয়। কিন্তু পা যে চলে না। কে তার ধান। আলাইয়া দিবে। কে ছোট্ট কলাটি লইয়া মায়ের সঙ্গে ধান ঝাড়িবার অনুকরণ করিবে? ধান পারাইতে পারাইতে কাড়াইল দিয়া খোঁচাইতে খোঁচাইয়া মা নোটের ধান নাড়িয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে কাজ আগায় না। বছির তার পড়ার বই ফেলিয়া আসিয়া বলে, "মা! আমি তোমার বারা আলায়া দেই।"

মা বলে, "না বাজান! তুমি পড় গিয়া।" দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চইলা যায়। শুকনা ডালের পরে বইসা ডাকে কাগ। ভাজন বেটা মইরা গেলে মার কলিজায় দাগা। বছর শেষ হইয়া আম্ব গাছে আবার আম্ব ফল ধরে–জাম্বগাছ কালো করিয়া জাম্বফল পাকে কিন্তু পন্থের দিকে মা চায়া থাকে। তার বড় ত ফিরিয়া আসে না। নানা কাজের মধ্যে সারাদিন মা ডুবিয়া থাকে। কিন্তু রাত যে তাহার কাটে না। রাতের অন্ধকারের পরদায় মায়ের সকল কাহিনী কে যেন জীবন্ত করিয়া আঁকিয়া তুলে।

মা যেন স্বপন দেখে : "মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। সাজিয়া-গুঁজিয়া ভিন দেশ হইতে বর আসিয়া মেয়েকে লইয়া গেল। ময়নার মায়ে কান্দন করে গাছের পাতা ঝরে, আমি আগে যদি জানতামরে ময়না তোরে নিবে পরে, আমি নোটের বারা নোটে রাইখা তোরে লইতাম কোলে। কতদনি মেয়ে আসে না। মার জন্য তার যেন মন কেমন করিতেছে। গাঙে নতুন পানি আসিয়াছে। ওগো তুমি যাও–নৌকার উপর কঞ্চি বাঁকাইয়া তার উপর হোগলা বিছাইয়া ছই বানাও। আমার বড়ুরে লইয়া আইস। বড় আসপি! আইজ আমার বড় আসপি। কত পিঠা তৈরী করে মা! যে পিঠা মেয়ে পছন্দ করিত মনের মত করিয়া

সেই পিঠা মা বানায়। নতুন করিয়া সিকা বুনায়। কাঁথার উপরে রঙিন সূতা ধরিয়া ধরিয়া নক্সা আঁকে, আমার বড়ুরে বেবার দিব।”

দিন যেন শেষ হইতেছে! মায়ের আর ধৈর্য মানে না। সন্ধ্যাবেলায় পানি আনিবার অজুহাতে গাঙের ঘাটে যাইয়া মা মেয়ের জন্য অপেক্ষা করে। লাল নীল পাল উড়াইয়া কত নৌকা যায় কত নৌকা আসে। আমার বড়ুরে লইয়া ত আমাগো নাও আসিল না। ওই যে দেখা যায় হোগলা ঘেরা ছই। শাড়ী কাপড় দিয়া ছই-এর আগা পিছা ঢাকা। ওই আমার বড় আসত্যাছে। হয়ত ছই-এর কাপড় উদলা করিয়া বাপ-ভাইর দ্যাশ দেখত্যাছে। এই ত নাও ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। আমার বড় বাইর ঐল না কেন? মেয়ের বুঝি অভিমান ঐছে। মায় যায় তারে ড্যানা দইরা আনবি। তবে ত মেয়ে নামবি। মা তাড়াতাড়ি যাইয়া ছই-এর কাপড় খুলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। একি আমার বড় যে কাফন পইরা শুইয়া আছে। ও বড়ুরে–আমার বড়ুরে! কোন দ্যাশে যায়া আমি এ বুক জুড়াব। মায়ের কান্দনে পাড়ার লোকেরা জাগিয়া ওঠে।

একে অপরকে বলে, ওই দুখিনী মা কানত্যাছে। ও-পাড়ার মহিমের মা উঠিয়া মহিমের কবরের উপর যাইয়া আছড়াইয়া পড়ে। পাড়ার জানকীর মা তার জানকীর জন্য শ্মশান-ঘাটে যাইয়া ডাক ছাড়িয়া কান্দিয়া ওঠে। রাইত তুই যারে যা পোষাইয়া। শোকের রাত তুই পোষাইয়া যা। রাত পোষাইয়া যা। শোকের রাত পোষায় না। সে যে কবে পোষাইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

.

বছিরও পাঠশালায় যায়। ছুটির পরে গণশা বলে, “ক্যানরে বছির! তোর মুকটা য়্যাত ব্যাজার কিসিরে?”

বছির বলে, “আমার একটা মাত্তর বইন ছিল। কাইল মারা গ্যাছে।”

গণশা কিছুই বলিবার ভাষা পায় না।

বছির বলে, “আমার বইন পানি পানি কইরা মরছে। হাতুইড়া ডাক্তার তারে পানি খাইবার দেয় নাই। সেই জন্য মরছে। দেখ গণশা! আমি পইড়া-শুইনা ডাক্তার অব–খুব বড় ডাক্তার অব।”

গণশা বলে, “হে তো অনেক পাশ দিতি অবি। আর খরচও অনেক। তুই কেমুন কইরা পারবি?”

বছির উত্তর করে, “যেমনি ওক, আমি ডাক্তার অবই, এহন ত্যা তুই আমারে পড়াবি। আমার কেলাসের যা পড়া তুই আমারে শিহায়া দিবি।”

গণশা বলে, “ধ্যেৎ! আমি কি মাষ্টারী করবরে। আমি নিজেই কিছু জানি না।”

বছির অনুরোধের সুরে বলে, “দেখ গণশা! তুই আমারে না বলিস না। আমার যা বই। তুই তা আমারে পড়াইত পারবি।”

দুই বন্ধুতে ঠিক হইল পাঠশালার ছুটির পর গহন জঙ্গলের মধ্যে গণশার সেই গোপন জায়গায় যাইয়া তাহারা লেখাপড়া করিবে।

বাড়িতে মা কান্দে, বাপ কান্দে। তারা শুধুই কান্দে আর কিছু করে না। বোনের জন্য বছিরও কান্দে কিন্তু সেই কান্দন বুকে করিয়া সে এমন কিছু করিবে যার জন্য তার হতভাগিনী বোনের মত হাতুড়ে ডাক্তারের কবলে আর কেউ অকালে জীবন দিবে না। সে ডাক্তার হইবে–সব চাইতে বড় ডাক্তার–যে ডাক্তার চীনা জোঁকের মত গরীব রোগীদের চুষিয়া খাইবে না–যে ডাক্তার হইবে গরীবের বন্ধু–আর্তের আত্মীয়, কিন্তু কেমুন করিয়া সে ডাক্তার হইবে। সামনে সীমাহীন সুদীর্ঘ পথ! কেমন করিয়া সেখানে যাইবে তা সে জানে না। তবু সে সেখানে যাইবে। বর্ণ পরিচয়ের বইখানা সামনে লইয়া বছির বসে। এই তার সাধনার স্থান। অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলে, “তোমরা আমার সঙ্গে কথা কও–তোমরা আমার পরিচিত হও।”

গণশার সাহায্যে বর্ণগুলির নাম সে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু হরফগুলিকে চিনিতে পারিতেছে না। ক, খ, গ, ঘ, ঙ। একটার সঙ্গে আর একটা ওলট-পালট হইয়া যায়। পাঠশালার খাড়া পাতাগুলির অক্ষরের সঙ্গে বই-এর অক্ষরগুলি মিলাইয়া দেখে। খাড়া পাতার উপর কলম লইয়া হাত ঘুরায়। ঘরের মেঝেয় কয়লা দিয়া অক্ষরগুলি লিখিতে চেষ্টা করে। হাত কাপিয়া যায়। তবু সে লেখে। কচি হাতের অক্ষর আঁকিয়া বাকিয়া যায়। লিখিয়া লিখিয়া সে ঘরের মেঝে ভরিয়া ফেলে। শেষ রাত্রে মা যখন কান্দিতে বসে সে তখন কেরোসিনের কুপীটি জ্বালাইয়া বই সামনে লইয়া বসে। মায়ের মত বাপের মত তার কান্নাকে সে বৃথা যাইতে দিবে না। গল্পে সে শুনিয়াছে, এই দেশের কোন বাদশার স্ত্রী মারা যায়। বাদশা তার জন্য শুধু বসিয়া বসিয়াই কাদিল না। বাদশাজাদীর কবরের উপর এক সুন্দর ইমারত গড়িতে মনস্থ করিল। দেশ-বিদেশ হইতে শিল্পীরা আসিল। নানা দেশের নানা রঙের পাথর আনিয়া জড় করা হইল। কত মণি-মুক্তা, লাল, ইয়াকুত-

জবরুত কাটিয়া নক্সা করিয়া সেই সব রঙ-বেরঙের পাথরের উপর বসাইয়া আরম্ভ হইল সৃষ্টিকার্য। মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন দুনিয়ার লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া দেখিল, মাটির ধূলার উপরে শুভ্র-সমুজ্জ্বল সে তাজমহল। তেমনি তাজমহল সে গড়িবে। তার বোনের মৃত্যুকে সে বৃথা যাইতে দিবে না! ওই মাটির তলে ওই কদম গাছটার নীচে তার বোন বড় কবরের আবরণ ভেদ করিয়া প্রতি মুহূর্তে যেন তাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "মিঞা বাই! তোমার কাছেই আমি নালিশ রাখিয়া গেলাম। অমনি হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে প্রতিদিন আমারই মত শত শত জীবন নষ্ট হইতেছে! আমার মরণে সেই নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হয়।

বোনের কবর ছুঁইয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যেমন করিয়াই হোক সে ডাক্তার হইবে। সেই তাজমহলের নির্মাতার মতই নানা দেশ হইতে নানা লোকের বিদ্যা সে সংগ্রহ করিবে। নানা লোকের সাহায্য লইবে। তারপর তিলে তিলে পলে পলে গড়িয়া যাইবে জীবনের তাজমহল।

পাঠশালা হইতে এখন আর বছির সকাল সকাল ফেরে না। গণশাকে লইয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া পড়াশুনা করে। বাড়ি আসিয়া সামান্য কিছু খাইয়া আবার বই লইয়া বসে। সকাল বেলা ফুলী আসে। "বছির বাই! চল, ওই জঙ্গলের মদ্দি একটা গাছে কি মাকাল ফল ঐছে! আমি পাড়বার পারি না। তুমি পাইড়া দিয়্যানে।"

কিন্তু মাকাল ফল পাড়িয়া আনিয়া এখন সে কাকে দেখাইবে? কে তাকে ডানা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে সে জঙ্গলের ভিতর। আর কি বছিরের সেই জঙ্গলে গেলে মন টেকে? বনের যে প্রতিটি গাছের তলায়, প্রতিটি ঝোঁপের আড়ালে তার বোন বড়র চিহ্ন

লাগিয়া আছে। এখানটিতে খেলাইছিলাম ভাড়কাটি সঙ্গে নিয়া, এখানটি রুধে দে ভাই ময়না কাঁটা পুইতা দিয়া। সে পথ যে চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বছির প্রকাশ্যে বলে, "নারে ফুলী! আমি এহন যাইতি পারব না। আমার কত পড়বার আছে।"

ফুলী অভিমানে গাল ফুলাইয়া চলিয়া যায়। বছির ডাক দেয়, "ও ফুলী! হুইনা যা। যেদিন সোনালতা আনছিলাম বড়ুর জন্যি সেই দিনই তার ভেদবমি ঐল। আমারে ডাইকা কইল, আমি ত এ গুলান লয়া খেলতি পারব না। কাইল ফুলী আইলে তারে দিও। হে গুলান দিয়া যেন আতের বয়লা গড়ায়া আতে পরে, গলার হার বানায়া গলায় পরে। এ কয়দিনের গণ্ডগোলে ইয়া তোরে দিবার পারি নাই। লতাগুলান শুকাইয়া গ্যাছে।"

বছিরের হাত হইতে লতাগুলি লইতে লইতে ফুলী বলে, "বছির বাই! এই লতার গয়না গড়ায়া আমি কারে লয়া খেলব; কারে দেহাব?" বলিতে বলিতে দুইজনেই কান্দিয়া ফেলে।

দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চলিয়া যায়। উড়িয়া যায় হংস পক্ষী পড়িয়া রয় ছায়া। দেশের মানুষ দেশে যায়, পড়িয়া থাকে মায়া। বড় ঘর বান্ধ্যাছাও মোনাভাই বড় করছাও আশ, রজনী পরভাতের কালে পক্ষী ছাড়ে বাসা। দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চইলা যায়।

আমগাছ ভরসা করি কোকিল বানায় বাসা। নলের আগায় নলের ফুলটি তাহার পরে টিয়া, এমন সোনার বোনরে কে যে গেল নিয়া। দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চইলা যায়।

পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া বছির ফরিদপুরে চলিয়াছে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে। প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে সে। ছেলেকে বিদায় দিতে আজ আবার নূতন করিয়া মায়ের মনে মেয়ের শোক জাগে। কিন্তু মা কান্দিতে পারে না। বিদায় কালে চোখের পানি ফেলিলে ছেলের অমঙ্গল হইবে।

সমস্ত বান্ধা-ছান্দা শেষ হইয়াছে। এখনি রওয়ানা দিতে হইবে। ফুলী আসিয়া বলে, "বছির বাই! একটু দেইখ্যা যাও।" বছিরের ডানা ধরিয়া ফুলী টানিয়াই লইয়া যায়। বড়ুর কবরের ওই পাশে একটা বননা কুলের গাছ। সেই গাছের উপর শোভা পাইতেছে গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালতা।

বছির বিস্ময়ে বলে, "এহানে এমুন সোনালতা ঐছে তাতো এতদিন দেহি নাই?"

ফুলী বলে, "তুমি যে সোনালতা আমারে দিছিলা না বছির বাই! বড়ুরে ছাইড়া হেই লতার গয়না বানায়া পরবার আমার মনে হইল না। তাই লতাডারে মেইলা দিলাম এই বোরই গাছটার উপরে। রোজ উয়ার উপরে পানি ডাইলা ইয়ারে বাঁচায়া তুলছি। দেখছাও না কেমন জাটরায়া উটছে?"

বছির বোঝে, এও এক রকমের তাজমহল গড়িবার প্রয়াস। ফুলীর তাজমহল গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তার তাজমহল যে আরও কতদূরে–তার জীবনের তাজমহল। কতদিনে তার গড়ন শেষ হইবে?

ফুলী জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা বছির বাই! হুনছি শবেবরাতের রাইতে সগল মুদারা কবরে ফির‍্যা আসে। আগামী শবেবরাতের রাইতে বড় যদি এহানে আসে তবে হে এই বোরই গাছটার উপর সোনালতাগুলান দেখতি পাবি না?”

বছির অন্যমনস্ক হইয়া বলে, “হয়ত দেখতে পাবি।”

“আর আমি যে তার দেওয়া সোনালতাডা এই বোরই গাছে বাঁচায়া রাখছি তাও সে জানতে পারবি, না বছির বাই?”

বাড়ি হইতে আজাহের ডাকে, “ও বছির! ব্যালা বাইড়া গ্যাল, রইদ উঠলি খুব কষ্ট অবি। শীগগীর আয়, রওয়ানা দেই।”

মা আজ বারবার ছেলের মুখের দিকে চায়। ছেলেকে দেখিয়া তবু যেন সাধ মিটে না। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছেলে আর ঘুমাইবে না। মায়ের বিছানার ওইখানটা আজ শূন্য হইয়া থাকিবে।

যাইবার সময় মা ছেলের মাথায় তেল মাখাইয়া দেয়। বাপ বলে, “তেল দিলে রইদে মাথা গরম অয়া যাব্যানে, কি যে কর।”

তেল দিবার অছিলায় মা ছেলের গায়ে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ছেলে বলে, “দাও মা! বাল কইরা মাইখা দাও।” মায়ের হাতের স্পর্শ আর কতদিন পাইবে না ছেলে।

চিড়া কুটিয়া মা গামছায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মা বলে, “সঙ্গে নিয়া যা, সকালে সন্ধ্যায় নাস্তা করিস। আর এই দুই হ্যাঁন পাটি সাপটা পিঠা, নিবিরে? পথের মদ্দি খাইস।”

বাপ বলে, “বাজা-পুড়া অযাত্রা, সঙ্গে দিও না।”

কিন্তু ছেলে বলে, “তুমি দাও মা!” মাকে খুশী করিবার জন্য সে যেন আজ যা কিছু করিতে পারে! ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আজাহের রওয়ানা হয়। মা পথের দিকে চাহিয়া থাকে। যাইতে যাইতে ছেলে বারবার পিছন ফিরিয়া চায়। মাকে যেন সে জন্মের মত ফেলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাকে যাইতেই হইবে। তাজমহল গরিবার পাথর সংগ্রহ করিয়া। আনিতে হইবে–দেশ-বিদেশের বিদ্যা লুণ্ঠন করিয়া আনিতে হইবে।

মুরালদার পথের উপর গণশা দাঁড়াইয়া আছে। “এই যে গণশা বাই! তুমি এহানে কি কর?” বছির জিজ্ঞাসা করে।

গণশা উত্তর দেয়, “তুই আজ চইল্যা যাবি। হেই জন্যি পথের মদ্দি খাড়ায়া আছি। তোরে দুইডা কতা কয়া যাই।” গণশা এখনো পাঠশালায় সেই একই ক্লাশে পড়িতেছে।

বছির বলে, “গণশা বাই! তোমার জন্যিই আমি বাল মত পড়া শুনা করতি পারলাম। তুমিই আমার পরথম গুরু। তুমি যদি ওমন যত্তন কইরা আমারে ক,

খ-র বই পড়ায়া না দিতা তয় আমি পাশ করবার পারতাম না। আচ্ছা গণশা বাই! ইচ্ছা করলি তুমিও ত বালমত পড়াশুনা করতি পার?”

গণশা বলে, “ও কতা আর কত কবি? পড়াশুনা আমার অবি ন্যা। বই দেখলিই আমার মাষ্টার মশার ব্যাতের কতা মনে অয়।”

এ কথার আর বছির কি জবাব দিবে? ছোট্ট ছেলেমানুষ বছির। এখনো জানে না, জোর করিয়া মারিয়া ধরিয়া পড়াইতে যাইয়া গণশার শিক্ষক পড়াশুনাটাকে তার কাছে এমন ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

বাপ আগাইয়া যায়। গণশা বছিরের আরও কাছে আসিয়া বলে, “দেখ বছির! তুই ত শহরে চললি, দেহিস সেহানে কেউ এমন কোন মন্তর যদি জানে যা পড়লি মাষ্টারের ব্যাতের বাড়ি পিঠে লাগে না, আমারে খবর দিস। আমি যায়া শিখ্যা আসপ।”

“য়্যা গণশা-বাই! তোমারে মাষ্টার মশায় আইজ আবার মারছে নাকি?” বলিয়া বছির সমবেদনায় গণশার পিঠে হাত রাখে।

“নারে, সে জন্যি না। মাষ্টার মশার মাইর ত আমার গা-সওয়া হয়া গ্যাছে। উয়ার জন্যি আমি ডরাই না। পাঠশালার আর সগল ছাত্রগো মাষ্টার মশায় মারে, ওগো কান্দন আমি সইবার পারি ন্যা। তেমুন একটা মন্তর জানতি পারলি আমি ওগো শিখাইয়া দিতাম, ওগো গায়ে মাষ্টারের ব্যাতের বাড়ি লাগত না। এমন মন্তর জানা লোক পাইলি তুই আমারে খবর দিস?”

বছির বলে, “আইচ্ছা।”

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

গণশা আগ্রহে বছিরের আরো কাছে আসে, “আর হোন বছির! তুই ত লেহাপড়া শিহা। খুব বড় ডাক্তার অবি। যখন তোর অনেক টাহা অবি, আমাগো গিরামে আইসা এমুন একটা পাঠশালা বানাবি সেহানে মাষ্টাররা ছাওয়াল-পান গো মারবি ন্যা। তুই আমার গাও ছুঁইয়া : কিরা কাইটা এই কতাডা আমারে কয়া যা।”

বছির গণশার গা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করে। তার ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের উপর গণশার এমন বিশ্বাস দেখিয়া বছিরের বড় ভাল লাগে।

গণশা বলে, “তবে আমি যাই, বছির! এই কতা কইবার জন্যিই আমি এতদূর আইছিলাম।”

.

২৮.

ফরিদপুর আসিয়া বছির স্থান পাইল রমিজদ্দীন উকিলের বাসায়। লাকড়ি বেচিতে আসিয়া আজাহের রমিজদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়। তাহাকে বলিয়া কহিয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া ছেলে বছিরকে তাহার বাসায় রাখিবার অনুমতি পাইয়াছে।

রমিজদ্দীন সাহেব ফরিদপুরের নতুন উকিল। তাঁহার বাড়িতে মামলাকারী মক্কেল বড় আসে না। শূন্য বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি মক্কেল ধরিবার নানা রকম ফন্দি-ফিকির মনে মনে আওড়ান। তখনকার দিনে মুসলমান বলিতে কয়েকজন জুতার দোকানদার (হিন্দুরা তখন জুতার ব্যবসা করিত না। কিন্তু জুতা পরিত) কলা কচুর বেপারী আর অফিস

আদালতের জনকতক পিওন-চাপরাসী ছাড়া ফরিদপুর শহরে আর কোন মুসলমানের বাস ছিল না। ইহাদিগকে লইয়া উকিল সাহেব একটি আঞ্জুমান-এ-ইসলাম প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। এই সমিতির পক্ষ হইয়া তিনি মাঝে মাঝে শহরের নিকটবর্তী মুসলমান প্রধান গ্রামগুলিতে যাইয়া বক্তৃতা করিতেন। শহরের সব কিছুই হিন্দুদের অধিকারে। বড় বড় দোকানগুলি হিন্দুরা চালায়। অফিস আদালতের চাকরিগুলি সব হিন্দুরা করে। গরীব মুসলমান ভাইরা শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখে। শহরের উকিল মোক্তার সবই হিন্দু। হিন্দু হাকিম–হিন্দু ডেপুটি হিন্দু জজ। মুসলমানেরা জমা-জমি লইয়া মামলা মোকদ্দমা করে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করিয়া শহরে যাইয়া বিচার চায়। নিজেদের কষ্টের উপার্জিত টাকা তাহারা শহরে যাইয়া হিন্দু উকিল মোক্তাদিগকে ঢালিয়া দিয়া আসে।

“ভাই সব! আপনারা আর মামলা-মোকদ্দমা করিবেন না। যদিই বা করেন, এই খাকসার আপনাদের খেদমত করিবার জন্য প্রস্তুত রহিল। আমাকে যাহা দিবেন তাহাতেই আমি আপনাদের মামলা করিয়া দিব।”

.

শিক্ষিত সমাজের তেমন কোন দান নাই, অপরপক্ষে দেশের অশিক্ষিত চাষী মুসলমান সমাজে লোক-সাহিত্য ও লোকশিল্পের দান দিনে দিনে শতদলে ফুটিয়া উঠিতেছিল। গত। উনবিংশ শতাব্দিতে হিন্দু শিক্ষিত সমাজ তার সাহিত্য-কলায় ইউরোপীয় ভাবধারা আহরণ । করিয়া যে সাহিত্য-সম্পদ সৃষ্টি করিলেন, মুসলিম চাষী সমাজের লোক-সাহিত্য ও লোক-কলার দান তাহার চাইতে কোন অংশে হীন নয়। বরঞ্চ দেশের মাটির সঙ্গে ইহার যোগ থাকায় স্বকীয়তায় ইহা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। দেশের আরবী, ফারসী

শিক্ষিত সমাজ ইংরেজ যুগে অর্থহীন, সম্মানহীন ও জীবিকাহীন হইয়া দারিদ্রের চরমতম ধাপে নামিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, যাহাদের ঘরে সুখ নাই তাহারা পরের আনন্দে ঈর্ষাতুর। হইয়া পড়ে।

দেশের তথাকথিত মোল্লা সমাজ এই অপূর্ব পল্লী-সম্পদের শত্রু হইয়া পড়িলেন। এই মোল্লা সমাজের হাতে একদিন জেহাদের অস্ত্র ছিল। আদর্শবাদের জন্য লড়াই করিবার। প্রাণ-সম্পদ ছিল। তাহা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইল দোজখের ভয়াবহ বর্ণনায়, কঠিন শাস্তির নিষ্ঠুর পরিকল্পনায়, আর নিষেধের নানা বেড়াজাল রচনায়। দেশের জনসাধারণ। যদিও মাওলানাদের আড়ালে-আবডালে আনন্দ-উৎসবে মাতিয়া উঠিত, কিন্তু মাওলানাদের। বক্তৃতার সভায় আসিয়া তাহারা দোজখের ভীষণতর বর্ণনার কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। তাই অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে এই মাওলানাদের প্রভাব ছিল অসামান্য।

রমিজদ্দীন সাহেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবার এই মাওলানা সাহেবদের তাঁহার। আঞ্জুমান-সমিতির মেম্বার করিয়া লইলেন। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি গ্রামে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। শুধুমাত্র গান গাওয়া আর বাদ্য বাজানো হারাম নয়। হাদীসের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার দলের মাওলানা সাহেবরা আরও অনেক নিষেধের প্রাচীর রচনা করিতে লাগিলেন। মাওলানা সাহেবদেরই মত এবার হইতে উকিল সাহেবও গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিলেন। মাওলানাদের চেষ্টায় দু'একটি। মোকদ্দমাও তিনি পাইতে লাগিলেন। দিনে দিনে তাহার বৈঠকখানা হইতে ধূলি উড়িয়া। গেল। লোকজনে বৈঠকখানা গম গম করিতে লাগিল।

পিতার সঙ্গে আসিয়া বছির রমিজদ্দীন সাহেবের বাসায় স্থান পাইল। বৈঠকখানার এক কোণে একখানা চৌকীর উপর সে তাহার বই-পত্র সাজাইয়া লইল। কিন্তু পড়িবে কখন? সব সময় কাছারী ঘরে লোকজনের কোলাহল। কোন কোন রাত্রে দূরদেশী কোন মক্কেল। আসিয়া তাহার বিছানার অংশী হয়। বছির একেবারেই পড়াশুনা করিতে পারে না। গ্রামদেশে থাকিয়া তাহার অভ্যাস। কিন্তু শহরের এই কোলাহলে রাত্রে তাহার ঘুম আসে না। জাগিয়া থাকিয়া বই পড়িবারও উপায় নাই; কারণ রাত্রে হারিকেন লণ্ঠনটি উকিল সাহেব অন্দর মহলে লইয়া যান।

বিছানায় শুইয়া বছির মায়ের কথা মনে করে পিতার কথা মনে করে। তাহাদের বাড়ির বড় আমগাছটির কথা মনে করে। সেই আমগাছের তলায় ছোট বোন বড়ুকে লইয়া তাহারা খেলা করিত। সেই বড়ু আর তাহাদের সঙ্গে খেলিবে না। বড়ুর কবরে বসিয়া বছির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, লেখাপড়া শিখিয়া সে বড় ডাক্তার হইবে। কিন্তু পড়াশুনা না। করিলে কেমন করিয়া সে ডাক্তার হইবে! রোজ সকাল হইলে তাহাকে বাজার করিতে : যাইতে হয়। বাজার করিয়া আসিয়া দেখে তাহার চৌকিখানার উপর তিন চারজন লোক বসিয়া গল্প করিতেছে। তাহারই পাশে একটুখানিক জায়গা করিয়া লইয়া সে পড়িতে বসে। অমনি উকিল সাহেব এটা ওটা কাজের জন্য তাহাকে ডাকিয়া পাঠান। শুধু কি উকিল শুনিয়া শ্রোতারা সকলেই সায় দেয়। উকিল সাহেব এ-গ্রামে যান-ও-গ্রামে যান। সকলেরই এক কথা। এবার মামলা করিতে হইলে আপনাকেই আমরা উকিল দিব। কিন্তু মামলা করিতে আসিয়া তাহারা রমিজদ্দীন সাহেবকে উকিল নিযুক্ত করে না। ও-পাড়ায় সেনমশায়-দাসমশায়–মিত্তিরমশায়–ঘোষমশায় কত বড় বড় উকিল। তাহাদের বৈঠকখানায় মক্কেলে গম গম করে। রমিজদ্দীন সাহেবের বৈঠকখানায় রাশি রাশি ধূলি তাহার দীর্ঘ নিশ্বাসের প্রতীক হইয়া বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। তাহারই একপাশে বসিয়া

বহুদিনের পুরাতন খবরের কাগজখানা সামনে লইয়া উকিল সাহেব বৃথাই মক্কেলের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন।

বিষয় সম্পত্তি হারাইয়া খুনী মোকদ্দমার আসামী হইয়া যাহারা মামলা করিতে শহরে আসে তাহারা উকিল নির্বাচন করিতে হিন্দু মুসলমান বাছে না। নিজেদের বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহারা ভাল উকিলেরই সন্ধান করে। সব চাইতে ভাল উকিল হয়ত সব সময় তাহারা নির্বাচন করিতে পারে না। কিন্তু কোন উকিলের পশার ভাল তাহা তাহারা জানে। সেই পশার দেখিয়াই তাহারা উকিল নির্বাচন করে। ডাক্তার বা উকিল নির্বাচনে তাই সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যে লোক খুনী মোকদ্দমার আসামী, সে চায় এমন উকিল যে তাহাকে জেল হইতে ফাঁসী-কাষ্ঠ হইতে বাঁচাইতে পারিবে। সে তখন নিজের অর্থ-সামর্থ অনুসারে উপযুক্ত উকিল বাছিয়া লয়। যার ছেলে মৃত্যু শয্যায় সে ক্ষণেকের জন্যও চিন্তা করে না তাহার ডাক্তার হিন্দু না মুসলমান। গ্রামে গ্রামে বহু বক্তৃতা দিয়াও উকিল সাহেব তাই কিছুতেই তার পশার বাড়াইতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে আরও নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির আওড়াইতে লাগিলেন।

পাক ভারতে মুসলিম রাজত্ব শেষ হইবার পর একদল মাওলানা এদেশ হইতে ইংরেজ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সহায়-সম্পদহীন যুদ্ধ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ সেই মুসলিম দল শুধু মাত্র ধর্মের জোরে সে যুগের ইংরেজ-রাজের অত্যাধুনিক অস্ত্র-সজ্জার সামনে টিকিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। খাঁচায় আবদ্ধ সিংহ যেমন লৌহ-প্রাচীর ভাঙ্গিতে না পারিয়া আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া খাইতে চাহে, সেইরূপ এই যোদ্ধার দল নানা সংগ্রামে পরাজিত হইয়া হৃত-সর্বস্ব হইয়া ক্ষোভে দুঃখে আপন সমাজ দেহে আক্রমণ চালাইতে লাগিল।

স্বাধীন। থাকিতে যে মুসলিম সমাজ দেশের চিত্রকলায় ও সঙ্গীত-কলায় যুগান্তর আনয়ন। করিয়াছিল, আজ তাহারাই ঘোষণা করিলেন গান গাওয়া হারাম-বাদ্য বাজানো হারাম, মানুষ ও জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কন করা হারাম।

ইংরেজ আমলে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা আর্থিক অবনতির ধাপে ধাপে ক্রমেই নামিয়া যাইতেছিলেন। আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে মানুষের মধ্যে সঙ্গীত-কলার প্রতি অনুরাগ। কমিয়া যায়। যাহাদের ঘরে দুঃখ তাহারা অপরের আনন্দে ঈর্ষাতুর হইয়া পড়ে। তাই দেখিতে পাই, তখনকার দিনের মুসলিম শিক্ষিত সমাজ এই পরিবর্জনের আন্দোলনে পুরোধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ইংরেজের কঠোর শাসনে ধর্ম এখন আর জেহাদের জন্য, মানবতার সেবার জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিতে পারে না। প্রথা-সর্বস্ব ধর্ম এখন মানুষের আনন্দমুখর জীবনের উপর নিষেধের পর নিষেধের বেড়াজাল বিস্তার করিতে লাগিল। মুসলমান রাজ ত্বকালে দেশের জনসাধারণের যে অবস্থা ছিল, ইংরেজ আমলে তাহার কোনই পরিবর্তন হইল না। বরঞ্চ ইংরেজের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত শাসনে তাহারা বহিঃশত্রুর হাত হইতে কিছুটা রক্ষা পাইল। সেইজন্য দেখিতে পাই, সাহিত্য-কলা-শিল্পের ক্ষেত্রে দেশের মুসলিম সাহেব? মাওলানা সাহেবরা তাহাকে প্রায়ই পান আনিতে পাঠান-সিগারেট আনিতে পাঠান। ওজুর পানি দিতে বলেন। এইসব কাজ করিয়া কিছুতেই সে তাহার পাঠ্যপুস্তকে মন বসাইতে পারে না। স্কুলে যাইয়া মাষ্টারের বকুনি খায়। রোজকার পড়া রোজ তৈরী করিয়া যাইতে পারে না। ছুটিছাটার দিনে সে যে পড়া তৈরী করিবে তাহারও উপায় নাই। তাহাকে স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরাইয়া উকিল সাহেব মাওলানাদের সঙ্গে লইয়া এ-গ্রামে ও-গ্রামে বক্তৃতা করিতে যান।

যদিও বছির একেবারেই ছেলে মানুষ তবু উকিল সাহেবের অন্দর মহলে তাহার যাইবার হুকুম নাই। একটি ছোট্ট মেয়ে-চাকরানী টিনের থালায় করিয়া সামান্য কিছু ভাত আর ডাল তাহার জন্য দুইবেলা রাখিয়া যায়। ইঁদারা হইতে পানি উঠাইয়া একটি নিকেলের গ্লাসে পানি লইয়া বছির সেই ভাত খায়। সেই অল্প পরিমাণ ভাতে তাহার পেট ভরে না। গ্লাস হইতে পানি লইয়া সে শূন্য পেট ভরায়। বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া তাহার এমন ক্ষুধা লাগে যে ক্ষুধার জ্বালায় তখন নিজের গা চিবাইতে ইচ্ছা করে। রাত্রের আহার আশে সেই নয়টার সময়। তখন পর্যন্ত তাহাকে দারুণ ক্ষুদা লইয়া অপেক্ষা করিতে হয়।

উকিল সাহেব যখন মাওলানাদের সঙ্গে লইয়া বক্তৃতা করিতে এ-গ্রামে গ্রামে যান তখন গ্রামের লোকেরা ভালমত খাবারের বন্দোবস্ত করে। সেখানে যাইয়া বছির পেট ভরিয়া খাইতে পায়। উকিল সাহেবের বাসায় আধপেটা খাইয়া তাহার শরীরের যেটুকু ক্ষয় হয় গ্রাম দেশে দাওয়াত খাইয়া সে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়।

প্রত্যেক সভায়ই উকিল সাহেবের খাস মাওলানা শামসুদ্দীন সাহেব বক্তৃতা শেষ করিয়া সমবেত লোকদিগকে বলেন, “দেখুন ভাই সাহেবরা! এই গরীব ছেলেটিকে উকিল সাহেব দয়া করিয়া বাসায় রাখিয়া খাইতে দেন। আপনারা খেয়াল করিবেন, শহরে একটি ছেলেকে খাওয়াইতে উকিল সাহেবকে কত খরচ করিতে হয়। প্রতিমাসে যদি দশ টাকা করিয়াও ধরেন তবে বৎসরে একশত কড়ি টাকা। এই ছেলে আরও বার বৎসর শহরে থাকিয়া পড়িবে। হিসাব করিয়া দেখিবেন, এই বার বৎসরে উকিল সাহেবকে এক হাজার চার শত চল্লিশ টাকা খরচ করিতে হইবে। এত বড় মহৎপ্রাণ না হইলে,–সমাজ-দরদী না হইলে আপন ইচ্ছায় তিনি এত টাকা কেন খরচ করিবেন? এই টাকা দিয়া তিনি

বিবির গহনা গড়াইতে পারিতেন–নিজের বাড়ি-ঘর পাকা করিতে পারিতেন। আজ যে কত কষ্ট করিয়া উকিল সাহেব পায়ে হাঁটিয়া এখানে আসিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তিনি এই টাকা দিয়া মোটর গাড়ি কিনিয়া ধূলি উড়াইয়া আপনাদের এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিতেন! এই নাদান মুসলিম সমাজের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিলেন, ভাই সাহেবানরা! আসুন আমরা উকিল সাহেবের জন্য আল্লার দরবারে মোনাজাত করি।”

মোনাজাত শেষ হইলে মাওলানা সাহেব বলিতেন, “ভাইসব! এবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভোটের দিন আপনারা উকিল সাহেবকে ভুলিবেন না। আর শহরে যাইয়া মামলা-মোকদ্দমা করিতে সকলের আগে আপনাদের জনদরদী-বন্ধু উকিল সাহেবকে মনে রাখিবেন।”

তখন উকিল সাহেব উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন, “ভাইসব! ইতিপূর্বে মাওলানা সাহেব সব কিছুই বলিয়া গিয়াছেন। আমি মাত্র একটি কথা বলিতে চাই। দুনিয়া যে গাইব হইয়া যাইবে সে বিষয়ে আমার একটু মাত্রও সন্দেহ নাই। আজ আমরা কি দেখিতেছি–মুসলমানের ঘরে জন্ম লইয়া বহু লোকে গান বাজনা করে, সারিন্দা-দোতারা বাজায়, মাথায় লম্বা চুল রাখে আর রাত ভরিয়া গান করে। উহাতে আল্লাহ কত বেজার হন তাহা আপনারা মাওলানা সাহেবের মুখে শুনিয়াছেন! আপনারা খেয়াল করিবেন, দেশে যে এত বালা মুছিবাত আসে, কলেরা, বসন্তে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা এই গান বাজনার জন্য। ভাইসব! আপনাদের গ্রামে যদি এখনও কেহ গান বাজনা করে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া এই ধর্মসভায় ন্যায় বিচার করেন।” এই বলিয়া উকিল সাহেব তাহার বক্তৃতা শেষ করেন।

তখন গ্রামের মধ্যে কে গান করে, কে সারিন্দা বাজায় তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া বিচার করা হয়।

এইভাবে সভা করিতে করিতে একবার উকিল সাহেব তাহার দলবল লইয়া পদ্মানদী পার হইয়া ভাসানচর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বক্তৃতা করিয়া উকিল সাহেব যখন বসিয়া পড়িলেন, তখন গ্রামের একজন লোক বলিল, "হুজুর! আমাগো গায়ের আরজান ফকির সারিন্দা বাজায়া গান গায়।"

উকিল সাহেব উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, "আপনারা কেহ যাইয়া আরজান ফকিরকে ধরিয়া আনেন।" বলা মাত্র তিন চারজন লোক ছুটিল আরজান ফকিরকে ধরিয়া আনিতে।

অস্পক্ষণের মধ্যেই বছির দেখিল সৌম্যমূর্তি একজন বৃদ্ধকে তাহারা ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার মুখে সাদা দাড়ী। মাথায় সাদা লম্বা চুল। বৃদ্ধ হইলে মানুষ যে কত সুন্দর হইতে। পায় এই লোকটি যেন তাহার প্রতীক। মুখোনি উজ্জ্বল হাসিতে ভরা। যেন কোন বেহেস্তের প্রশান্তি সেখানে লাগিয়া আছে। সে আসিয়া বলিল, "বাজানরা! আপনারা আমারে। বোলাইছেন? দয়ালচানগো এত কাইন্দা কাইন্দা ডাহি। দেহ দেয় না। আইজ আমার, কতই ভাগ্যি দয়ালচানরা আমারে ডাইকা পাঠাইছেন।"

এমন সময় শামসুদ্দীন মাওলানা সাহেব সামনে আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম আরজান ফকির?"।

ফকির হাসিয়া বলিল, "হয় বাজান! বাপ মা এই নামই রাইখাছিল।"

মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঞা! তুমি মাথায় লম্বা চুল রাখিয়াছ কেন?"

"আমি ত রাখি নাই বাজান! আল্লাহ রাইখাছেন!"

"আল্লার উপর ত তোমার বড় ভক্তি দেখতে পাই! আল্লাহ কি তোমাকে লম্বা চুল রাখতে বলেছেন?"

"বাজান! লম্বাও বুঝি না খাটোও বুঝি না। হে যা দিছে তাই রইছে।"

"চুল কাটো নাই কেন?"

"বাজান! হে যা দিছে তাই রাখছি। যদি কাটনের কতা ঐত, তয় হে দিল ক্যান?"

"আর শুনতে পেলাম, তুমি সারিন্দা বাজিয়ে গান কর। মরাকাঠ, তাই দিয়ে বাদ্য বাজাও।"

"কি করব বাজান? দেহ-কাঠ এত বাজাইলাম, কথা কয় না। তাই মরা লয়া পড়ছি। এহনও কথা কয় নাই। তবে মদ্দি মদ্দি কথা কইবার চায়।"

"তোমার সারিন্দা আমরা ভেঙ্গে ফেলাব।"

"কাঠের সারিন্দা বাঙবেন বাজান? বুকের মদ্দি যে আর একটা সারিন্দা আছে সেডা ভাঙবেন কেমুন কইরা? হেডা যদি ভাঙতি পারতেন তয় ত বাচতাম। বুহির মদ্দি যহন

সুর গুমুইরা গুমুইরা ওঠে তখন ঘুম হয় না। খাইতি পারি ন্যা। সেইডার কান্দনে থাকপার পারি না বইলা কাঠের সারিন্দা বানায়া কান্দাই। আমার কান্দনের সঙ্গে হেও কান্দে, তাই কিছুক শান্তি পাই।"

"দেখ ফকির! তোমার ওসব বুজুরকি কথা শুনতে চাইনে। আজ তুমি আমার কাছে তোবা পড়–আর গান গাইতে পারবে না।"

"বাজান! গান বন্দ করার কলা-কৌশল যদি আপনার জানা থাহে আমারে শিহায়া দ্যান। বুকের খাঁচার মদ্দি গান আটকায়া রাখপার চাই। খাঁচা খুইলা পাখি উইড়া যায়। মানষির মনে মনে গোরে। কন ত বাজান! এ আমি কেমন কইরা থামাই?"

"ও সব বাজে কথা আমরা শুনতে চাইনে।"

"বাজান! জনম কাটাইলাম এই বাজে কথা লয়া। আসল কথা ত কেউ আমারে কইল না। আপনারা যদি জানেন, আসল কথা আমারে শিহায়া দ্যান।"

"তোমার মত ভণ্ড কোথাও দেখা যায় না।" "আমিও তাই কই বাজান! আমার মত পাপী তোক আর আল্লার আলমে নাই। কিন্তুক এই লোকগুলান তা বুঝবার পারে না। ওরা আমারে টাইনা লয়া বেড়ায়।"

"শুনতে পেলাম, তোমার কতকগুলান শিষ্য জুটেছে। তারা তোমার হাত পা টিপে দেয়। মাথায় তেল মালিশ করে। জান এতে কত গুনা হয়? আল্লাহ কত বেজার হন?"

“কি করব বাজান? ওগো কত নিষেধ করি। ওরা হোনে না। ওরা আমার ভালবাসায় পড়ছে। প্রেম-নদীতে যে সঁতার দেয় তার কি ডোবার ভয় আছে? এর যে কূল নাই বাজান! ভাইবা দেখছি, এই দেহডা ত আমার না। একদিন কবরে রাইখা শূন্য ভরে উড়াল। দিতি অবি। তাই দেখলাম, আমার দেহডারে ওরা যদি পুতুল বানায়া খেইলা সুখ পায় তাতে আমি বাদী ঐব ক্যান?”

“আচ্ছা ফকির! তুমি হাতের পায়ের নখ কাট না কেন?”

“বাজান! একদিন মানুষ হাতের পায়ের নখ দিয়াই কাইজা-ফেসাদ করত। তাই নখ রাখতো। তারপর মনের নখের কাইজা আরম্ভ ঐল। কলমের নখের কাইজা আরম্ভ ঐল। তহন আতের পায়ের নখের আর দরকার ঐল না। তাই মানষি নখ কাইট্যা ফ্যালাইল। আমার যে বাজান বিদ্যা-বুদ্ধি নাই। তাই মনের নখ গজাইল না। হেই জন্যি আতের পায়ের নখ রাখছি। মনের নখ যদি থাকতো তয় ডিগ্রীজারীতে ডিগ্রী কইরা কত জমি-জমা করতি পারতাম। কত দালান-কোঠা গড়াইতাম। মনের নখ নাই বইলা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কইরা খাই। গাছতলায় পাতার ঘরে বসত করি।”

এ পর্যন্ত আরজান ফকির যত কথা বলিল, তার মুখের মৃদু হাসিটি এতটুকুও মলিন হয় নাই। মাওলানা সাহেব যতই কুপিত হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, সে ততই বিনিত ভাবে তাহার উত্তর করিয়াছে। সভাস্থ সমবেত লোকেরা অতি মনোযোগের সঙ্গে তাহার উত্তর শুনিয়াছে।

উকিল সাহেব দেখিলেন বক্তৃতা করিয়া ইতিপূর্বে তিনি সভার সকলের মনে যে ইসলামী জোশ আনয়ন করিয়াছিলেন, আরজান ফকিরের উত্তর শুনিয়া সমবেত লোকদের মন হইতে তাহার প্রভাব একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। সভার সকল লোকই এখন যেন আরজান ফকিরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাহারা যখন অতি মনোযোগের সঙ্গে আরজান ফকিরের কথাগুলি শুনিতেছিল উকিল সাহেবের মনে হইতেছিল, তাহারা মনে মনে তাহাকে সমর্থন করিতেছে। তিনি ঝানু ব্যক্তি। ভাবিলেন, এইভাবে যদি ফকিরকে কথা বলিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাঁহার আহ্বান করা সভা ফকির সাহেবের সভায় পরিণত হইবে।

তাই তিনি হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিলেন, "ভাইসব! ভেবেছিলাম, আমাকে আর কিছু বলতে হবে না। এই ভণ্ড-ফকিরের কথা শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ইহার কথা আপনাদের কাছে আপাততঃ মিষ্ট হইতে পারে। ভাইসাবরা! একবার খেয়াল করে দেখবেন, শয়তান যখন আপনাদের দাগা দেয় এইরূপ মিষ্টি কথা বলেই আপনাদের বশে আনে। আপনারা আগেই আলেমদের কাছে শুনেছেন, গান গাওয়া হারাম! যে কাঠ কথা বলতে পারে না সেই কাঠে বাদ্য বাজানো হারাম। এই ভণ্ড-বেশী ফকির সারিন্দা বাজিয়ে গান করে। এই গান আসমানে সোয়ার হয়ে আল্লার আরশে যেয়ে পৌঁছে আর আল্লার আরশ কুরছি ভেঙে খানখান হয়। বিরাদারানে ইসলাম! এই ভণ্ড-ফকিরের মিষ্টি কথায় আপনারা ভুলবেন না। আমাদের খলিফা হযরত ওমর। (রাঃ) বিচার করতে বসে আপন প্রিয়-পুত্রকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন, মনসুর হাল্লাজকে শরীয়ত বিরোধী কাজের জন্য পারস্যের অপর একজন খলিফা তার অর্ধ অঙ্গ মাটিতে পুঁতে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মারার হুকুম দিয়াছিলেন। ভাই সকল! এখন দীন ইসলামী সময় আর নাই। নাছারা ইংরেজ আমাদের বাদশা। এই

ফকির যা অপরাধ। করেছে তাকে হত্যা করা হাদীসের হুকুম। কিন্তু তা আমরা পারব না। কিন্তু বিচার আমাদিগকে করতেই হবে। ভাই সাহেবরা! মনে রাখবেন, আপনারা সকলেই আজ কাজীর আসনে বসেছেন। খোদার কছম আপনাদের, কাজীর মতই আজ বিচার করবেন। আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে মাওলানা সাহেব এই ফকিরের প্রতি কি শাস্তি হতে পারে তা কোরান কেতাব দেখে বয়ান করবেন। আপনারা ইহাতে রাজী?”

চারিদিক হইতে রব উঠিল, “আমরা রাজী।” তখন উকিল সাহেব মাওলানা সাহেবের কানে কানে কি বলিয়া দিলে মাওলানা সাহেব কোরান শরীফ হইতে একটি ছুরা পড়িয়া বলিলেন, “আল্লার বিচার মত এই ফকিরের মাথার লম্বা চুল কাইটা ফেলতি হবি। আর তার সারিন্দাটাও ভাইঙ্গা ফেলতি হবি।”

উকিল সাহেব বক্তৃতা শেষ করিলেন। দুই তিনজন লোক ছুটিল আরজান ফকিরের সারিন্দা আনিতে। এখন সমস্যা হইল কে ফকিরের মাথায় চুল কাটিবে। গ্রামের লোক কেহই তাহার চুল কাটিতে রাজী হয় না। কি জানি ফকির কি মন্ত্র দিবে। তাহাদের ক্ষতি হইবে। অবশেষে মাওলানা সাহেব নিজে ফকিরের মাথার চুল কাটিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। এমন সময় সভাস্থ দু’একজন লোক আপত্তি করিয়া উঠিল। একজন বলিয়া উঠিল, “আমরা জীবন গেলিও ফকির সাহেবের মাথার চুল কাটবার দিব না।”

আরজান ফকির মৃদু হাসিয়া বলিল, “বাজানরা! বেজার অবেন না। মাওলানা সাহেবের ইচ্ছা ঐছে আমার মাথার চুল কাটনের। তা কাটুন তিনি। খোদার ইচ্ছাই পূরণ হোক। বাজানরা! তোমরা গোসা কইর না। চুল কাটলি আবার চুল ঐব। আল্লার কাম কেউ রদ করতি পারবি না।”

মাওলানা সাহেব কাঁচি লইয়া আরজান ফকিরের মাথার চুল কাটিতে লাগিলেন। সেই কঁচির আঘাত যেন অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বুকের কোন সুকোমল স্থানটি কাটিয়া কাটিয়া খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিতেছিল। কিন্তু কোরান হাদীসের কালাম যার কণ্ঠস্থ সেই মাওলানা সাহেবের কাজে তাহারা কোন বাধা দিতে সাহস করিল না। যতক্ষণ চুলকাটা চলিল, আরজান ফকিরের হাসি মুখোনি একটুকুও বিকৃত হইল না। কি এক অপূর্ব প্রশান্তিতে যেন তার শুভ্র-শশ্রুভরা মুখোনি পূর্ণ।

এমন সময় দুই তিনজনে আরজান ফকিরের সারিন্দাটি লইয়া আসিল। কাঁঠাল কাঠের সারিন্দাটি যেন পূজার প্রতিমার মত ঝকমক করিতেছে। সারিন্দার মাথায় একটি ডানা-মেলা পাখি যেন সুরের পাখা মেলিয়া কোন তেপান্তরের আকাশে উড়িয়া যাইবে। সেই পাখির গলায় রঙ-বেরঙের পুঁতির মালা। পায়ে পিতলের নূপুর আর নাকে পল্লী-বধূদের। মত একখানা নথ পরানো। সারিন্দার গায়ের দুই পাশে কতকগুলি গ্রাম্য-মেয়ে গান গাহিতে গাহিতে নাচিয়া নাচিয়া কোথায় চলিয়াছে।

এই সারিন্দাটি আনিয়া তিন চারজন লোক মাওলানা সাহেবের হাতে দিল! সারিন্দাটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া আরজান ফকিরের মুখোনি হঠাৎ যেন কেমন হইয়া গেল। ফকির দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “বাজানরা! আপনারা যা বিচার করলেন, আমি মাথা পাইত্যা নিলাম। কিন্তু এই মরা কাঠের সারিন্দা আপনাগো কাছে কোন অপরাধ করে নাই। এর উপরে শাস্তি দিয়া আপনাগো কি লাভ? আমার মাথার চুল কাটলেন। এত লোকের মদ্দি আমার বাল-মন্দ গাইলেন। আরও যদি কোন শাস্তি দিবার তাও দ্যান? কিন্তু আমার সারিন্দাডারে রেহাই দ্যান।”

মাওলানা সাহেব বলিলেন, “মিঞা! ও সকল ভণ্ডামীর কথা আমরা কেউ শুনবো না। কোরান কেতাব মত আমাকে কাজ করতি হবি। তোমার ওই সারিন্দা আমি ভাইঙ্গা ফ্যালব।”

ফকির আরও বিনীতভাবে বলিল, “বাজান! আমার এই বোবা সারিন্দাডারে ভাইঙ্গা আপনাগো কি লাভ ঐব? আমার বাপের আতের এই সারিন্দা। মউত কালে আমারে ডাইকা কইল, দেখরে আরজান! টাকা পয়সা তোর জন্যি রাইখা যাইতি পারলাম না। আমার জিন্দিগীর কামাই এই সারিন্দাডারে তোরে দিয়া গেলাম। এইডারে যদি বাজাইতি পারিস তোর বাতের দুঃখ ঐব না। হেই বাপ কতকাল মইরা গ্যাছে। তারির আতের এই সারিন্দাডারে বাজায়া বাজায়া দুঃখীর গান গাই। পেরতমে কি সারিন্দা আমার সঙ্গে কতা। কইত? রাইত কাবার কইরা দিতাম, কিন্তুক সারিন্দা উত্তর করত না। বাজাইতি বাজাইতি। তারপর যহন বোল দরল তহন সারিন্দার সঙ্গে আমার দুঃখীর কতা কইতি লাগলাম। আমার মতন যারা দুঃখিত তারা বাজনা শুইনা আমার সঙ্গে কানত। মাওলানাসাব! আমার এই সারিন্দাডারে আপনারা ভাঙবেন না। কত সভায় গান গায়া কত মানষির তারিফ বয়া। আনছি গিরামে, এই সারিন্দা বাজায়া! হেবার রসুলপুরীর সঙ্গে মামুদপুরীর লড়াই। দুই পক্ষে হাজার হাজার লাইঠ্যাল। কতজনের বউ যে সিন্তার সিন্দুর আরাইত, কতজনের মা যে পুত্র লোগী ঐত সেই কাইজায়। কি করব, দুই দলের মদ্দিখানে যায়া সারিন্দায় সুর দিলাম। দুই দলের মানুষ হাতের লাঠি মাটিতি পাইতা সারিন্দার গান শুনতি লাগল। মাওলানাসাব! আমারে যে শাস্তি দিবার দ্যান, কিন্তু আমার সারিন্দাডারে বাঙবেন না।” এই কথা বলিয়া আরজান ফকির গামছা দিয়া চোখের পানি মুছিল।

চারিদিকের লোকজনের মধ্যে থমথমা ভাব। আরজান ফকিরের সারিন্দার কাহিনী ত সকলেরই জানা। তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এখানে এমন কিছু ঘটিয়া যাক। যাহাতে ফকিরের সারিন্দাটি রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না।

উকিল সাহেব দেখিলেন, আরজান ফকির এই কথাগুলি বলিয়া সভার মন তাহার দিকে ফিরাইয়া লইতেছে। তিনি মাওলানা সাহেবকে বলিলেন, ”আপনি আলেম মানুষ। নায়েবে নবী। কোরান কেতাব দেখে বিচার করেন। এই ভণ্ড-ফকিরকে এসব আবোল-তাবোল বলবার কেন অবসর দিচ্ছেন?”

মাওলানা সাহেব তখন হাঁটুর সঙ্গে ধরিয়া সারিন্দাটি ভাঙিবার চেষ্টা করিলেন। সারি-কাঁঠাল কাঠের সারিন্দা। সহজে কি ভাঙিতে চাহে? সমবেত লোকেরা এক নিবাসে চাহিয়া আছে। কাহার আদরের ছেলেটিকে যেন কোন ডাকাত আঘাতের পর আঘাত করিয়া খুন করিতেছে। কিন্তু ইসলামের আদেশ-কোরান কেতাবের আদেশ। নায়েবে নবী মাওলানা সাহেব স্বয়ং সেই আদেশ পালন করিতেছেন। ইহার উপর ত কোন কথা বলা যায় না।

হাঁটুর উপর আটকাইয়া যখন সারিন্দাটি ভাঙা গেল না, তখন মাওলানা সাহেব মাটির উপর আছড়াইয়া সারিন্দাটি ভাঙিতে লাগিলেন। কসাই যেমন গরু জবাই করিয়া ধীরে ধীরে তাহার গা হইতে চামড়া উঠাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মাংসগুলি কাটিয়া লয়, সেইভাবে মাওলানা প্রথম আছাড়ে সারিন্দার খোল ভাঙিয়া ফেলিল। পাখিশুদ্ধ সারিন্দার মাথাটি

সামনে মুখঠাসা দিয়া পড়িল। তবু সেই মাথা তারের সঙ্গে আটকাইয়া আছে! টান দিয়া সেই তার ছিঁড়িয়া সারিন্দার খোলের উপরে সানকুনী সাপের ছাউনি ছিঁড়িয়া মাওলানা সাহেব সারিন্দাটিকে দুই তিন আছাড় মারিলেন। সারিন্দার গায়ে নৃত্যরতা মেয়েগুলি যাহারা এতদিন হাত ধরাধরি করিয়া কোন উৎসবের শরিক হইতে সামনের দিকে আগাইয়া চলিতেছিল তাহারা এখন খণ্ড খণ্ড কাঠের সঙ্গে একে অপর হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। খুনী যেমন কাহাকে খুন করিয়া হাপাইতে থাকে, সারিন্দাটি ভাঙ্গা শেষ করিয়া মাওলানা সাহেব জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

আরজান ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাজানরা! আমারে দিয়া ত আপনাগো কাম শেষ ঐছে। আমি এহন যাইতি পারি?"

মাওলানা সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ। তুমি এখন যাইতে পার।"

আরজান ফকির নীরবে সভাস্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। সভার কার্যও শেষ হইল।

সমবেত লোকেরা একে একে যাহার যাহার বাড়ি চলিয়া গেল। কি এক বিষাদে যেন অধিকাংশ গ্রামবাসীর অন্তর ভরিয়া আছে।

রাত্রে গ্রামের মাতবর সাহেবের বাড়িতে কত রকমের পোলাও, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব প্রভৃতি খাবার প্রস্তুত হইয়াছিল। মাওলানা সাহেব আর উকিল সাহেব নানা গাল-গল্প করিয়া সে সব আহার করিলেন। বছির সেই উপাদেয় খাদ্যের এতটুকুও মুখে দিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এই সৌম্যদর্শন গ্রাম্য-ফকিরের মাথার চুল

সে-ই যেন কাটিয়াছে আর তাহার সারিন্দাটি সে-ই যেন নিজ হাতে ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে।

.

২৯.

উকিল সাহেবের বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বছিরের কিছুতেই পড়াশুনায় মন বসে না। সব সময় আরজান ফকিরের সৌম-মূর্তিখানি তাহার মনে উদয় হয়! আহা! হাতের সারিন্দাটি ভাঙিয়া ফেলায় তার যেন কতই কষ্ট হইতেছে। কি বাজাইয়া সে এখন ভিক্ষায় যাইবে। তার বাজনা শুনিয়াই ত লোকে তাহাকে দুচার পয়সা দেয়। এখন কি আর লোকে তাহাকে সাহায্য করিবে?

উকিল সাহেবের বাড়ির ভাত যেন তার গলা দিয়া যাইতে চাহে না। গ্রামে গ্রামে তাহাকে সঙ্গে লইয়া উকিল সাহেব কোরান কেতাবের দৃষ্টান্ত দিয়া বিচারের নামে যে সব অবিচার করেন, সেজন্য সে যেন নিজেই দায়ী। তাহাকে চাকরের মত খাটাইয়া রোজ দুইবেলা চারটে ভাত দেওয়া হয়। ইহাতেও গ্রাম্য সভায় যাইয়া উকিল সাহেবের কত বাহাদুরী। ছোট হইলেও সে এসব বোঝে। কিন্তু সকল ছাপাইয়া সেই গ্রাম্য-গায়ক আরজান ফকিরের কথা। কেবলই তাহার মনে হয়।

সেদিন কি একটা উপলক্ষ করিয়া স্কুল ছুটি হইয়া গেল। বছির বই-পুস্তক রাখিয়া আরজান ফকিরের বাড়ি বলিয়া রওনা হইল। লক্ষ্মীপুর ছাড়াইয়া সতরখাদা গ্রাম। তার উত্তরে পদ্মানদী। সেখানে খেয়া-পার হইলে মাধবদিয়ার চর। খেয়া নৌকায় কত লোক

জমা হইয়াছে। আজ হাটের দিন। চরের লোকেরা হাট করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। সারি সারি ধামায় বাজারের সওদা রাখিয়া হাটুরে-লোকেরা গল্প-গুজব করিতেছে। কারো ধামায় ছোট্ট মাটির পাত্রে খেজুরের গুড়। দু'একটি পাকা আতা বা বেল। কেউ ইলিশমাছ কিনিয়া আনিয়াছে। বছির মনে মনে ভাবে এরা যখন বাড়ি পৌঁছিবে তখন হাটের সওদা পাইয়া এদের ছেলে-মেয়েরা কত খুশীই না হইবে। চরে ফল-ফলারির গাছ এখনও জন্মে নাই। তাই কেহ কেহ বেল কিনিয়া আনিয়াছে–কেহ খেজুর গুড় কিনিয়া আনিয়াছে। কি সামান্য জিনিস! ইহাতেই তাহাদের বাড়িতে কত আনন্দের হাট মিলিবে। যাহাদের আলতো পয়সা নাই, তাহারা শুধু তেল আর নুন কিনিয়া আনিয়াছে। হয়ত বাড়ির ছেলে-মেয়েদের কান্দাইয়া গাছের কলাগুলি, পাকা পেঁপেগুলি সমস্ত হাটে আনিয়া বেচিয়া শুধু তেল আর নুন কিনিয়াছে। শূন্য দুধের হাঁড়িগুলির মধ্যে নদীর বাতাস ঢুকিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতেছে। দুধের অভাবে ওদের ছেলে-মেয়েদের যে কান্না–এ যেন সেই কান্না। সবাই কিছু না কিছু কিনিয়া আনিয়াছে। আহা! আরজান ফকিরের বুঝি আজ হাট হয় নাই! সারিন্দা বাজাইয়া গান করিতে পারিলে ত লোকে তাহাকে পয়সা দিবে?

নদী পার হইয়া বছির চরের পথ দিয়া হাঁটিতে লাগিল। বর্ষা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছোট ছোট ঢেউগুলি বালুর উপর যে নকসা আঁকিয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও মুছিয়া যায় নাই। কত রকমেরই না নকসা। কোথায় বালুর উপর এঁটেল মাটির প্রলেপ। রৌদ্রে ফাটিয়া নানা রকমের মূর্তি হইয়া আসিতেছে। তার উপর দিয়া পা ফেলিতে মন চায় না। দুএক টুকরা মাটির নকসা হাতে লইয়া বছির অনেকক্ষণ দেখিল। প্রকৃতির এই চিত্রশালা কে আসিয়া দেখিবে! হয়ত কোন অসাবধান কৃষাণের পায়ের আঘাতে একদিন এই নকসাগুলি গুঁড়ো হইয়া ধূলিতে পরিণত হইবে। সেই ধূলি আবার বাতাসে ভর করিয়া নানা নকসা হইয়া সমস্ত চর ভরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বছির পথ

চলে, নকসাগুলো যাহাতে পায়ের আঘাতে ভাঙিয়া না যায়। তবুও দোমড়ানো মাটি পায়ের তলায় মড় মড় করিয়া ওঠে। মূক-মাটি যেন তাহার সঙ্গে কথা বলিতে চায়। চরের পথ ছাড়িয়া নলখাগড়ার বন। তারপর চৈতালী খেত। তার পাশ দিয়া পথ গরুর পায়ের ক্ষুরে ক্ষত-বিক্ষত। সেই পথ দিয়া খানিক আগাইয়া গেলে নাজির মোল্লার ডাঙি, তারপর মোমিন আঁর হাট। তার ডাইনে ঘন কলাগাছের আড়াল দেওয়া ওই দেখা যায় আরজান ফকিরের বাড়ি। বাড়ি ত নয়, মাত্র একখানা কুঁড়ে ঘর। উঠানে লাউ-এর জাঙলা কত লাউ ধরিয়া আছে। শিমের জাঙলায় কত শিম ধরিয়া আছে।

দুর হইতে বছির গান শুনিতে পাইল :

“যে হালে যে হালে রাখছাওরে
দয়ালচান তুই আমারে
ও আমি তাইতে ভাল আছিরে।
কারে দিছাও দালান কোঠা।
ও আল্লা আমার পাতার ঘররে।
কারে খাওয়াও চিনি সন্দেশ
ও আল্লা আমার খুদের জাওরে।

ফকির গান করিতেছে আর কাঁদিতেছে। বছির অনেকক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার গান শুনিতে লাগিল। এ ত গান নয়। অনাহারী সমস্ত মানবতার মর্মন্তুদ আর্তনাদ। কিন্তু দুঃখে এরা শুধু কাঁদে-আল্লার কাছে মূক-মনের কথা নিবেদন করে। কাহারো প্রতি ইহাদের কোন অভিযোগ নাই। শুধু একজনের কাছে দুঃখের কথা কহিয়া শান্তি পায়।

যুগ যুগ হইতে ইহারা নীরবে পরের অত্যাচার সহ্য করিয়া চলিয়াছে। সমস্ত দুনিয়ার যে মালিক সেই কম্পিত একজনকে তাহাদের দুঃখের কথা বলিয়া তাহারা হয়ত কিঞ্চিৎ শান্তি পায়। আহারে! সেই দুঃখ প্রকাশের গানও তাহাদের নিকট আজ নিষিদ্ধ হইল!

গান শেষ করিয়া ফকির বছিরকে দেখিয়া গামছা দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বাজান! আরও কি অপরাধের বিচার করনের আইছেন? আমার শাস্তির কি শেষ ঐল না?" এবার বছির ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুখ দিয়া বলিতে পারিল না, "ফকিব সাহেব! আপনার সারিন্দা যাহারা ভাঙিয়াছে আমি তাহাদের দলে নই।" ছেলেমানুষ এখনও মনের কথা গুছাইয়া বলিতে শেখে নাই। আরজান ফকির সবই বুঝিতে পারিল। বছিরকে বুকের কাছে লইয়া তার ছেঁড়া কাঁথার আসনে আনিয়া বসাইল। কিন্তু বছিরের কান্না আর কিছুতেই আসে না। ফকির গামছা দিয়া বছিরের মুখোনি মুছাইয়া বলিল, "বাজান! তোমার রূপ ধইরা আল্লা আমার গরে আইছেন। যেদিন ওরা আমার সারিন্দা বাঙল সেদিন বুঝলাম আমার দরদের দরদী এই সয়াল সংসারে কেওই নাই। আইজ তুমারে দেইখা মনে ওইল, আছে–আমার জন্যিও কান্দুইনা আছে।"

এমন সময় ফকিরের বউ আসিয়া বলিল, "আমাগো বাড়ির উনি কার সঙ্গে কতা কইত্যাছে?" দরজার সামনে যেন পটে আঁকা একটি প্রতিমা। পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধা। সমস্ত গায় চম্পকবর্ণ যেন ঝকমক করিতেছে। রাঙা মুখোনি ভরা কতই স্নেহ। দেখিয়া 'মা' বলিতে প্রাণ আঁকুবাকু করে?

ফকির হাসিয়া বলিল, "দেখ আইসা, আমার বাজান আইছে।"

বউ বলিল, “না, তোমার বাজান না আমার বাজান?”

বউ দুইহাত দিয়া বছিরের মুখোনি মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কও ত বাজান! তুমি আমার বাজান না ওই বুইড়া ফকিরের বাজান?”

লজ্জায় বছির মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল।

ফকির বলিল, “তোমার বাজান না আমার বাজান সে কথা পরে মিমাংসা করবানে। এবার বাজানের জন্যি কিছু খাওনের জোগাড় কর।”

কথাটি শুনিয়া যেন ফকির-গৃহিণীর মুখখানা কেমন হইয়া গেল। ফকির বলিল, “বউ! তুমি অত বাবছ ক্যান। জান না কেষ্ট ঠাকুর কত বড়লোকের দাওয়াত কবুল না কইরা। বিদুরের বাড়িতে খুদের জাউ খাইছিল। যা আছে তাই লয়া আস। আমি এদিকে বাজারে। গীদ হুনাই।” ফকির গান ধরিল–

“আমি কি দিয়া ভজিব তোর রাঙা পায়;
দুগ্ধ দিয়া ভজিব তোরে
সেও দুধ বাছুরিতে খায়।
চিনি দিয়া ভজিব তোরে
সেও চিনি পিঁপড়ায় লয়া যায়।”

গান শেষ হইতে না হইতেই ফকিরের স্ত্রী সামান্য খুদ ভাজিয়া লইয়া আসিল। দুইটি শাখআলু আগেই আখায় পোড়ানো হইয়াছিল। একটি পরিষ্কার নারিকেলের আচিতে ভাজা

খুদ আর মাটির সানকিতে সেই পোড়া শাখআলু দুইটি আনিয়া বছিরের সামনে ধরিল। আগের মতই দুই হাত দিয়া তাহার মুখ সাপটাইয়া বলিল, "বাজান! গরীব ম্যায়ার বাড়ি আইছাও। এই সামান্য খাওয়াটুকু খাও।"

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ফকির-বউ সেই ভাজা খুদটুকু সব বছিরকে দিয়া খাওয়াইল। তারপর নিজের হাতে সেই পোড়া আলু দুইটার খোসা ছাড়াইয়া বছিরের মুখে তুলিয়া দিল। খাওয়া শেষ হইলে বছির আরজান ফকিরকে বলিল, "বেলা পইড়া যাইতাছে। আমি এহন যাই।"

ফকিরের বউ বলিস, "ক্যা বাজান! আইজ আমাগো এহানে থাকলি অয় না?" বছির বলিল, "থাকুনের যো নাই। উকিল সাহেবের কাছে না কয়া গোপনে আপনাগো এহানে আইছি। তিনি জানতি পারলি আর রক্ষা থাকপি না।"

ফকির বলিল, "না বউ! উনারে থাকুনের কইও না। আমরা উনারে রাইখা কিবা খাওয়াব। আর কিবা আদর করব।"

বছির বলিল, "আপনারা আমারে যে আদর করলেন, এমন আদর শুধু মা-ই আমারে করছে। আমার ত ইচ্ছা করে সারা জমন আপনাগো এহানে থাহি। কিন্তুক উকিলসাব যদি শোনেন আমি আপনাগো এহানে আইছি তয় আমারে আর আস্ত রাখপি না। ফকির সাব! ওরা আপনার সারিন্দাডারে ভাইঙা ফালাইছে। আমি এই আট আনার পয়সা আনছি। আমার বাপ-মাও বড় গরীব। এর বেশী আমি দিবার পারলাম না। এই আটআনা দিয়া একটা কাঁঠাল গাছের কাঠ কিন্যা আবার সারিন্দা বানাইবেন।"

ফকির বছিরকে আদর করিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কও ত বাজান! এই পয়সা তুমি কোথায় পাইলা?”

বছির বলিল, “আমি যখন বাড়ি থইনে আসি তহন আমার মা আমারে দিছিল। আর কয়া দিছিল এই পয়সা দিয়া তোর ইচ্ছামত কিছু কিন্যা খাইস। আমি ত উকিলসাবের বাড়িই দুই বেলা খাই। আমার আর পয়সা দিয়া কি অবি? তাই আপনার জন্যি আনলাম।”

শুনিয়া ফকির কাঁদিয়া ফেলিল, “বাজান! আপনার পয়সা লয়া যান। ওরা আমার কাঠের সারিন্দা বাঙছে কিন্তুক মনের সারিন্দা বাঙতি পারে নাই। সারিন্দা বাঙা দেইখা ও-পাড়ার ছদন শেখ আমারে কাঁঠালের কাঠ দিয়া গ্যাছে। দু’এক দিনির মদ্দিই আবার সারিন্দা বানায়া ফেলাব। একদিন আইসা বাজনা শুইনা যাইবেন।”

ফকিরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বছির আবার সেই আঁকা-বাঁকা গেঁয়ো-পথ ধরিয়া খেয়াঘাটের দিকে চলিল। তাহার মনে কে যেন বসিয়া আনন্দের বাঁশী বাজাইতেছে। দুই পাশে মটরশুটির খেত। লাল আর সাদায় মিলিয়া সমস্ত খেত ভরিয়া ফুল ফুটিয়া আছে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে মটরশুটির ফুলগুলি। প্রত্যেক ফুলের দুইটি পর সাদা! মাঝখানে সিঁদুরে রঙের বউটি যেন বসিয়া আছে। বাতাসে যখন মটরশুটির ডগাগুলি দুলিতেছিল বছিরের মনে হইতেছিল তার বোন বড় বুঝি তার হাজার হাজার খেলার সাথীদের লইয়া সেই খেতের মধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছিল। মরিয়া সে কি এই খেতে আসিয়া ফুল হইয়া ফুটিয়া আছে?

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বছির এই খেতের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সামনের দিকে আগাইতে লাগিল। এবার পথের দুই পাশে সরিষার খেত। সমস্ত খেত ভরিয়া সরিষার হলদে ফুল ফুটিয়া চারিদিকে গন্ধ ছড়াইতেছে। সমস্ত চর যেন আজ বিয়ের হলদী কোটার শাড়ীখানা পরিয়া বাতাসের সঙ্গে হেলিতেছে দুলিতেছে। ফকিরের বাড়ি যাইবার সময় বছির এই খেতের মধ্য দিয়াই গিয়াছে। কিন্তু তখন এই খেতে যে এত কিছু দেখিবার আছে তাহা তাহার মনেই হয় নাই। গ্রাম্য-ফকিরের স্নেহ-মমতা যেন তার চোখের চাহনিটিতে রঙ মাখাইয়া দিয়াছে। সেই চোখে সে দেখিতেছে, হাজার হাজার নানা রঙের প্রজাপতি ডানা মেলিয়া এ-ফুল হইতে ও-ফুলে যাইয়া উড়িয়া পড়িতেছে। তাহাদের পাখায় ফুলের রেণু মাখানো! ফোঁটা সরিষার গন্ধে বাতাস আজ পাগল হইয়াছে। সেই গন্ধ তাহার বুকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত চরখানিতে যেন হলুদের ঢেউ খেলিতেছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আসিয়া চরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই বাতাসে সরষে গাছগুলি হেলিয়া যাইয়া আবার খাড়া হইয়া উঠিতেছিল। বছির দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ এই ছবি দেখিল। বাতাস যেন হলুদ শাড়ী-পরা, চরের মেয়ের মাথায় চুলগুলিতে বিলি দিতেছে। খেতের মধ্যেও কত কি দেখিবার! দুধালী লতাগুলি সরষে গাছের গা বাহিয়া সাদা ফুলের স্তবক মেলিয়া হাসিতেছে। মাঝে মাঝে মটরের লতা, গা ভরা লাল ফুলের গহনা। সেখান দিয়া লাল ফড়িংগুলি রঙিন ডানা মেলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া বছিরের সাধ যেন আর মেটে না। ওদিকে বেলা পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। আর ত দেরী করা যায় না। আস্তে আস্তে বছির খেয়াঘাটের দিকে পা বাড়াইল। চলিতে চলিতে তার কেবলই মনে হইতেছিল, এমন সুন্দর করিয়া মাঠকে যাহারা ফুলের বাগান করিতে পারে কোন অপরাধে তারা আজ পেটের ভাত সংগ্রহ করিতে পারে না?

.

৩০.

উকিল সাহেবের বাড়ি পৌঁছিয়া বছির তাহার বইগুলি সামনে লইয়া বসিল। যেমন করিয়াই হউক পড়াশুনায় ভাল তাহাকে হইতে হইবে। সেই আট আনার পয়সা দিয়া সে একটি কেরোসিনের কুপী আর কিছু কেরোসিন তৈল কিনিয়া আনিল। তারপর উকিল সাহেব যখন নয়টার পর তার হারিকেন লণ্ঠনটি লইয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন সে তাহার কুপী জ্বালাইয়া পড়িতে বসিল।

এইভাবে দশ বার দিন পরে তার কেনা কেরোসিন তৈল ফুরাইয়া গেল। তখন সে ভাবিতে বসিল, কি করিয়া পড়াশুনা করা যায়? সামনে রাস্তার উপর একটি বাতি জ্বলিতেছিল সে তাহার পড়ার বইখানি লইয়া রাস্তার সেই বাতিটির নিচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কতদিন পড়িতে পড়িতে পা অবশ হইয়া আসে। কিন্তু শরীরের কষ্টের দিকে চাহিলে ত তাহার চলিবে না। সে পড়াশুনা করিয়া বড় ডাক্তার হইবে। দেশের। চারিদিকে নানান নির্যাতন চলিতেছে। বড় হইয়া সে এই নির্যাতন দূর করিবে। তার ত শারীরিক কষ্টের দিকে চাহিলে চলিবে না।

ইতিমধ্যে বছির ও মাওলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া উকিল সাহেব আরও তিন চারটি গ্রামে যাইয়া বক্তৃতা করিলেন। ভাজন ডাঙা গ্রামে কমিরদ্দী সরদার নামডাকের লোক। তাহার অবস্থাও আশেপাশের সকলের চাইতে ভাল। উকিল সাহেব খবর পাইলেন, সে ইসলামের নিয়ম-কানুন বরখেলাপ করিয়া পদ্মা নদীতে দৌড়ের নৌকা লইয়া বাইচ

www.bengaliebook.com

খেলায় আর তার বাড়িতে গানের দল আনিয়া মাঝে মাঝে জারী গানের আসর বসায়। ইহাতে আশেপাশের যত সব মুসলমান ভাইরা গোমরাহ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই গ্রামে যাইয়াই সকলের আগে উকিল সাহেব তার দীন ইসলামী ঝাণ্ডা তুলিবেন। লোক মারফত তিনি আগেই শুনিয়াছিলেন, কমিরদ্দী সরদার খুব নামডাকের মানুষ। শত শত লোক তাহার হুকুমে ওঠে বসে। তাই এবারের সফরে স্থানীয় জমিদার সরাজান চৌধুরী সাহেবকে তিনি সঙ্গে করিয়া লইলেন।

এই সব সভায় সাধারণতঃ বেশী লোক জমা হয় না। কিন্তু সভা হইবার ঘণ্টাখানেক আগে জমিদার সাহেবের তিন চারজন পেয়াদা তকমাওয়ালা চাপকানের উপর জমিদারের নিজ নাম অঙ্কিত চাপরাশ ঝুলাইয়া যখন অহঙ্কারী পদক্ষেপে সভাস্থলে আসিতেছিল তখন গ্রামবাসীদের চক্ষে তাক লাগিয়া গেল। তারপর জমিদার সাহেব নিজে যখন তাঁহার তাজী ঘোড়াটায় চড়িয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন তখন গ্রামের কুকুরগুলির সহিত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁহার পিছে পিছে যে ভাবে শব্দ করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তাহাতে গ্রামবাসীদের কৌতূহল চরমে পৌঁছিল। তাহারা দল বাঁধিয়া সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদার সাহেবের ঘোড়ার পিঠে সুদৃশ্য গদি, গলায় নকসী চামড়ার সঙ্গে নানা রকমের ঘুঙুর। সেই ঘুঙুর আবার ঘোড়ার নড়নে-চড়নে বাজিয়া উঠিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া গ্রামবাসীদের সাধ মেটে না। কেহ কেহ সাহস করিয়া জমিদার সাহেবের বরকন্দাজদের সঙ্গে কথা বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। তাহারা কি সহজে কথা বলে? তিন চারটি প্রশ্ন করিলে এক কথার উত্তর দেয়। এও কি কম সৌভাগ্য? মূল জমিদার সাহেবের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না।

কিছুক্ষণ পরে সভা আরম্ভ হইল। উকিল সাহেব দাঁড়াইয়া প্রস্তাব করিলেন, “জন-দরদী প্রজাবৎসল জমিদার মিঃ সরাজান চৌধুরী সাহেব এই সভায় তসরিফ এনেছেন। জমিদারী। সংক্রান্ত বহু জরুরী কার্য ফেলিয়া তিনি শুধু আপনাদের খেদমতের জন্যই এখানে আসিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করি তিনি এই সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কত করুন।”

মাওলানা সাহেব এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। জমিদার সাহেব সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

প্রথমে মাওলানা সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন! গোর আজাব হইতে আরম্ভ করিয়া হজরতের ওফাত পর্যন্ত শেষ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “ভাই সাহেবানরা! বড়ই আফসোসের কথা, আপনাদের এই গ্রামের কমিরদ্দী সরদার মুসলমান ভাইগো সঙ্গে লয়া পদ্মা নদীতে নৌকা বাইচ খেলায়। তার চায়াও আফসোসের কথা, সেই নৌকা বাইচ খেলানো হয় হিন্দুগো পূজা-পার্বণের দিনি। আরও আফসোসের কথা, কমিরদ্দী সরদার। তার বাড়িতি জারী গানের আসর বসায়। বিচার গানের বাহেজ করায়। আমার খোদাওন। তালা জাল্লেজালালুহু কোরান শরীফে ফরমাইয়াছেন, যে গানের দল বায়না করে, নৌকা বাইছ দ্যায় এমন লোককে পয়জার মাইরা শায়েস্তা করা প্রত্যেক মোমিন মুসলমানের পক্ষে ফরজ। আইজ আপনাগো এহানে আমরা আইছি দেহনের লাইগা, আপনারা এই। নাফরমানি কাজের কি বিচারডা করেন।”

এমন সময় একটি যুবক উঠিয়া বলিল, “সভাপতি সাহেব! এই সভায় আমি কিছু বলতে চাই।”

মাওলানা সাহেব সভাপতির কানে কানে বলিলেন, “ওই যুবকটি কলেজে পড়ে–কমিরদ্দী সরদারের পুত্র।”

কিন্তু সভাপতি সাহেব মাওলানা সাহেবের ইঙ্গিত বুঝিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই যুবক হয়ত মাওলানা সাহেবকেই সমর্থন করিবে। প্রকাশ্যে বলিলেন, “আচ্ছা! শোনা যাক যুবকটি কি বলতে চায়।”

যুবকটি এবার বলিতে আরম্ভ করিল, “ভাই সকল! ইতিপূর্বে আপনারা মাওলানা সাহেবের বক্তৃতা শুনেছেন। আমার পিতা হিন্দুর তেহারের দিন দৌড়ের নৌকাখানি নিয়া বাচ খেলান। আপনারা সকলেই জানেন, ইসলাম ধর্মের মূলনীতি হল একতা, সকলে দলবদ্ধ হয়ে থাকা! আল্লার এবাদত বন্দেগী করতেও তাই দলবদ্ধ হয়ে করার নির্দেশ। যে জামাতে যত লোক সেখানে নামাজ পড়লে তত ছওয়াব। আপনারা সকলেই ঈদের দিন মাঠে যেয়ে নামাজ আদায় করেন। সেখানে লক্ষ লোক একত্র হয়ে নামাজ পড়েন। এর। অন্তর্নিহিত কথা হল শত্রু-পক্ষীয়রা জানুক মুসলমানেরা সংখ্যায় কত–তাহাদের একতা। কত দূর। ইসলামের নির্দেশ মত লক্ষ লক্ষ লোক নামাজের সময় নীরবে ওঠে বসে। জগতের কোন জাতির মধ্যে এমন শৃঙ্খলা দেখা যায় না। আমার পিতা যে নৌকা বাইজ খেলান তাহাতেও গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা বৃদ্ধি পায়। মুসলমান ভাইদের নিয়ে আমার পিতা যে হিন্দুর পূজা-পার্বণে নৌকা বাইজ খেলান তার পেছনেও একটা সত্য আছে। আপনারা জানেন, মাঝে মাঝে আমাদের দেশে নমু মুসলমানে দাঙ্গা হয়। ক গ্রামের লোকের সঙ্গে অপর গ্রামের লোকের দাঙ্গা হয়। আমাদের গ্রামের ইজ্জত যাতে রক্ষা হয় সেজন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়! সেবার দীগনগরের হাটে আমাদের

গ্রামের লস্কর তালুকদার মুরালদার লোকদের হাতে মার খেয়ে এলো। পরের হাটে আমাদের লোকজন দলবদ্ধ হয়ে মুরালদার লোকদের বেদম মারপিট করে এলো। সেই হতে আমাদের গ্রামের লোকদের সবাই ভয় করে চলে। হিন্দুর পূজা-পার্বণে বহুলোক একত্র জমা হয়। সেখানে নৌকা বাচ খেলে আমার পিতা প্রতিপক্ষদের নৌকাগুলিকে হারিয়ে দিয়ে আসেন। হাজার হাজার লোক জানতে পারে, ভাজনডাঙার লোকদের শক্তি কত। তাই কেউ আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াতে সাহস করে না। এক কালে হয়ত হিন্দু মুসলমানে রেশারেশি ছিল। তাই হিন্দুর উৎসবের দিন হাজার হাজার হিন্দুর মধ্যে মুসলমানেরা দৌড়ের নৌকা নিয়ে তাদের প্রতাপ দেখিয়ে আসত। সেই থেকে হয়ত হিন্দুর পূজা-পার্বণে মুসলমানের নৌকা বাচ খেলান রেওয়াজ হয়েছে। আমার পিতা হিন্দুর তেহারে নৌকা বাচ খেলান কিন্তু হিন্দুর পূজায় অংশ গ্রহণ করেন না। হিন্দুর প্রতিমাকে খোদা বলেও সেজদা। করেন না। বরঞ্চ হিন্দুর উৎসবে মুসলমান পয়গাম্বরদের কাহিনী গানের মাধ্যমে প্রচার। করে আসেন। আমি ত কতবার দেখেছি, আমাদের দৌড়ের নৌকা থেকে ইমাম হোসেনের জারী গান শুনে বহু হিন্দু অশ্রু বিসর্জন করেছে। আপনারা আজ যদি আমাদের গ্রামের লোকদের মধ্যে বাচ খেলানো বন্ধ করেন তবে আমাদের গ্রামের একতা নষ্ট হয়ে যাবে। গ্রামের লোকদের সঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার ক্ষমতা কমে যাবে।”

যুবকটির বলিবার ভঙ্গী এমনি চমৎকার যে সভায় লোক নীরবে তার কথাগুলি শুনিতেছিল। উকিল সাহেব ধূর্তলোক। দেখিলেন, এই যুবকের বক্তৃতায় সভার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি মাওলানা সাহেবের কানে কানে কি বলিলেন। মাওলানা সাহেব যুবকটিকে থামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিঞা, যে এত বক্তৃতা করতাছাও, মুহির দাড়ি কাইটা ত এহেবারে নমশূদ্রের মত দেখতি ঐছ। আর ইংরাজী বাঙলা নাছারা

কিতাব ত অনেক পড়ছাও। কোরান কিতাবের কোন খবরনি রাহ? মিঞাসাবরা! এই বেদাড়ি নাছারার ওয়াজ কি আপনারা হুনবেন?”

যুবকটি কি বলিতে যাইতেছিল। সভাপতি সাহেব তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, “চুপ কর, তুমি বেয়াদপ। ময়মুরব্বী চেন না। মাওলানা সাহেবকে বলতে দাও।”

মাওলানা সাহেব আরম্ভ করিলেন, “ভাই সাহেবানরা! আমার খোদা কইছেন, এমন দিন আইব যহন আলেম-ওস্তাদের কথা লোকে শুনব না। নাছারা লোকের কথায় মানষি কান দিব। কিন্তু আপনাগো কয়া যাই, আইজ যদি আপনারা এই কমিরদ্দী সরদারের বিচার না করেন তয় এহানে আমি জান কবজ কইরা দিব। আল্লার কোরান আগুনে পুড়াইয়া দিব, সগল মুসলমানগো আপনারা কি এমনি গোমরাহ হয়া থাকতি বলেন? আমাগো হুজুর জমিদার সাহেব! তানির কাছেও আমি বিচারডা সঁইপা দিয়া এই আমি বইলাম। কমিরদ্দী সরদারের বিচার যতদিন না অবি, রোজ কেয়ামত পর্যন্ত আমি এহানে বয়া থাকপ।”

মাওলানা সাহেব আসন গ্রহণ করিলে জমিদার সাহেব কমিরী সরদারকে ডাকিয়া বলিলেন, “মিঞা! তোমার দৌড়ের নৌকাখানা তুমি আজ নিজ হাতে ভাঙবে কিনা সেই কথা বল?”

কমিরদ্দীন বলিলেন, “আমার পুলাপানরে যেমুন আমি বালবাসি তেমনি বালবাসি আমার নাওখানা। আমার জান থাকতি এই বাইচের নৌকা ভাঙবার দিব না।”

জমিদার সাহেব তখন বললেন,”মিঞা! মনে থাকে যেন তোমার কাছে আমি বছরে পঁচিশ টাকা খাজনা পাই। সে খাজনা নালিশ না করে নেব না। তোমার ভিটায় যেদিন

ঘুঘু চরবে সেদিন তোমার খাজনা চাব! বেশ, তোমার বাইচের নৌকা তুমি কেমন করে চালাও তাই আমি দেখব।”

মাওলানা সাহেব বলিয়া উঠিলেন, “হুজুর! অতদুর যাওনের দরকার নাই। আপনার পেয়াদাগো একটা হুকুম দ্যান। কমিরীকে বাইন্দা ফেলাক। দেহি এর শরীয়তে বিচার। করতি পারি কিনা?”

জমিদার সাহেবকে হুকুম দিতে হইল না। তিন চারজন পেয়াদা কমিরদ্দী সরদারকে আসিয়া আক্রমণ করিল। সরদার হাতের লাঠিখানায় এক ঘুরান দিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া দিল। তখন গ্রামের দুই দলে মারামারি আরম্ভ হইল! গ্রামে যাহারা কমিরদ্দী সরদারের ঐশ্বর্য দেখিয়া ঈর্ষা করিত তাহারা জমিদার সাহেবের পক্ষ লইল। বাড়ি বাড়ি হইতে বোঝায় বোঝায় সড়কি লাঠি আনিয়া এ-দলে ও-দলে তুমুল দাঙ্গা চলিল। ইতিমধ্যে মাওলানা সাহেব তাহার কেতাব কোরান বগলে করিয়া পালাইঁয়া জান বাঁচাইলেন। জমিদার সাহেব থানায় খবর দিবার ওজুহাতে ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া চলিলেন। উকিল সাহেব বহুপূর্বেই বছিরকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়াছেন।

ইহার পর দুই দলের মধ্যে সদর কোর্টে মামলা চলিতে লাগিল। উকিল সাহেবের বৈঠকখানা বহু লোকের সমাগমে পূর্বের চাইতে আরও সরগরম হইতে লাগিল।

এই ঘটনার পর উকিল সাহেব কিছুদিনের জন্য গ্রাম দেশে সভা-সমিতি করিতে আর বাহির হইলেন না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তাহার বৈঠকখানায় লোকজনের

আনাগোনা দেখিয়া প্রতিদিন দুএকজন মামলাকারী আসিয়া তাহাকে উকিল নিযুক্ত করিতে লাগিল।

এই সব ঝামেলার মধ্যে বছিরের পড়াশুনার বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এখন আর উকিল সাহেব গ্রামদেশে বক্তৃতা করিতে যান না বলিয়া তাহার ভাগ্যে প্রতি রবিবারে যে ভাল খাবার জুটিত তাহা বন্ধ হইয়া গেল। দুই বেলা সামান্য ডাল ভাত খাবার খাইয়া তাহার শরীর দিনে দিনে কৃশ হইতে লাগিল। স্কুলের ছুটির পর এমন ক্ষুধা লাগে। তখন সে নিকটস্থ পানির কল হইতে এক গ্লাস পানি আনিয়া ঢোক ঢোক করিয়া গেলে। তাহাতে উপস্থিত পেটের ক্ষুধা নিবারণ হয় বটে, কিন্তু খালি পেটে পানি খাইয়া মাঝে মাঝে বেশ। পেটে ব্যথা হয়। সন্ধ্যাবেলা বই-পুস্তক সামনে লইয়া বসে আর ঘড়ির দিকে চাহে। কখন। নয়টা বাজিবে। কখন উকিল সাহেব অন্দরে ঢুকিবেন। বাড়ির চাকর যখন অল্প পরিমাণ ভাত আর সামান্য ডাল লইয়া তার ঘরে ঢোকে তখন তার মনে হয় কোন ফেরেস্তা যেন তাহার জন্য বেহেস্তী খানা লইয়া আসিয়াছে। সেই ডালভাত সম্পূর্ণ খাইয়া সে টিনের থালাখানা ধুইয়া যে পানিটুকু পায় তাহাও খাইয়া ফেলে।

কতদিন রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখে কোথায় যেন সে গিয়াছে। তাহার মায়ের মতই দেখিত একটি মেয়ে কত ভাল ভাল খাবার নিজ হাতে তুলিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে। ঘুম ভাঙিলে সে মনে মনে অনুতাপ করে, আহা! আর যদি একটু ঘুমাইয়া থাকিতাম তবে আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া সেই ভাল ভাল খাবারগুলি খাওয়ার আনন্দ পাইতে পারিতাম। শহরের কোথাও মিলাদ হইলে সে সুযোগ পাইলেই রবাহূত ভাবে সেখানে যায়। তার নিজ গ্রামে কোথাও মিলাদ হইলে সমবেত লোকদিগকে ভুরীভোজন করানো হয়। শহরের মিলাদে সেরূপ খাওয়ানো হয় না। কোথাও শ্রোতাদিগের হাতে মাত্র চার

পঁচখানা বাতাসা বা একখানা করিয়া জিলাপী দেওয়া হয়। শুধু এই সামান্য দু'একখানা বাতাসা বা জিলাপীর লোভেই সে মিলাদে যায় না। ওয়াজ করিবার সময় মৌলবী সাহেব যখন বেহেস্তের বর্ণনা করেণ সেই বেহেস্তে গাছে গাছে সন্দেশ, রসগোল্লা ধরিয়া আছে। ইচ্ছামত পাড়িয়া খাও। হাত বাড়াইলেই বেহেস্তী মেওয়ার গাছের ডাল নামিয়া আসে। কত আঙ্গুর, বেদানা, ডালিম! মানুষে আর কত খাইবে। এই সব বর্ণনা শুনিতে তার ক্ষুধার্ত দেহ কোথাকার যেন তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়। বোধ হয়, এই জন্যই গ্রামের অনাহারী লোকদের। কাছে মিলাদের ওয়াজ এত আকর্ষণীয়।

কিন্তু খাবার চিন্তা করিলেই ত বছিরের চলিবে না। তাহাকে যে বড় হইতে হইবে। বড় ডাক্তার হইতে হইবে। পাঠ-পুস্তকের অবাধ্য কথাগুলিকে সে বার বার পড়িয়া আয়ত্ত করে। লাইট পোষ্টের নীচে কোন কোন সময়ে সে সারা রাত্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। স্কুলের ছুটির পর অবসর সময়ে সে যে কোথাও বেড়াইতে যাইবে তাহার উপায় নাই। এখন লোকজনের বেশী আনাগোনা হওয়ায় উকিল সাহেবের বাড়ির ফুট-ফরমাস, কাজকর্ম আরও অনেক বাড়িয়াছে। এই ত শহরের কাছেই রহিমদ্দী দাদার। বাড়ি– মেনাজদ্দী মাতবরের বাড়ি। কতবার সে ভাবিয়াছে তাহাদের ওখানে যাইয়া বেড়াইয়া আসিবে; কিন্তু কিছুতেই ফুরসত করিয়া উঠিতে পারে নাই।

গ্রীষ্মের ছুটি

৩১.

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িল। বছির বই-পত্র লুঙ্গীতে বাধিয়া বাড়ি বলিয়া রওয়ানা হইল। পথে চলিতে চলিতে পথ যেন আর ফুরায় না। মায়ের জন্য, পিতার জন্য তাহার মন কাঁদিয়া উঠে। আহা! মা যেন কেমন আছে! যদি তার কোন অসুখ করিয়া থাকে, হয়ত সেই অসুখের মধ্যে মা তার নাম করিয়া প্রলাপ বকিতেছে। যত সব অলক্ষুণে কথা তার মনে আসিয়া উদয় হয়। যতই সে ভাবে এই সব কথা সে মনে আনিবে না, ততই এই সব কথাগুলি কে যেন তার মনের পর্দায় বিদ্ধ করিয়া দিয়া যায়। বছির আরও জোরে জোরে পা ফেলায়।

সন্ধ্যা হইবার ঘন্টাখানেক আগে সে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। মা রান্না করিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার গা মুখ আঁচলে মুছাইয়া দিল। ঘরের বারান্দায় আনিয়া বসাইয়া তালের পাখা লইয়া ছেলেকে বাতাস করিতে লাগিল। আহা! ছেলের শরীর কেমন রোগা হইয়া গিয়াছে। “হারে! সেহানে দুই ব্যালা প্যাট ভইরা খাইবার ত পাস। তোর চেহারা এমুন খারাপ হয়া গ্যাছে ক্যান?”

ছেলে মিথ্যা করিয়া বলে, “মা! তুমি কও কি? শহরে উকিল সাহেবের বাড়ি, কত সন্দেশ, রসগোল্লা গড়াগড়ি যায়।”

“তয় তোর চেহারা এমুন খারাব ঐল ক্যান?”

“মা তুমি কি কও? সেহানে দিন রাইত খালি বই পড়তি অয়। রাইত জাইগা জাইগা পড়ি। তয় চেহারা খারাপ অবি না?”

এমন সময় আজাহের মাঠ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা স্বামীকে দেখিয়া মাথায় অপরিসর ঘোমটাটি টানিয়া লইতে বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিল,”দেহ কিডা আইছে? য়্যাহেবারে শুহায়া কাঠ হয়া আইছে।”

“তুমি যাও। উয়ার জন্য খাওনের জোগাড় কর।”

মা তাড়াতাড়ি খাবার বন্দোবস্ত করিতে গেল।

বহুদিন পরে বছির বাড়ি আসিয়াছে। নারকেল গাছের তলায় নারকেল ফুলের কি এক রকম সুবাস। সেই সুবাসে বছিরের মনে যেন কত কালের কি অনুভূতি জাগে। বনের গাছে। গাছে নানা রকমের পাখি ডাকিতেছে। মূক মাটি তাহাদের কণ্ঠে আপন ভাষা তুলিয়া দিয়া নীরবে শুনিতেছে! সেই গান শুনিতে শুনিতে সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত বছির অল্প সময়েই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে ফুলী বেড়াইতে আসিল। ফুলী এখন কত সুন্দর হইয়াছে দেখিতে। হলদে রঙের একখানা শাড়ী পরিয়াছে। তাহাতে তাহার গায়ের রঙ যেন আরও খুলিয়াছে!

“বছির বাই! তুমি আইছ খবর পায়াই তোমারে দেখতি আইলাম।” সুন্দর ভঙ্গীতে বসিয়া ফুলী দুই হাতে বছিরের পা ছুঁইয়া সালাম করিল। যেন কোন পীর সাহেবকে তার একান্ত ভক্ত সালাম জানাইতেছে।

বছির বলিল “কিরে ফুলী! কেমন আছিস?”

কোথাকার লজ্জা আসিয়া যেন তাহার সকল কথা কাড়িয়া লইল। বছিরের মায়ের আঁচল মুখে জড়াইয়া ফুলী কেবলই ঘামিতে লাগিল।

বছির তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, “চাচী কেমুন আছে রে? তোরে ত আমি বই দিয়া গেছিলাম পড়বার। পড়ছাস ত?”

এ কথারও ফুলী কোন উত্তর দিতে পারিল না। বছিরের মা উত্তর করিল, “পড়ছে না? হগল বই পইড়া ফালাইছে।”

বছির বলিল,”এবার তোর জন্যি আর একখানা বই আনছি। দেখ, কেমন ছবিওয়ালা।”

এই বলিয়া তার বই-পত্রের বোচকা খুলিয়া একখানা ছোট বই বাহির করিয়া দিল। ফুলী বইখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে তাহার মুখে মৃদু লজ্জা মিশ্রিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। বছিরের মা দুই সাজীতে করিয়া মুড়ী আনিয়া বছির ও ফুলীর হাতে দিয়া বলিল, “তোরা খা। আমি ইন্দারা ত্যা পানি লয়া আসি।”

এবার ফুলীর মুখ খুলিল, ”বছির বাই! তুমি এবার এত দেরী কইরা আইলা ক্যান? আমি সব সময় তোমার পথের দিকে চায়া থাহি। ওই মাঠ দিয়া জামা কাপড় পরা কেউ। আইলি বাবি, এই বুজি বছির বাই আসত্যাছে।”

এই বলিয়া ফুলী কান্দিয়া ফেলিল। বছির ফুলীর আঁচল দিয়া তার মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, “আমারও বাড়ি আসপার জন্যি মন ছুঁইটা আইত, কিন্তুক পড়াশুনার এত চাপ যে কিছুতেই বাড়ি আসপার পারলাম না। এবার বাড়ি আইসা অনেকদিন থাকপ।”

ফুলী তখন আঁচলের ভিতর হইতে এক টুকরা কাপড় বাহির করিয়া বলিল, “দেহ বছির বাই! তুমার জন্যি একখানা রুমাল বানাইছি।”

রুমালখানা মেলিয়া ধরিয়া বছির বলিল, “বারি ত সুন্দর ঐছেরে। কি সুন্দর ফুল বানাইছাস? এ কিরে তুই যে মুড়ি খাইতাছস না? আয় দুই জনের মুড়ি একাত্তর কইরা আমরা খাই।”

এই বলিয়া নিজের মুড়িগুলি ফুলীর সাজিতে ঢালিয়া দিয়া দুইজনে খাইতে বসিল। খাওয়া শেষ হইলে ফুলী বলিল, “বছির বাই! আমার সঙ্গে আইস।”

এই বলিয়া বছিরকে টানিতে টানিতে বড়ুর কবরের পাশে লইয়া আসিল। এখানে আসিলে দুইটি কিশোর হিয়া যেন বড়ুর বিয়োগ ব্যথায় এক হইয়া যায়। বছির চাহিয়া দেখিল, বোনের কবরের উপরে সেই কুল গাছটির প্রায় সবগুলি ডাল বেড়িয়া সোনালতা জড়াইয়া আছে। ফুলীর তাজমহল ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছে, কিন্তু বছিরের তাজমহল ত শুধু সোনালতার শোভায়ই শেষ হইবে না। সে যে ছেলে। তাকে জীবনের

তাজমহল গড়িতে হইবে। আরও বেশী করিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। আরও বহু কষ্ট করিতে হইবে। বহুদিন আধাপেটা খাইয়া থাকিতে হইবে। জীবনের সম্মুখে সুদীর্ঘ কণ্টক পথ লইয়া সে আসিয়াছে। এই পথের মোড়ে মোড়ে অবহেলা-অপমান-অনাহার–বুভুক্ষা–সব তাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে।

বহুক্ষণ দুইজনে নীরবে সেই কবরের পাশে বসিয়া রহিল। দুইজনের চোখ হইতেই ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ধারা গড়াইয়া পড়িয়া কবরের মাটি সিক্ত করিতে লাগিল।

এই মূক কবরের তলা হইতে বড় যেন জাগিয়া উঠিয়া বছিরের কানে কানে বলিতেছে, "মিঞা ভাই! পানি পানি করিয়া আমি মরিয়াছি। তুমি এমন কাজ করিও, আমার মত আর কাউকে যেন এমনি পানি পানি কইরা মরতি না হয়।"

মনে মনে বছির আবার প্রতিজ্ঞা করিল, "সোনা বইন! তুমি ঘুমাও! আমি জাগিয়া রহিব। যতদিন না আমি তোমার মত সকল ভাই-বোনের দুঃখ দূর করিতে পারি ততদিন জাগিয়া থাকিব। দুঃখের অনল দাহনে নিজের সকল শান্তি সকল আরাম-আয়াস তিলে তিলে দান করিব। সোনা বইন! তুমি ঘুমাও–ঘুমাও!"

ভাবিতে ভাবিতে বছির উঠিয়া দাঁড়াইল। ফুলীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। ফুলী ভাবিয়াছিল, বছির ভাইকে সে সঙ্গে লইয়া বনের ধারে ডুমকুর ফল টুকাইবে। সে নিজে পাকা ডুমকুরের এক গাছ মালা গাথিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিবে। সেই মালা পাইয়া তাহাকে সুখী করিবার জন্য বছির গাছে উঠিয়া তাহার জন্য কানাই লাঠি পাড়িয়া দিবে। কিন্তু বছিরের মুখের দিকে চাহিয়া সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে বাড়ি

পৌঁছিয়া বছির তাহার বই-পুস্তক লইয়া বসিল। ফুলী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছে কিন্তু বছির একদিনও তার বই-পুস্তক ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইল না। শহরে থাকিতে সে কত জল্পনা-কল্পনা করিয়াছ! দেশে যাইয়া এবার সে সজারুর কাটা টুকাইতে গভীর জঙ্গলে যাইবে। ঘন বেতের ঝোঁপের ভিতর হইতে বেথুন তুলিয়া আনিবে। তল্লা বাঁশের বাঁশী বানাইয়া পাড়া ভরিয়া বাজাইবে। বাঁশের কচি পাতা দিয়া নথ গড়িয়া ফুলীকে নাকে পরিতে বলিবে, কিন্তু ছুটির কয় দিন সে তার বই-পুস্তক ছাড়িয়া একবারও উঠিল না। সন্ধ্যা হইলে সামনের মাঠে যাইয়া বসে। তখনও পাঠ্যবই তার কোলের উপর।

ফুলী কতবার আসিয়া ঘুরিয়া যায়। ডুমকুর গাছ ভরিয়া কাটা। সেই কাটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফুলী পাকা ডুমকুর তুলিয়া মালা গাঁথে। তারপর মালা লইয়া বছিরের সামনে আসিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। বছির একবারও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহে না। বহুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় বছিরের মা ডাকে, "ও ফুলী। এহনি যে চললি? আয়, তোর মাথার চুল বাইন্দা দেই।"

ফুলী ফিরিয়া চাহিয়া বলে, "না চাচী! আমার চুল বান্ধন লাগবি না। বাড়িতি আমার কত কাম পইড়া আছে। মা যেন আমারে কত গাইল-মন্দ করত্যাছে! আমি এহন যাই।"

যাইতে যাইতে সেই ডুমকুর গাছটির তলায় যাইয়া ফুলী সদ্য গাথা মালাগাছটিকে ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করে। তারপর কোন সাত সাগরের পানি আসিয়া তার দুই চক্ষে ঢলিয়া পড়ে। অতটুকু মেয়ে। কি তার মনের ভাব কে বলিতে পারে!

.

৩২.

বাড়ি হইতে শহরে আসিয়া বছির অনেক খবর পাইল, কমিরদ্দী সরদারের নামে জমিদার খাজনার নালিশ করিয়াছেন। তা ছাড়া সেদিনের মারামারি উপলক্ষ করিয়া থানার পুলিশ তাহাকে ও তাহার ছেলেকে গ্রেফতার করিয়াছে। এইসব মামলার তদবির-তালাশী করিতে কমিরদ্দী সরদারকে তার এত সখের দৌড়ের নৌকাখানা অতি অল্প টাকায় বিক্রী করিতে হইয়াছে। কারণ আশে পাশের গ্রামগুলিতে উকিল সাহেবের লোকেরা প্রচার করিয়া দিয়াছেন, মুসলমান হইয়া যাহারা নৌকা বাইচ খেলাইবে তাহারা দোজখে যাইয়া জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিবে, আর তাহাদিগকে একঘরে করিয়া রাখা হইবে। সুতরাং মুসলমান হইয়া কে সেই বাইচের নৌকা কিনিবে? সাদীপুরের এছেম বেপারী মাত্র ষাট টাকা দিয়া এত বড় নৌকাখানা কিনিয়া সেই নৌকা লইয়া এখন পাটের ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামের লোকেরা এখন আর কমিরদ্দী সরদারের কথায় ওঠে বসে না। তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া একে অপরের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামে ঝগড়া মারামারি লাগিয়াই আছে। আজ উহার পাটের খেত ভাঙিয়া আর একজন ধান বুনিয়া যাইতেছে। কেহ লাঙল বাহিবার সময় পার্শ্ববর্তী লোকের জমির কিছুটা লাঙলের খোঁচায় ভাঙিয়া লইতেছে। এইসব উপলক্ষে বহুলোক রমিজদ্দীন সাহেবের বাসায় যাইয়া মামলা

দায়ের করিতেছে। উকিল সাহেবের পশার এত বাড়িয়াছে যে এখন আর তিনি গ্রাম-দেশে নিজে যাইয়া বক্তৃতা করিবার অবসর পান না। আঞ্জুমাননে ইসলামের মৌলবী সাহেবরা এ-গ্রামে সে-গ্রামে যাইয়া যথারীতি বক্তৃতা করেন। মাঝে মাঝে উকিল সাহেব আঞ্জুমানে ইসলামের জমাত আহ্বান করেন। গ্রামের লোকদের নিকট হইতে চাদা তুলিয়া সেই টাকায়। কলিকাতা হইতে বক্তা আনাইয়া বক্তৃতা করান। চারিদিকে উকিল সাহেবের জয় জয়কার পড়িয়া যায়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকসনে উকিল সাহেব বহু ভোট পাইয়া মনোনীত হইয়াছেন। উকিল সাহেবের বাসায় লোকজনের আরও ভীড়।

এইসব গণ্ডগোলে বছিরের পড়াশুনার আরও ব্যাঘাত হইতে লাগিল। রাস্তার লাইট পোস্টের সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়াশুনা করিতে রাত্র জাগিয়া তাহার শরীর আরও খারাপ হইয়া পড়িল।

এক শনিবার বছির বাড়ি যাওয়ার নাম করিয়া সন্ধ্যাবেলা আরজান ফকিরের বাড়ি যাইয়া উপস্থিত হইল। ফকির তাহাকে সস্নেহে ধরিয়া একটি মোড়ার উপর আনিয়া বসাইল। ফকিরের বউ আসিয়া আঁচল দিয়া তাহার মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, “আমার বাজান বুঝি তার ম্যায়ারে দেখপার আইছে? ও বাজান! এতদিন আস নাই ক্যান?”

এই মেয়েটির কথায় যেন স্নেহের শতধারা বহিয়া যাইতেছে। তাহার মা বড়ই লাজুক। ছেলেকে আড়াল-আবডাল হইতে ভালবাসে। এই মেয়েটির মত এমন মিষ্টি করিয়া কথা বলিতে পারে না। আজ এমন স্নেহ-মমতার কথা শুনিয়া বছিরের চোখ হইতে পানি গড়াইয়া পড়িতে চাহে।

ফকির বলিল, “বাজানরে ক্যাবল মিঠা মিঠা কতা শুনাইলিই চলবি না। এত দূরের পথ হাঁইটা আইছে। কিছু খাওনের বন্দোবস্ত কর।”

“তাই ত! আমার ত মনেই পড়ে নাই। বাজান! তুমি বইয়া ফকিরের লগে কথা কও। আমি আইত্যাছি!”

তাড়াতাড়ি ফকিরের বউ এক বদনা পানি আনিয়া দিল হাত পা ধুইতে। তারপর সাজিতে করিয়া কিছু মুড়ি আর একটু গুড় আনিয়া বলিল, “বাজান খাও।” যতক্ষণ বছির খাইল ফকিরের বউ এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুন্দর শ্যামল মুখোনি বছিরের। কচি ধানপাতার সমস্ত মমতা কে যেন সেখানে মাখাইয়া দিয়াছে। ফকিরের সন্তান হয় নাই। কিন্তু এই কিশোর বালকটিকে ঘিরিয়া কোন স্নেহের শতধারায় যেন তার সমস্ত অন্তর ভরিয়া যাইতেছে। ঘরে ত বিশেষ কিছু খাবার নাই। সামান্য কিছু আতপ চাউল আর গুড় যদি থাকিত, তবে সে মনের মত করিয়া কত রকমের পিঠা তৈরী করিয়া এই কিশোর-দেবতাটির ভোগ দিত। টাটকা মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে বছিরের মুখে যে শব্দ হইতেছিল; একান্তে বসিয়া ফকির-বউ সেই শব্দ শুনিতে লাগিল। ফকিরের সারিন্দা বাজানও বুঝি কোনদিন তার কাছে এমন মিষ্টি লাগে নাই।

খাওয়া শেষ হইলে ফকিরের বউ বলিল, “বাজান! তোমারে কিবা খাওয়াইমু। যার লগে আমারে বিয়া দিছিলা হে আমারে বালুর চরায় ঘর বাইন্দ্যা দিছে। একটা ঢেউ আইসাই ঘর ভাইঙ্গা যাবি। কি ঠগের লগেই আমারে জুইড়া দিছিলা, শিশিরের গয়না দিল গায়–না দেখতেই সে গয়না উইবা গেল। কুয়াশার শাড়ী আইন্যা পরাইল, গায়ে না জড়াইতেই তা বাতাসে উড়ায়া নিল। শুধু সিন্তার সিন্দুরখানিই কপাল ভইরা আগুন জ্বাইলা রইল।”

এই বলিয়া ফকির-বউ গান রিল। ফকিরও সারিন্দা বাজাইয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল।

কে যাসরে রঙিলা নার মাঝি!
সামের আকাশরে দিয়া,
আমার বাজানরে কইও খবর,
নাইওরের লাগিয়ারে।
গলুইতে লিখিলাম লিখন সিস্তার সিন্দুর দিয়া,
আমার বাপের দেশে দিয়া আইস গিয়া

–রে রঙিলা নার মাঝি!
আমার বুকের নিশ্বাস পালে নাও ভরিয়া,
ছয় মাসের পন্থ যাইবা ছয় দণ্ডে চলিয়া,

–রে রঙিলা নার মাঝি!

গান গাহিতে গাহিতে ফকির আর ফকিরনী কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল। মাঝে মাঝে গান থামাইয়া ফকির সারিন্দা বাজাইতেছিল আর ফকিরনী চোখের পানি ফেলিতেছিল।

পরের ছেলের সঙ্গে বাজান আমায় দিলা বিয়া,
একদিনের তরে আমায় না দেখলা আসিয়া।

এই গান শেষ করিয়া ফকিরনী বলিল, "বাজান! একদিনও ত ম্যায়ারে দেখতি আইলা । আমি যে কত পন্থের দিকে চায়া থাহি।" ফকিরী-কথার যে অন্তনিহিত ভাব বছির তাহা বুঝিতে পারে না কিন্তু গানের সুরের কি এক মাদকতা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল।

বছিরকে কোলের কাছে বসাইয়া ফকিরনী আবার গান ধরিল,

ও তুমি আমারে বারায়া গেলারে
কানাই রাখাল ভাবে।
তোরো মা যে নন্দ রানী,
আজকে কেন্দে গোপাল পাগলিনীরে;
–কানাই রাখাল ভাবে।

এখন ক্ষুধার হয়েছেরে বেলা,
তুমি ভেঙে আইস গোঠের খেলারে;
–কানাই রাখাল ভাবে।

কতদিন যে নাহি শুনি।
তোরো মুখে মা বোল ধ্বনিরে,
–কানাই রাখাল ভাবে।

এই গানের পিছনে হয়ত কত গভীর কথা লুকাইয়া আছে তাহা বছির বুঝিতে পারে না। কিন্তু গানের সুরে সুরে এই পুত্র-হীনা মেয়েটির সমস্ত অন্তর স্নেহের শতধারা হইয়া তাহার দেহে-মনে বর্ষিত হইতেছে তাহা যেন আবছা আবছা সে বুঝিতে পারে।

গান শেষ করিয়া ফকিরনী বলিল, “বাজান! আইজ তুমি আমাগো এহানে বেড়াও। রাত্তিরে আরও অনেক লোক আসপ্যানে। তোমারে পরান বইরা গান শুনাবানে।”

ফকিরনীর কথায় এমন মধুঢ়ালা যে বছির না বলিতে পারিল না। ফকির তার সারিন্দায়। নতুন তার লাগাইতে বসিল। বছির উঠানে দাঁড়াইয়া এ-দিক ওদিক দেখিতে লাগিল। ছোট্ট একখানা বাকা দুইচালা ঘর ফকিরের। তার সঙ্গে একটি বারান্দা। সেখানে সাত আটজন লোক বসিতে পারে। সামনে ছোট্ট উঠানখানা সুনিপূণ করিয়া লেপা-পোছা। তারই পাশে লাউ কুমড়ার জাঙলা। কত লাউ ধরিয়াছে। ওধারে জাঙলা ভরিয়া কনে-সাজানী শিমলতা লালে-নীলে মেশা রঙে যেন সমস্ত উঠানখানি আলো করিয়া আছে। ওধারে শিমূল গাছে কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। গাছের ডালে ডালে কুটুম পাখি, বউ কথা কও পাখি, ডাকিয়া ডাকিয়া এইসব ফুলের রঙ যেন গানের সুরে ভরিয়া মহাশূন্যের উপর নক্সা আঁকিতেছে। বাড়ির সামনে দিয়া গ্রাম্য-হালটের পথ দূরের মাঠ পার হইয়া আকাশের কোলে কালো কাজল রেখা আঁকা অজানা কোন গ্রামে মিশিয়া কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। কেউ পথের উপর এখানে সেখানে গরুর পাল লইয়া রাখাল ছেলেরা নানারূপ শব্দ করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। কোন কোন রাখাল গ্রাম্য-যাত্রায় গাওয়া কোন বিলম্বিত লয়ের গানের একটি কলি বার বার গাহিয়া গোধূলীর উদাস মেঘেভরা সমস্ত আকাশখানিকে আরও উদাস করিয়া দিতেছে। গরুর পায়ের খুরের শব্দ সেই গানের সঙ্গে যেন তাল মিলাইতেছে। পিছনে যে ধূলী উড়িয়া বাতাসে ভাসিতেছে তাহার উপরে সন্ধ্যার রঙ পড়িয়া কি এক উদাস ভাব মনে জাগাইয়া দিতেছে। বছির মনে মনে ভাবে, ফকিরের এই গ্রামখানার মাঠ, ঘাট, পথে, বাড়ি-ঘর, ফুল-ফলের গাছ সকলে মিলিয়া যেন বৃহত্তর একটি সারিন্দা-যন্ত্র। এই যন্ত্র সকালে বিকালে রাত্রে প্রভাতে

এক এক সময় এক এক সুরে বাজিয়া সমস্ত গ্রামের মর্মকথাটি যেন আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দেয়। তারই ক্ষুদ্র প্রতীক করিয়া গ্রাম্য-ফকির তাহার সারিন্দাটি গড়িয়া লইয়াছে। তাহার সুরের মধ্যেও গ্রামের প্রাণ-স্পন্দন শোনা যায়।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার করিয়া রাত্র আসিল। কোন্ গ্রাম্য-চাষীর মেয়েটি যেন আকাশের নীল কথাখানার উপর একটি একটি করিয়া তারার ফুল বুনট করিয়া তুলিতেছিল। তাহারই নকল করিয়া সমস্ত গ্রামের অন্ধকার কথাখানার উপর একটি একটি করিয়া সান্ধ্য প্রদীপের নক্সা বুনট হইতেছিল। ছোট্ট ছেলে বছির। অত শত ভাবিতে পারিল কিনা জানি না। কিন্তু বাহিরের এই সুন্দর প্রকৃতি তার অবচেতন মনে কি এক প্রভাব বিস্তার করিয়া রাত্রের গানের আসরের জন্য তাহার অন্তরে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করিতেছিল। উদাস নয়নে বছির বাহিরের আকাশের পানে বহুক্ষণ চাহিয়াছিল। ফকিরনীর গান শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল।

ক্ষুধার হয়েছে বেলা
এখন ভাইঙ্গা আইস গোঠের খেলারে

–কানাই রাখাল ভাবে।

"আমার গোপাল! মুখোনি খিদায় মৈলাম হয়া গ্যাছে। বাজান! চল খাইবার দেই।" আঁচল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ফকিরনী বছিরকে ঘরে লইয়া গেল। মাটির সানকীতে করিয়া ভাত আর লাউ শাক। পাতের এক পাশে দুইটা কুমড়াফুল ভাজা। এই সামান্য খাবার।

ফকিরনী বলে, "বাজান! আর কি খাইওয়াবো তোমারে। আমাদের গোপালের ভোগে এই। শাক আর ভাত!"

বছির আস্তে আস্তে খায়। ফকিরনী পুত্র-স্নেহের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বছিরের খাওয়া যখন শেষ হইয়াছে, ফকিরনী গান ধরিল–

কি দিয়ে ভজিব তোর রাঙা পায়,
আমার মনে বড় ভয় দয়ালরে।

গানের সুর শুনিয়া ফকির তাহার সারিন্দা বাজাইয়া ফকিরনীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইল। ফকিরনী গাহিতে লাগিল,

দুগ্ধ দিয়া ভজিব তোরে
সেও দুধ বাছুরিতি খায়।
চিনি দিয়া ভজিব তোরে
সে চিনি পিঁপড়ায় লইয়া যায়।
কলা দিয়া ভজিব তোরে
সেও কলা বাদুরিতি খায়।
মন দিয়া ভজিব তোরে
সেও মন অন্য পথে ধায়।

দয়ালরে–
আমি কি দিয়া ভজিব তোর রাঙা পায়!

ফকিরনীর এই রকম ভাব-সাব দেখিয়া বছিরের বড়ই লজ্জা করে। সে বুঝিতে পারে না, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া তাহারা এরূপ করে কেন? ফকিরনী নিজে বছিরের হাতমুখ ধোয়াইয়া আঁচল দিয়া তাহার মুখ মুছিয়া দিল। তারপর তাহারা দুইজনে খাইতে বসিল।

ইতিমধ্যে ও-পাড়া হইতে ফকিরের দুই তিনজন শিষ্য আসিল, সে-পাড়া হইতে জয়দেব বৈরাগী তাহার বৈষ্টমীকে সঙ্গে করিয়া আসিল। জয়দেবের কাঁধে একটি দোতারা। সে আসিয়াই দোতারায় তার যোজনা করিতে লাগিল। ফকির হাতমুখ ধুইয়া তাহার সারিন্দা লইয়া বসিল। সারিন্দার তারগুলি টানিয়া ঠিক করিতে করিতে তাহার শিষ্যদিগকে বলিল, “আইজ আমার শ্বশুর আইছে গান হুনবার। তোমরা বাল কইরা গীদ গাইও।”

জয়দেব বছিরের লাবণ্য ভরা শ্যামল মুখোনির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “আপনার শ্বশুর কিন্তু আমার কাছে আমার কেষ্ট ঠাকুর। আইজ বৃন্দাবন ছাইড়া আইছে। আমাগো বজ্রবাসীগো অবস্থা দেখপার জন্যি। দেখছেন না, কেমন টানা টানা চোখ ঠাকুরের। আর গায়ের রূপে যেন তমাল লতার বন্নক। এবার হাতে একটা মোহন বাঁশী থাকলেই একেবারে সাক্ষাৎ কেষ্ট ঠাকুর হৈত! মানুষের মধ্যেই ত রূপে রূপে বিরাজ করেন তিনি। যারে দেইখ্যা বাল লাগে তারির মদ্দিই ত আইসা বিরাজ করেন ঠাকুর।”

ফকির বলিল, “এবার তবে আমার শ্বশুরকে গান শুনাই।” প্রথমে বন্দনা গান গাহিয়া ফকির গান ধরিল,

কে মারিল ভাবের গুলি
আমার অন্তর মাঝারে,

এমন গুলি মাইরা চইলা গ্যাল
একবার দেখল না নজর করে।
জগাই বলে ওরে মাধাই ভাই!
শিকার খেলিতে আইছে গয়ুর নিতাই;
আমার এত সাধের পোষা পাখি
নিয়া গ্যাল হরণ করে।

গান গাহিতে গাহিতে ফকির আর গাহিতে পারে না। হাতের সারিন্দা রাখিয়া অঝোরে কান্না করে। সঙ্গের শিষ্যেরা একই পদ বার বার করিয়া গাহে,

জগাই বলে ওরে মাধাই ভাই!
শিকার খেলিতে আইছে গয়ূর নিতাই;
আমার এত সাধের পোষা পাখি
নিয়া গ্যাল হরণ করে।

তারপর ফকির গান ধরিল,

ও দীন বন্ধুরে
আমি ভাবছিলাম আনন্দে যাবে দিন।
বাল্যকাল গ্যাল ধূলায় খেলায়
আমার যৈবুন গ্যাল হেলায় ফেলায়,
এই বৃদ্ধকালে ভাঙল দিনের খেলারে।

জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরি,
আমি আইলা ক্যাশ নাহি বান্দি হে;
আমি তোরো জন্যে হইলাম পাগলিনীরে।
শুনেছি তোর মহিমা বড়,
তুমি পাতকী তরাইতে পার হে;
আমার মতন পাতক কেবা আছে ভবেরে।

এই গান শেষ করিয়া ফকির আরও কতকগুলি গান গাহিল।

আমার ফকিরের বাড়ি নদীর ওপারে। এ-পারে বসিয়া আমি তাহার জন্য কান্দিয়া মরি। হাতে আসা বগলে কোরান সোনার খড়ম পায়ে দিয়া আমার ফকির হাঁটিয়া হাঁটিয়া যায়–তার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। সকলে বলে আমার দয়াল কেমন জনা। আন্ধার ঘরে যেমন কাঞ্চা সোনা জ্বলে, কাজলের রেখার উপর যেমন চন্দনের ছটা, কালিয়া মেঘের আড়ে যেমন বিজলির হাসি তেমনি আমার দয়াল চান। তার তালাশে আমি কোন দেশে যাইব?

চাতক হইয়া আমি মেঘের দিকে চাহিয়া থাকি। মেঘ অন্য দেশে ভাসিয়া যায়। আশা করিয়া আমি বাসা বাধিলাম। আমার আশা বৃক্ষের ডাল ভাঙিয়া গেল।

গান গাহিতে গাহিতে ফকির আর গাহিতে পারে না। তাহার সমস্ত অঙ্গ কি এক ভাবাবেশে দুলিতে থাকে। জয়দেব বৈরাগী তখন গান ধরিল,–

আমি বড় আশা কইরা দয়াল ডাকিরে তোরে,
আমি বড় আফসোস কইরা দয়াল ডাকিরে তোরে।

হাপন যদি বাপ মা হইতারে দয়াল চান!
ও লইতা ধূল ঝাইড়া কোলেরে।
কোলের ছেলে দূরে না ফেইলারে দয়াল চান!
তুমি রইলা কোন দ্যাশেরে।
যেনা দেশে যাইবা তুমিরে দয়াল চান!
আমি সেই দেশে যাবরে।
চরণের নূপুর হয়ারে দয়াল চান!
ও তোমার চরণে বাজিবরে।

গান শেষ হইতে পূর্ব আকাশের কিনারায় শুকতারা দেখা দিল। ফকিরেরা গান থামাইয়া যার যার বাড়ি চলিয়া গেল। কেহ কাহারও সঙ্গে একটি কথাও বলিল না। গানের আসরে কি এক মহাবস্তু যেন তাহারা আজ পাইয়াছে। সকলেরই হৃদয় সেই গানের আবেশে ভরপুর।

ফকিরনী নিজের বিছানার এক পাশ দেখাইয়া বছিরকে বলিল, “বাজান! আইস শুইয়া পড়।” বছির শুইলে ফকিরনী তাহার গায়ে বাতাস করিতে লাগিল। একহাতে মাথার চুলগুলি বিলি দিতে লাগিল। শুইয়া শুইয়া বছিরের কিন্তু ঘুম আসিল না।

দূরবর্তী চরের কৃষাণ কুটিরগুলি হইতে ঢেঁকি পারের শব্দ আসিতে লাগিল। চাষী-মেয়েরা শেষ রাত্রিতে উঠিয়া ধান ভানিতেছে। শেষ রাতের শীতল বাতাসে ঢেকি পারাইতে তত হয়রান হইতে হয় না। কত রকম সুরেই যে মোরগ ডাকিতে লাগিল। চাষীরা এখনই উঠিয়া মাঠে লাঙল দিতে চলিয়াছে! তাহাদের গরু তাড়াইবার শব্দ কানে আসিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের পাখিগুলি গাছের ডালে জাগিয়া উঠিল। নদী-তীর হইতে চখা-চখী ডাকিতে লাগিল। সে কি মধুর সুর! সমস্ত বালুচরের মনের কথা যেন তাহারা সুরে সুরে ছড়াইয়া দিতেছে।

মাঝে মাঝে এক ঝাক বেলে হাঁস আকাশে উড়িয়া কখনো অর্ধ গোলাকার হইয়া কখনো লম্বা ফুলের মালার মত হইয়া দূর শূন্য পথে ঘুরিতেছিল। ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া বছির দেখিতেছিল।

ফর্সা হইয়া যখন সকাল হইল বছির উঠিয়া বসিল। ফকিরনী বছিরের হাতমুখ ধোওয়াইয়া তাহাকে সামান্যকটি ভিজানো ছোলা আনিয়া খাইতে দিল।

বিদায়ের সময় ফকিরনী বলিল, "বাজান! ম্যায়ারে দেখপার জন্যি কিন্তুক আইস। আমি পথের দিগে চায়া থাকপ।"

যতক্ষণ বছিরকে দেখা গেল ফকিরনী ঘরের বেড়া ধরিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে যখন দূরের ঝাউ গাছটির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। আহা! এই শ্যামল রঙের ছেলেটিকে সে কোন মায়ার পাশে বাঁধিবে? আর কি সে আসিবে? তারই গায়ের রঙ মাখিয়া দুরের শস্য খেতগুলি যেন মায়ায় দুলিতেছে। আকাশের কিনারায় দূরের মেঘগুলি যেন তারই ছায়া গায়ে মাখিয়া ওমন পেলব হইয়াছে। গোপাল–আমার গোপাল–আমি যে তোর মা যশোদা! গোঠের খেলা ভঙ্গ করিয়া তুই আমার বুকে আয়!

.

৩৩.

সেদিন বছির টিনের থালায় করিয়া এক গ্লাস ভাত মুখে দিয়া আর এক গ্লাস হাতে লইয়াছে। এমন সময় উকিল সাহেব তাহার সামনে আসিয়া বলিলেন, “খবর পেলাম, তুমি আরজান ফকিরের বাড়ি যেয়ে একরাত কাটিয়ে এসেছ। আমরা তাকে একঘরে করেছি। তার বাড়িতে যেয়ে তুমি ভাত খেয়েছ। আমার এখানে আর তোমার থাকা হবে না। বই-পত্র নিয়ে শিল্পীর সরে পড়। তোমার মুখ দেখলে আমার গা জ্বালা করে।” এই বলিয়া উকিল সাহেব অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

বছিরের হাতের ভাত হাতেই রহিল। হতভম্বের মত সে বসিয়া রহিল। কখন যেন হাতের ভাত থালায় পড়িয়া গেল সে টেরও পাইল না। টিনের থালাখানা হাতে করিয়া বছির বাহিরে আসিয়া ভাতগুলি ফেলিয়া দিল। কতকগুলি কাক আসিয়া সেই ভাত খাইতে খাইতে ছিটাইয়া একাকার করিল। তেমনি করিয়া তাহার বালক-জীবনের স্বপ্নখানিকেও কে। যেন দু’পায়ে দলিয়া-পিষিয়া টুকরো টুকরো করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিল।

এখন বছির কোথায় যাইবে! কোথায় যাইয়া আশ্রয় পাইবে? বই-পুস্তক নিজের লুঙ্গিখানায় বাধিয়া বছির পথে বাহির হইল। আজ আর স্কুলে যাওয়া হইবে না।

শহরের মসজিদে কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্র থাকিত। সেখানে মজিদ নামে একটি ছেলের সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছিল। সে মসজিদে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। ছুটির সময় গ্রামে গ্রামে লোকজনের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিত। তাই দিয়া শহরের হোটেলে একপেটা

আধপেটা খাইয়া কোন রকমে তাহার পড়াশুনা চালাইত। তাহার সঙ্গে আরও যে চার পাঁচটি ছাত্র থাকিত তাহারাও এইভাবে তাহাদের পড়াশুনার খরচ চালাইত।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বছির মজিদের আস্তানায় আসিয়া উঠিল। মজিদ অতি সমাদর করিয়া চৌকির উপর তাহার ময়লা লুঙ্গিখানা বিছাইয়া বছিরকে বসিতে দিল। সমস্ত শুনিয়া মজিদ বলিল, "ভাই! আল্লার ওয়াস্তে তুমি আমার মেহমান হয়া আইছ। তোমার কুনু চিন্তা নাই। আমি তোমারে আশ্রয় দিলাম।"

বছির বলিল, "ভাই! তুমি নিজেই পেট ভরিয়া খাইবার পাও না। তার উপরে আমারে খাওন দিবা কেমন কইরা?"

মজিদ বলিল, "ভাই! আমার কাছে আট আনার পয়সা আছে, চল এই দিয়া দুইজনে ভাত খায়া আসি। তারপর আর সব কথা শুনবানে।"

বছির জিজ্ঞাসা করিল, "এই আট আনা দিয়া তুমি আমারে খাওয়াইবা। কালকার খাওন কুথায় থনে অইব?"

উত্তরে মজিদ বলিল, "ভাইরে! আইজকার কথা বাইবাই বাঁচি না। কালকার কথা বাবলি ত আমরা গরীব আল্লার দইনা হইতে মুইছা যাইতাম। আমাগো কথা ঐল আইজ বাইচা থাহি। কাইলকার কথা কাইল বাবব। চল যাই, হৈটালত্যা খায়া আসি।"

সামনে হাফেজ মিঞার হোটেল। বাঁশের মাচার উপর হোগলা বিছানো। তার এখানে। সেখানে তরকারি পড়িয়া দাগ হইয়া আছে। রাশি রাশি মাছি ভন ভন করিয়া উড়িতেছে।

পিছনের নর্দমার সামনে একরাশ এঁটো থালা-বাসন পড়িয়া আছে। কতকগুলি ঘেয়ো কুকুর। সেখানে কাড়াকাড়ি করিয়া সেই ভুক্তাবশিষ্ট ভাতের উপর পড়িয়া কামড়া-কামড়ি করিতেছে। হোটেলওয়ালা আসিয়া সেই কুকুরগুলিকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে; আবার তাহারা আসিয়া যথাস্থান দখল করিতেছে।

বছিরকে সঙ্গে করিয়া মজিদ সেই মাচার উপর হোগলা বিছানায় আসিয়া বসিল। হোটেলের চাকর সেই এঁটো থালা বাসনগুলি হইতে চল্টা-ওঠা দু'খানা টিনের থালা সামান্য পানিতে ধুইয়া নোংরা একখানা কাপড় দিয়া মুছিয়া তাহাদের সামনে দিল। মজিদ বলে, "দুই থালায় তিন আনার করিয়া ভাত আর এক আনার করিয়া ডাল দাও!" শুনিয়া হোটেলওয়ালা হাফেজ মিঞা বলিল, "মিঞা! রোজই শুধু ডাল ভাত চাও? আমার তরকারি বেচপ কার কাছে! আইজকার মত দিলাম, কিন্তুক আর পাইবা না। ভাত বিক্রী হয়া যায়, তরকারি পইড়া থাহে।"

মজিদ কথার উত্তর না দিয়া সেই ডাল-ভাত মাখাইয়া দুইজনে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে মজিদ চাকরটাকে বলিল, "বাই ত বাল, দুইডা কাঁচা মরিচ আর দুইডা পেঁয়াজ আইনা দাও।" চাকর তাহাই আনিয়া দিল। হাফেজ মিঞা তাহার দিকে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিল। অল্প এতটুকু ডালে অর্ধেক ভাতও খাওয়া হইল না। মজিদ হোটেল-ওয়ালাকে বলিল, "হাফেজসাব! আজই এক ছিপারা কোরান শরীফ পইড়া আপনার মা-বাপের নামে বকশায়া দিবানি। আমাগো একটু মাছের ঝোল দেওনের হুকুম করেন।

হোটেলওয়ালা বলিল, "অত বকশানের কাম নাই। পয়সা আছে যে মাছের ঝোল দিব?"

মজিদ বলিল, “আমরা তালেম-এলেম মানুষ। আমাগো দিলি আল্লা আপনাগো বরকত। দিব। না দিলি আল্লা বেজার হবেন।”

হোটেলওয়ালা মনে মনে ভাবিল, না যদি দেই তবে হয়ত ইহারা অভিসম্পাত দিবে। শত হইলেও তালেম–এলেম! ইহাদের কথা আল্লা শোনে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে দুই চামচ মাছের ঝোল তাহাদের পাতে ঢালিয়া দিল।

খাইয়া লইয়া হোটেলওয়ালারে ভাতের দাম দিয়া তাহারা আবার সেই মসজিদের ঘরে আসিয়া বসিল! স্কুলের ঘন্টা কখন পড়িয়া গিয়াছে। তবু বছির বই-পত্র লইয়া স্কুলের পথে রওয়ানা হইল।

বিকালে স্কুলের ছুটির পর সে মজিদের আস্তানায় ফিরিয়া আসিল। তখন মাদ্রাসার আর আর ছেলেরাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মজিদ তাহাদের কাছে বছিরকে পরিচিত করাইয়া দিল। যাহারা সব সময় অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে তাহারাই অভাবী লোকের দুঃখ সকলের আগে বুঝিতে পারে। মাদ্রাসার ছেলেরা সকলেই বছিরকে আপনজনের মত গ্রহণ করিল।

কথায় কথায় তাহারা আলাপ করিতে লাগিল, আজ বিকালে তাহারা কোথায় খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে? ছাত্রদের মধ্যে করিম একটি রোগা-পটকা ছেলে। পড়াশুনা বিশেষ কিছুই করে না কিন্তু কোথায় কাহার বাড়ি ফাতেহা হইবে, কোথায় বিবাহ উপলক্ষে ভোজের ব্যবস্থা হইবে, তার সমস্ত খবর সে সংগ্রহ করিয়া আনে। সেই জন্য সঙ্গী-সাথীরা তাহাকে

বড়ই ভালবাসে। মজিদ করিমকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “করিম ভাই! বল ত আজ তুমি আমাগো জন্যি কুন জায়গায় দাওয়াতের বন্দোবস্ত করছাও?”

করিম বলিল, “চিন্তা কইর না বাই! আজ খান বাহাদুর সায়েবের মায়ের ফাতেহা। এহনই চল! খতম পড়তি অবি। যার যার ছিপারা লয়া চল।”

বছির মজিদের কানে কানে বলিল, “আমি যে বাল আরবী পড়তি জানি না।”

মজিদ বলিল, “আমরাই কি বাল মত জানি বাই? তোমারে একখান ছিপারা দিব। আমাগো মতন দুইলা দুইলা পড়ার অভিনয় করবা। কেউ টের পাবি না।”

ইতিমধ্যে হোটেলে যাইয়া যে ভাবে মজিদ মাছের ঝোল চাহিয়া লইয়াছে তাহা বছিরের মনঃপুত হয় নাই। এখন আবার আল্লার কোরান শরীফ লইয়া পড়ার অভিনয় করিতে তাহার কিছুতেই মন উঠিতেছিল না।

সে মজিদকে বলিল, “ভাই! তোমরা সগলে যাও। সকালে আমি এত খাইছি যে আমার মোটেই ক্ষিধা নাই। তাছাড়া আল্লার কালাম লয়া মিথ্যা অভিনয় করবার পারব না।”

মজিদ বলিল, “ভাই বছির! আল্লার দইনায় কোন সত্য আর কোন মিথ্যা কওন বড় মুস্কিল! আমরা যে এমন কইরা আধ পেটা খায়া আল্লার কালাম পড়তাছি আর খান বাহাদুর সাবরা কতক খায় কতক ফেলায়া দ্যায়। একবারও আল্লার নাম মুহি আনে না! এডাই কি আল্লার হুকুম? আমরা বইসা বইসা কোরান শরীফ পড়ব আর তার ছওয়াব পাইব খান বাহাদুর সাবের মরা মা, এডাই কি সত্য! বাইরে! আমাগো বাইচা থাকার চায়া

সত্য আর দুইনায় নাই। অতসব ভাবতি ঐলি আর লেহা পড়া করতি অবি ন্যা। বাড়ি যায় লাঙল ঠেলতি অবি।” এই বলিয়া বছিরকে টানিয়া লইয়াই তাহারা খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ি রওয়ানা হইল।

পরদিন সকালে বছির তার বই-পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিল! খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ি যাইয়া রাতের খাওয়া ত তাহারা খাইয়াই আসিয়াছে। তাহার উপরে এক একজন পঁচ সিকা করিয়া পাইয়াছে। সুতরাং দুইদিনের জন্য আর তাহাদিগকে ভাবিতে হইবে না।

পরদিন সকালে মসজিদের বারান্দায় আরও অনেকগুলি নূতন তালেব-এলেম আসিয়া যার যার কেতাব সামনে করিয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য মজিদ ও তার বন্ধুরা আসিয়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। সকলে সুর করিয়া যখন পড়িতেছিল দূর হইতে মনে হইতেছিল, মসজিদে যেন হাট বসিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ইমাম সাহেব। আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া সকল ছাত্র দাঁড়াইয়া সিলামালকি দিল। তিনিও যথারীতি উত্তর প্রদান করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দুইজন ছাত্র তাড়াতাড়ি যাইয়া ইমাম সাহেবকে বাতাস করিতে লাগিল। ইহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। তাহাতেই যেন তাহারা কৃতার্থ হইয়া আরও জোরে জোরে পাখা চালাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইমাম সাহেব বয়স্ক তিন চারটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাগো পড়া ওইছে?” তাহারা এক বাক্যে বলিল, “ওইছে মাওলানাসাব।”

তাহারা আসিয়া ইমাম সাহেবের সামনে দাঁড়াইল! তিনি তাহাদের বলিলেন, "পড়।" তোতা পাখির মত তাহারা একে একে যার যার পড়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে আর আর ছাত্রেরা ভীষণ শব্দ করিয়া পড়িতেছিল। তাহাদের গণ্ডগোলে এই ছাত্র কয়টি কি পড়া দিল ইমাম সাহেব তাহা শুনিতেও পাইলেন না। তিনি কেতাব দেখিয়া তাহাদিগকে। নূতন পড়া দেখাইয়া অপর একদল তালেব-এলেমকে ডাক দিলেন। এইভাবে সকল ছাত্রের। পড়া লইতে প্রায় ঘন্টা দুই কাটিয়া গেল। তখন ইমাম সাহেব তাহাদিগকে ছুটি দিলেন। তাহারা কলরব করিয়া যার যার বাড়ি চলিয়া গেল। বছির এক কোণে বসিয়া তাহার দিনের পড়া তৈরী করিতে লাগিল।

মসজিদে আসিয়া বছিরের পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সে মসজিদের ছাত্রদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিল। তাহারা প্রায় সকলেই এই জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়াছে। মাওলানা সাহেবেরা ওয়াজ করিয়া তাহাদের অভিভাবকদের বুঝাইয়াছেন, যে পিতা-মাতা তাহার সন্তানদিগকে ইসলামী শিক্ষার জন্য এই ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় পাঠাইবেন আল্লা রোজ হাশরের আজাবের সময় তাহার মাথায় একটি ছত্র ধরিবেন। যে বাড়িতে একজন মাদ্রাসার ছাত্র পড়ে সে বাড়িতে আল্লার বেহেশত নামিয়া আসে। আলেম লোকদের চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত বেহেশতে যায়। যখন একটি ছাত্র। প্রথম দিন মাদ্রাসার সিঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার মৃত মুরুব্বীরা দোয়া দরূদ পড়িতে পড়িতে বলেন, "এই যে আমাগো আওলাদ আইজ মাদ্রাসায় পড়তি আইল, তার যবান হইতে যখন আল্লার কালাম বাহির হইবে তখন আমাগো সকল গোর আজাব কাটিয়া যাইবে।"

ইত্যাকার বক্তৃতা শুনিয়া সরল-প্রাণ গ্রামবাসীরা সস্তায় পরকালে এই সব সুযোগ-সুবিধা। পাইবার জন্য নিজ নিজ ছেলেদিগকে মসজিদের ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় পাঠাইয়াছে। কোন। কোন ছাত্র সাত আট বৎসর ধরিয়া এই মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করিতেছে। এখন পর্যন্তও তাহারা আরবীর প্রথম ভাগ কেতাবখানাই পড়িয়া শেষ করিতে পারে নাই। মসজিদের ইমাম সাহেব হাফেজী পাশ। প্রথম শিক্ষার্থীদের আরবী অক্ষর ও ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কোনই পদ্ধতি তিনি জানেন না। জানিলেও তিনি তাহা প্রয়োগ করা প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ মাদ্রাসায় পড়িতে আসিয়া ছাত্রেরা কেহই বেতন দেয় না। দুই ঈদের ফেতরা এবং যাকাত আদায় করিয়া তিনি বৎসরে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পান। তা ছাড়া নিকটস্থ গ্রামগুলিতে কেহ মারা গেলে তাহার নামে কোরান শরীফ খতম করার জন্য মাঝে মাঝে তিনি দাওয়াত পান। তাহাতে মাসে পাঁচ সাত টাকার বেশী আয় হয় না। সুদূর নোয়াখালী জেলা হইতে তিনি আসিয়াছেন। দেশে বৃদ্ধ পিতা-মাতা। তাহারা একবেলা খায় ত আর একবেলা অনাহারে থাকে। কত করুণ করিয়া তাহারা মাঝে মাঝে পত্র লেখে। এই সামান্য আয়ের সবটাই তাহাকে দেশে পাঠাইতে হয়। স্ত্রীর একটি ছোট ছেলে হইয়াছে আজ ছয় মাস। টাকা পয়সার অভাবে এখনও ছেলেকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই।

ছাত্রেরা যখন ইমাম সাহেবকে ঘিরিয়া পড়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকে তখন তাহার মন উধাও হইয়া ছুটিয়া যায় সেই নোয়াখালী জেলায় একটি অখ্যাত গ্রামে।

যে চার পাঁচজন মসজিদে থাকিয়া পড়াশুনা করিত, অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের সঙ্গে বছিরের বড় ভাব হইয়া গেল। তাহারা প্রত্যেকেই কোরান শরীফে হাফেজ হইবার জন্য তৈরী হইতেছে। সকলেরই অবস্থা বছিরের মত। কিন্তু তাহার মত তাহারা কোন

প্রতিকূল অবস্থায় নিরাশ হইয়া পড়ে না। অভাব ত তাহাদের লাগিয়াই আছে। কিন্তু সেই অভাব হইতে মুক্ত হইবার কোন পথ তাহাদের জানা না থাকিলে সেই পথ তাহারা তৈরী। করিয়া লইতে পারে। তাই নিত্য-নূতন ফন্দিতে তাহাদিগকে জীবিকার সংস্থান করিতে হয়।

যেদিন করিম কোথাও কোন দাওয়াতের খোঁজ পায় না, সেদিন তাহারা দুই তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া শহর হইতে দুই তিন মাইল দূরের গ্রামগুলির বাড়ি বাড়ি যাইয়া কবর জেয়ারত করে। সুরেলা কণ্ঠে মোনাজাত করিয়া গৃহকর্তার মঙ্গল কামনা করে। তাহারা খুশী হইয়া সামান্য কিছু দান করে। রাত্র হইলে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেয়!

কোন কোনদিন তাহাদের একজন গ্রামে যাইয়া বলে, "মসজিদে ঘুমাইয়াছিলাম। আমার কোরান শরীফখানা চোরে লইয়া গিয়াছে। আজ কয়দিন কোরান শরীফ পড়িতে পারি নাই। আপনি যদি একখানা কোরান শরীফ কিনিয়া দেন আপনার নামে খতম পড়িয়া সমস্ত ছওয়াব বখশাইয়া দিব।"

গৃহস্বামী বলে, "আমরা নিজেই খাইতে পাই না। আপনার কোরান শরীফ কেনার পয়সা কোথায় পাইব?"

ছাত্রটি উত্তরে বলে, "মিঞা সাহেব! আধা পেটা খাইয়া ত প্রায়ই দিন কাটান। না হয় আরও দু'চারদিন কাটাইবেন, কিন্তু পরকালের এই নেকির কাজটি করিয়া রাখেন। রোজ হাশরের বিচারের দিন অনেক কাজ দিবে।" সরল গৃহবাসী তাহার কষ্টের সঞ্চয় হইতে সামান্য কিছু ছাত্রটির কোরান শরীফ কেনার জন্য দান করে।

এ সব কাজ বছিরের পছন্দ হয় না। সে মজিদের কাছে বার বার এর জন্য প্রতিবাদ করে। কিন্তু মজিদের সেই এক কথা, "আমাগো ত বাই বাচতি অবি। নিজে বাঁচনের জন্যি এই সামান্য মিথ্যা আল্লায় মাফ করবেন। দেখছাও না আল্লার দইনায় কেউ বড়লোক, কেউ গরীব। আল্লা কি আমাগো গরীব কইরা জন্ম দিছিলেন? গরীবগো মুখির বাত কাইড়া নিয়া ওরা বড়লোক ঐছে। দুই চারডা ধর্মের কতা কয়া আমরা যদি ওগো ঠগাইয়া কিছু লই তাতে গুনা অবে না। ওরাও ত আমাগো ঠগাইছে।"

বছির বলে, "বড়লোকগো ঠগাও সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তুক এইসব গরীব লোকগো ঠগায়া পয়সা আনা ত আমি ভাল বইলা মনে করি না।"

মজিদ উত্তর করে, "তুমি হাসাইলা বছির আমারে! এইসব লোকগো আমরা যদি না ঠগাই অন্যলোকে আয়া ঠগাবি। দিনে দিনে এরা ঠগতিই থাকপি। আমরা যদি এহন ওগো ঠগায়া লেহা-পড়া শিখতি পারি, আলেম ঐতি পারি, মৌলবী হয়া ওগো কাছে যায়া এমুন ওয়াজ করুম যাতে কেউ আর ওগো ঠগাইবার পারবি না।"

এ যুক্তিও বছিরের পছন্দ হয় না। এদেরই মত কত ছাত্র ত আলেম হইয়া গ্রাম-দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা ত কেহই এইসব গ্রাম্য-লোকদিগকে শোষণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন বক্তৃতা করে না। বরঞ্চ আরও অভিনব মিথ্যার জাল পাতিয়া দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে ঠকাইয়া বেড়ায়। কিন্তু যে অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত এই ছাত্র কয়টি পড়াশুনা করে তাহা দেখিয়া বছির বিস্মিত হয়। ওরা দুই তিনজন প্রায় গোটা কোরান শরীফখানিই মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। তাও কি শুধু মুখস্থই, কেরায়াত করিয়া কোরান শরীফ পড়িতে কোথায় স্বরকে বিলম্বিত লয়ে লম্বা করিতে হইবে, কোথায়

খাটো করিতে হইবে, কোথাও থামিতে হইবে, উহার সব কিছু তাহারা মুখস্থ করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। দিন নাই-রাত্র নাই–সকাল নাই–বিকাল নাই, অবসর পাইলেই ইহারা কেতাব লইয়া বসে। নিয়মিত খাওয়ার সংস্থান নাই, কতদিন অনাহারে কাটাইতে হয়। শীতে গরম বস্ত্র নাই। গ্রীষ্মের রৌদ্রে মাথার চান্দি ফাটিয়া যাইতে চাহে। প্রকৃতি ইহাদের কাছে দিনে দিনে নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর হয়। তার উপর আছে অনাহারের ক্ষুধা,–সংক্রামক রোগের আক্রমণ! এই নিভকি জীবন যোদ্ধাগুলি দিনের পর দিন সকল রকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছে।

পথ হয়ত ইহাদের ভ্রান্ত হইতে পারে। এই সংগ্রামের শেষ ফসলও হয়তো এই যুগোপযোগী হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ধন-ধান্যে ভরিয়া দিবে না, কিন্তু এই জীবন্ত বিদ্যাসাগরেরা আমাদের পিছাইয়া পড়া মুসলিম সমাজে জ্ঞান-তপস্যার যে কঠোর সাধনা-ধারার আদর্শ রাখিয়া যাইতেছে তাহার প্রভাব কি আমাদের সমাজে পড়িবে না?

ছোট ছেলে বছির। অত শত ভাবিতে পারে না। কিন্তু মসজিদের এই তালেব-এলেমগুলির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া ওঠে। সেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে সে তাহাদের ঘর-সংলগ্ন পায়খানা ও প্রস্রাবখানার উপর বালতি বালতি পানি ঢালিয়া দেয়। দুই বেলা ঝাট দিয়া ঘরখানিকে পরিষ্কার করিয়া রাখে। তাহাদের ময়লা জামা-কাপড়গুলি ভাজ করিয়া সুন্দর করিয়া টাঙাইয়া রাখে। তাহারাও বছিরকে বড়ই স্নেহ করে। সকলেই অভাবী বলিয়া একে অপরের অভাব বুঝিতে পারে। কেহ বাড়ি হইতে সামান্য চিড়া বা মুড়ি লইয়া আসিলে সকলে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া খায়।

মসজিদের খাদেম সাহেব এই তালেব-এলেমদিগকে পড়াইতে বিশেষ উৎসাহ দেখান । প্রায়ই নানা ওজর-আপত্তি দিয়া তিনি পড়াইবার সময় অন্য কাজ করেন। এজন্য তাহারা মনঃক্ষুণ্ণ হয় না। আরও মনোযোগের সহিত ওস্তাদের খেদমত করিয়া তাহারা তাহার অনুগ্রহ পাইতে চেষ্টা করে। যেখানে সেখানে ইমাম সাহেবের প্রশংসা করিয়া তাহার জন্য দাওয়াতের বন্দোবস্ত করে। তাহার গোছলের পানি, ওজুর পানি পুকুর হইতে আনিয়া কলসীতে ভরিয়া রাখে। তাহার জামাকাপড় সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। তিনি শুইয়া পড়িলে কেহ পাখার বাতাস করে, কেহ অতি যত্নের সঙ্গে তাহার পা টিপিয়া দেয়। তাহাদের ধারণা, ওস্তাদের সেবা করিয়া তাহার ভিতর হইতে বিদ্যা বাহির করিয়া লইতে হইবে। যখন তিনি তাহাদিগকে পড়াইতে কৃপণতা করেন, তাহারা আরও বেশী করিয়া তাহার খেদমত করে। এইভাবে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। বছির আগের মতই স্কুলে যাইয়া পড়াশুনা করে।

মাঝে মাঝে আজাহের আসিয়া ছেলের খবর লইয়া যায়। বাড়ি হইতে গামছায় বাঁধিয়া কোনদিন সামান্য চিড়া বা ঢ্যাপের খই লইয়া আসে। মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে বছির সেগুলি কাড়াকাড়ি করিয়া খায়। দেখিয়া আজাহেরের বড়ই ভাল লাগে। আহা! যদি তার সঙ্গতি থাকিত সে আরও বেশী করিয়া চিড়া লইয়া আসিত। যত পারিত ওরা সকলে মিলিয়া খাইত।

ওদের খাওয়া হইলে আজাহের এক পাশে বসিয়া থাকে। তালেব-এলেমরা যার যার কেতাব লইয়া পড়িতে বসে। বছিরও জোরে জোরে তাহার বই পড়ে। আজাহের বসিয়া বসিয়া শোনে। এই পড়ার সুর যেন তাহার বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। সেই সুরের উপর সোয়ার হইয়া আজাহের ভাসিয়া যায়। ছেলে মস্ত বড় বিদ্বান হইয়া শহরের

কাছারিতে হাকিম হইয়া বসিয়াছে! কত উকিল, মোক্তার, আমলা, মুহুরি তাজিমের সঙ্গে তাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে। এমন সময় আজাহের সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরনে সেই ঘেঁড়া লুঙ্গি। গায়ে কত ধূলাবালি। ছেলে এজলাস হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া তাহার আসনের পাশে আনিয়া বসাইল। পায়ের ধূলী মাথায় লইয়া সমবেত উকিল, মোক্তারদিগকে বলিল, “এই যে আমার বাজান। আমার লেখাপড়ার জন্য ইনি কত অভাব-অভিযোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। নিজে অনাহারে থাকিয়া আমার পড়ার খরচ চালাইয়াছেন।” ‘না-না’ আজাহের কিছুতেই এইভাবে ছেলের সামনে যাইয়া উপস্থিত হইবে না। তাহা হইলে কি ছেলের মান থাকিবে? সে ছেলের উন্নতির জন্য যত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা চিরকালের জন্য যবনিকার অন্তরালে গোপন হইয়া থাকিবে! তাহার ত্যাগের জন্য সে কোনই স্বীকৃতি চাহে না। সকল বাপই ছেলের জন্য এইরূপ করিয়া থাকে। ছেলের উন্নতি হোক–ছেলের সম্মান বাড়ুক, দেশে বিদেশে ছেলের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ুক, তাই দেখিয়া আজাহের প্রাণ-ভরা তৃপ্তি লইয়া মাটির গোরে চিরজনমের মত ঘুমাইয়া পড়িবে!

ছেলের কাছে বিদায় লইয়া আজাহের কত কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া যায়।

.

৩৩.

সেদিন বছির রহিম মল্লিকের বাড়ি বেড়াইতে গেল। রহিম মল্লিক তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। "ওগো হুনছ নি? আমার মিঞাবাই আইছে। শীগগীর পাও ধুবার পানি দাও! মাথার ক্যাশদা পিড়াহান মুইছা আমার মিঞাবাইরে বসতি দাও।"

বউ হাসিয়া বারান্দায় একটি খেজুর পাটি বিছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আমার দাদাভাই আইছে। ভাই আমার জন্যি কি লয়া আইছে?"

বছির বলিল, "হোন দাদী! তোমার জন্যি কুদাল ভাইঙ্গা নথ গড়াইতে দিছি, আর কাঁচি ভাইঙ্গা হাসলি গড়াইতে দিছি সোনারু বাড়িতি। এহন কি খাবার দিবা তাই আন।" বউ বলিল, "তয় আমিও ইন্দুরের মাটি দ্যা তোমার জন্যি পায়েস রাইন্দা রাখছি। ক্যালার। ডাউগ্যার খাসী কইরা রাইন্দা রাখছি তোলই চেরা হাঁড়িতি। বইও কুটুম বইও, আইনা দিত্যাছি।"

শুনিয়া রহিমদ্দীন হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমরা দাদী নাতি যত খুশী দেওয়া নেওয়া কর। আমি ইয়ার মদ্দি নাই।"

দাদী তাড়াতাড়ি কোলা হইতে মুড়ি আনিয়া একটি সাজিতে করিয়া বছিরকে খাইতে দিল।

বছির বলিল, "না দাদী! এত সব বাল বাল খাওয়ার সামগ্রীর নাম করলা, শুইনাই জিহ্বায় পানি আইসা গেছে। তা থুইয়া আমার জন্যি শুধু মুড়ি আইনা দিলা! ওই সব না ঐলে খাব না।"

দাদী আঁচল দিয়া বছিরের মুখ মুছাইয়া বলিল, "সে সব বানাইতি ত সময় লাগবি। ততক্ষণে এই মুড়িগুলি খাও কুটুম!"

মুড়ি খাইতে খাইতে বছির রহিমদ্দীর হাল-হকিকত শুনিতে লাগিল। এই অঞ্চলের মধ্যে রহিমদ্দী সব চাইতে ভাল জামদানী শাড়ী বুনাইতে পারিত। লাল, নীল, হলদে সূতা নাইলে পরাইয়া সে শাড়ীর উপর কত রকমের নকসাই না করিত। দেশ-বিদেশ হইতে বেপারীরা আসিত তাহার শাড়ী কিনিতে। শুধু কি জামদানী শাড়ীই সে বুনাইত? মনখুশী, দিলখুশী, কলমীলতা, কাজল লতা, গোলাপ ফুল, রাসমণ্ডল, বালুচর, কত শাড়ীর নাম করিবে সে? কিন্তু এখন দেশে সূতা পাওয়া যায় না। যে সূক্ষ্ম সূতা দিয়া সে আগে শাড়ী বুনাইত তাহা এখন বাজারে পাওয়া যায় না। চোরাবাজারে যা পাওয়া যায় তাহা দিয়া শাড়ী বুনাইলে দাম বেশী পড়ে। লোকসান দিয়া বেচিতে হয়। লোকের রুচিও এখন বদলাইয়া গিয়াছে। শহরের বড়লোকেরা এখন নকসী শাড়ীর পরিবর্তে সাদা থানের উপর নানা রঙের ছাপ দেওয়া শাড়ী পরে।

"কি কব দাদা বাই! আমাগো এখন মরণ। দেহ আইসা, নকসী শাড়ীর ফর্মাগুলি ইন্দুরে কাটত্যাছে।" এই বলিয়া রহিমদ্দী তাহার ডানা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দেখাইল, ঘরের চালের সঙ্গে অনেকগুলি ফর্মা অযত্নে ঝুলিতেছে। তাহার উপর মাকড়সারা স্বেচ্ছায় জাল বুনাইয়া চলিয়াছে।

বছির বলিল, "আচ্ছা দাদা! সরু সূতা যহন পাওয়া যায় না তহন মোটা সূতার কাপড়ই বানাও না কেন?"

রহিমদ্দী বলে, “ভাইরে! এই হাতে সরু শাড়ীর নকসাই আসে। তবু অনেক কষ্টে মোটা সূতা কিনা গামছা বুনাই। কিন্তু সে সূতাও চোরাবাজারে কিনতি অয়। তাতে মোটেই লাভ অয় না। একবেলা খাই ত আর একবেলা না খায়া থাহি। গরীবের মরণ আর কি! আমাগো জন্যি কেউ বাবে না।”

খাইতে খাইতে বছির জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা, দাদা! সগল কারিকরগো অবস্থাই তোমার মত নাকি?”

রহিমদ্দী বলে, “তাগো অবস্থা আরও খারাপ। কারিকর পাড়ায় হাহাকার পইড়া গ্যাছে।”

এত সব কথা বছিরকে বলিয়া কি লাভ হইবে? তবু তার কাছেই রহিমদ্দী সকল কথা ইনাইয়া বিনাইয়া বলে। দুঃখের কথা বলিয়াও হয়ত কিছুটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।

রহিমদ্দীর কাছে বছির আরও অনেক খবর পাইল। মেনাজদ্দী মাতবর ভেদবমি হইয়া মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পর তার যা কিছু জমি-জমা সাতে ভূতে দখল করিয়া লইয়াছে। সেন। মশায় ডিক্রী জারী করিয়া তাহার বিধবা বউকে পথের ফকির করিয়াছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করিয়া এখন তাহার দিনাতিপাত চলে।

.

৩৪.

ফতেহায়ে দোয়জ দাহম উপলক্ষে ফরিদপুরে বিরাট সভা হইবে। কলিকাতা হইতে ইসলাম প্রচারক মাওলানা আলিম উদ্দীন সাহেব, মাওলানা তোফেল আহমদ সাহেব প্রভৃতিকে দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে। এই উপলক্ষে রমিজদ্দীন সাহেব একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ফোরকানিয়া মাদ্রাসার তালেব-এলেমরা রঙিন ব্যাজ পরিয়া এ-কাজে ছুটাছুটি করিতেছে।

একদিন রমিজদ্দীন সাহেব মাদ্রাসার স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বছিরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি চোখ দুটি লাল করিয়া রাগের সঙ্গে বছিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে এলে কেমন করে?"

শুনিয়া বছির ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল। সঙ্গের তালেম-এলেমরা বলিল, "বছির ত আমাগো এহানে মসজিদে থাইকা পড়াশুনা করে। ইস্কুলে যায়।"

শুনিয়া উকিল সাহেবের রাগে যেন আরও ইন্ধন পড়িল। তিনি মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডাকিয়া গোপনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ইমাম সাহেব বছিরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বছির! তুমি এখনই মসজিদ হইতে চইলা চাও।" বছির তাহার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করিল। ইমাম সাহেব বলিলেন, "আমি ত তোমারে থাকনের জায়গাই দিছিলাম। কিন্তুক উকিল সাহেব ত মানেন না। তুমি তানার বিপক্ষ লোকের বাড়ি যাও। সমাজে যাগো তিনি বন্ধ থুইছেন, তাগো বাড়ি যায় খাও। সেই জন্যি উকিল সাহেব তোমারে তানার বাসায় ত্যা খ্যাদায়া দিছিলেন। তিনি যহন তোমার উপর বিরূপ, আমি কেমন কইরা জাগা দেই?"

বছিরের চোখ দুটি হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরিতে লাগিল। ইমাম সাহেব তার গামছা দিয়া বছিরের মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, “বাবা বছির! আল্লার উপর ভরসা রাইখ। তানি যখন মুখ দিছেন খাওনও তানিই দিবেন। তুমার মনে যদি বড় হবার খাহেছ থাকে কেউ তুমার পথে বাধা ঐতি পারবি না।” মসজিদের তালেব-এলেমরা নিকটে দাঁড়াইয়া সবই শুনিতেছিল। তাহারা বছিরকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে বছির ইমাম সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাহার আধ-ছেঁড়া লুঙ্গিখানার মধ্যে বই-পত্রগুলি বাধিতে লাগিল। সেই বন্ধনের এক একটি মোচড়ে কে যেন তাহার সমস্ত দেহ-মনকে বাঁকাইয়া দুমড়াইয়া দিতেছিল। বই-পত্র বাধিয়া বছির ভাবিতে বসিল, এখন সে কোথায় যাইবে? কোথায় যাইয়া সে আশ্রয় পাইবে? মুর্শীদার ফকির গান গায়–

আমি আশা কইরা বাঁধলাম বাসা,
পুরিল মনে আশারে;–
আমার আশা-বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া গেলরে।

আজ বছিরের কেবলই মনে হইতেছে, তার মত মন্দভাগ্য বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। সে যেন অচ্যুৎ পারিয়ার চাইতেও অধম। আকাশ, বাতাস, সমস্ত পৃথিবী যেন তাহাকে বেড়িয়া কেবলই বলিতেছে, ধিক্কার, ধিক্কার! কোথায় সে যাইবে! কার কাছে গেলে তার দুঃখ জুড়াইবে!

মজিদ আর করিম আসিয়া বছিরের পার্শ্বে বসিল। “ভাই বছির! ভাইব না। হাফিজ মিঞার হোটেলে যদি থাকনের জায়গা করতি পারি, এ বাড়ি ও-বাড়ি দাওয়াত খাওয়াইয়াই আমরা তোমারে চালায়া নিব। তুমি আমাগো লগে চল!

বছির তাহাদের সঙ্গে হাফিজ মিঞার হোটেলে চলিল। সমস্ত শুনিয়া হাফিজ মিঞা বলিল, “আমার হৈটালে উয়ারে আমি জাগা দিতে পারি, যদি নগদ পয়সায় দুই বেলা ও আমার এহানে ভাত খায়।”

এই অসহায় ছাত্রটিকে আশ্রয় দিলে তাহার কত ছওয়াব হইবে কোরান কেতাবের আয়াত আবৃত্তি করিয়া তাহারা ইহার মনোরম বর্ণনা দিল, কিন্তু হাফিজ মিঞা কিছুতেই টলিল না। বই-পত্রের বোঁচকা কাঁধে লইয়া বছির সেখান হইতে বাহির হইল। মজিদ আর করিম তাহার পাছে পাছে আগাইতে লাগিল।

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বছির বলিল, “ভাই! তোমরা আমার জন্যি আর চেষ্টা কইর না। দেখছও না, আমি যে ডাল ধরি সে ডাল ভাইঙ্গা যায়। আমার মত বদ-নছিবের সঙ্গে তোমরা আর জড়াইয়া থাইক না।”

মজিদ বলিল, “ভাই বছির! আমাগো কোন খ্যামতাই ঐল না যে তুমার কোন উপকার করি। আমরাও তুমার মত নিরাশ্রয়।” বলিয়া মজিদ কাঁদিয়া ফেলিল।

করিম বলিল, “দেখ ভাই! যখন যেহানে থাহ আমাগো কথা মনে কইর। আমাগো দুস্কের দিন। তবু মনে কইর, আমাগো সেই দুস্কির মদ্দিও তোমার কথা বুলব না।” বছির ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “ভাই! তোমাগো কথা আমি কুনু দিনই বুলব না। তোমরা যে

পক্ষি-মার মত ঠোঁটের আধার দিয়া প্রতিদিন আমারে পালন করছ, তাকি বুলবার? যাও ভাই, তোমরা মসজিদে ফিরা যাও। জীবনে যদি কুনু দিন বড় ঐবার পারি তোমাগো পাশে আবার আইসা খাড়াব।” এই বলিয়া বছির পথ চলিতে লাগিল। করিম আর মজিদ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

চলিতে চলিতে বছির ভাবে, “এখন আমি কোথায় যাই! বাড়ি যদি ফিরিয়া যাই সেখানে আমার পড়াশুনা হইবে না। আমার পিতা আমার মা কত আশা করিয়া আছে, লেখাপড়া শিখিয়া আমি বড় হইব। আমার জন্য তাহারা কত কষ্ট স্বীকার করিতেছে। আজ আমি ফিরিয়া গেলে তাহারা আশা ভঙ্গ হইয়া কত দুঃখ পাইবে। কিন্তু কোথায় আমি যাইব? রহিমদ্দী দাদার ওখানে গেলে আশ্রয় মিলিবে। কিন্তু তাহারা নিজেরাই খাইতে পায় না। আমাকে খাওয়াইবে কেমন করিয়া? এক আছে আরজান ফকির আর তার বউ। তারা কি আমাকে আশ্রয় দিবে?” কিন্তু তাদের অবস্থা এখন কেমন তাও সে জানে না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বছির পদ্মানদী পার হইয়া চরের পথ ধরিল। যেখানে একদিন সরষে ফুলের বাহার দেখিয়াছিল আজ সেখানে মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে। এখানে সেখানে কাটা সরিষার গোড়াগুলি দাঁত বাহির করিয়া যেন তাহাকে উপহাস করিতেছে। তাহারই নিরাশ হৃদয়ের হাহাকার যেন দূর্ণী হাওয়ায় ধূলি উরাইয়া মাঠের মধ্যে বৈশাখ-রৌদ্রে দাপাদাপি করিতেছে।

.

৩৫.

দুপুরের রৌদ্রে ঘামিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া বছির আরজান ফকিরের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ফকির ভিক্ষা করিতে গাওয়ালে গিয়াছে। ফকিরনী তাহাকে দেখিতে পাইয়া জড়াইয়া ধরিল, "আরে আমার গোপাল আইছে। আমি পথের দিগে চায়া থাহি। এই পথদ্যা নি আমার। গোপাল আসে।" ফকিরনী বছিরকে ধরিয়া লইয়া ঘরের মেঝেয় একটি খেজুরের পাটি। বিছাইয়া বসিতে দিল। তারপর একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে লাবণ্যভরা তাহার শ্যামল মুখোনির দিকে চাহিয়া রহিল। আহা! এই ছেলে যদি তাহাকে মা বলিয়া ডাক দিত! কিন্তু ফকিরনীর কি আছে যে এই আসমানের ফেরেস্তা-শিশুকে সে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিবে? ঘরে ভাল খাবার নাই যে তাহার হাতে দিবে? সমস্ত বুকভরা তার বাৎসল্য-স্নেহের শূন্যতার হাহাকার। এখানে এই দেব-শিশু কি কাজল মেঘের বারিধারা বহিয়া আনিবে?

খানিক বাতাস করিয়া ফকিরনী ঘরের মুড়ির কোলা হাতাইতে লাগিল। শূন্য কোলায় ফকিরনীর হাতের রূপা-দস্তার বয়লার লাগিয়া টন টন করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দ তাহার মাতৃ-হৃদয়কে যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিল। ফকিরনী বলিল, "বাজান! তুমি একটু বইসা জিড়াও। আমি এহনই আত্যাছি।" সামনে আরসাদের বাড়ি। আরসাদের বউকে যাইয়া বলিল, "বউ! ভাত আছে নি?"

বউ বলিল, "ভাত ত আছে চাচী, কিন্তুক খাইবার ছালুন নাই। আমাগো বাড়ির উনি গ্যাছে মাছ মারতি। ভাত রাইন্দা বইসা আছি। দেহি মাছ যদি মাইরা আনে তয় ছালুন। রানব। না হৈলে কাঁচা মরিচ আর নুন দিয়া আইজ বাত খাইতি অবি। তা বাতের কথা জিজ্ঞাসা করলা ক্যান চাচী?"

ফকিরনী বলে, “আমার এক ছোট বাজান আইছে শহর থইনে। গরে একটাও চাইল নাই। বাজানের কি খাইতে দিব? তয় দেলো বউ! এই ক্যালা পাতাড়ার উপর চারডা বাত দে। বাজানের সামনে দরবানি।”

বউ কলাপাতার উপর সামান্য কিছু ভাত দিল। বেশী দিতে পারিল না। তাহাদের ত দুইজনের মাপা ভাত। সেই ভাত লইয়া ফকিরনী আর এক বাড়ি হইতে একটু শাক আর ডাল লইয়া আঁচল আড়াল করিয়া তার ছোট রান্নাঘরে ঢুকিল। তারপর মাটির সানকিতে সেই ভাত বাড়িয়া বছিরের সামনে আনিয়া ধরিল।

বছির হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিল। ফকিরনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

“বাজান! এবার আর তোমারে যাইবার দিব না। আমার চক্ষের কাজল কোঠার ঘরে। তোমারে বন্দী কইরা রাখপ।”

খাইতে খাইতে বছির বলিল, “ফকির মা! আমার মতন জনম দুঃখী আর কেউ নাই। আমি তোমাগো বাড়ি আশ্রয় নিবার আইছি।”

বছিরের মুখে ফকির-মা ডাক শুনিয়া ফকিরনীর বুক যেন জুড়াইয়া গেল। তার বুকের মাতৃস্নেহের সারিন্দাখানি সহস্র তারে বাজিতে লাগিল।

“বাজান! তুমি যদি দয়া কইরা আমাগো এহানে থাহ তয় যে আমি আসমানের চান আতে পাই। আমি নগরে ভিক্ষা মাইঙ্গা তুমারে খাওয়াব।”

বিকালে ফকির ভিক্ষা হইতে আসিয়া বছিরকে দেখিয়া বড়ই খুশী হইল। বিশেষ করিয়া বছির যে চিরস্থায়ী ভাবে তাহার বাড়িতে থাকিতে আসিয়াছে ইহাতে যেন সে হাতে স্বর্গ পাইল। নিজের সমস্ত ঘটনা বলিতে বলিতে বছির কাঁদিয়া ফেলিল।

গামছা দিয়া তাহার মুখ মুছাইতে মুছাইতে ফকির বলিল, "বাজান! আমার সানালের আস্তানায় যখন আইছ, দুঃখ কইর না। দুঃখের অবহেলা করার শিক্ষাই আমার ফকির আমারে দিছে। একদিন আমিও তোমার মত দুঃখ পায়া চোখের পানিতে বুক ভাসাইতাম। সেই দুস্কু ভুলবার জন্যি সারিন্দা বাজান ধরলাম। একদিন সেই সারিন্দার সুরির উপর সানাল চান আইসা সোয়ার ঐল। তিনি আমার সগল দুস্কু লয়া গ্যালেন।" এই বলিয়া ফকির গান ধরিল–

"তুমি যে হালে যে ভাবে
রাখছরে দয়াল চান তুই আমারে?
ও আমি তাইতে খুশী আছিরে।
কারে দিছাও দালান কোঠা,
আরে দয়াল আমার গাছের তলারে।"

গান শেষ হইলে বছির ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ফকির বাবা! কও ত? তোমার এই সানাল চান কেডা?"

ফকির হাসিয়া বলিল, "বাজানরে! সে যে কেডা তা আমিও জানতি পারি না। হুনছি নুরুল্লাপুরে এক সানালের বাড়ি ছিল। তা তানার খোঁজ আমি করি না। আমি খুঁজি

আমার মনের সানালরে। যে সানাল দুঃখী মানষির দুক্ষু হরণ কইরা লইয়া যায়। যার কেউ নাই। তার সঙ্গে যায়া বসত করে। আমার সানাল চান বাণিজ্যে যায়, জলের কুম্ভীর বইঠা বায়। দুঃখী তাপিত ব্যথিত-জনের অন্তরে অন্তরে তার আসা যাওয়া। আমার গুরু, তার গুরু, তার গুরু, সয়াল সংসারের যত মানুষ আল্লার আলম ভইরা গানের বাজনায় সুখি-দুঃখী যে দরদের দরদীরে মনে মনে চিন্তা করছে, আমার দয়াল চান সেইজন। তারে মনের চক্ষি দেখা যায়। বাইরের চোহে সে ধরা দ্যায় না। এই বলিয়া ফকির আবার গান ধরিল–

“মন চল যাইরে,
আমার দরদীর তালাশেরে;
মন চল যাইরে।
হাল বাও হালুয়া ভাইরে হস্তে সোনার নড়ি,
এই পথদ্যানি যাইতে দেখছাওরে আমার
সানাল চান বেপারী।
জাল বাও জালুয়া ভাইরে হস্তে সোনার রশি,
এই পথদ্যানি যাইতে দেখছাওরে আমার
সানাল চান সন্ন্যাসী।
দেইখাছি দেইখাছিরে আমরা সানাল চান সন্ন্যাসী,
ও তার হাতে আসা বগলে কোরান করে মোহন বাঁশী।
হাইটা হাইটা যায়রে সানাল দীঘল পন্থরে বায়া,
আমার মনে বলে তারে আমি কোলে লই যায়।”

“বাজানরে! এই আমার সানাল চান। যারে দেইখ্যা আমার ভাল লাগে সে-ই আমার সানাল চান। এই যে তুমি আইছ আমার ঘরে তোমারে দেইখা আমার বুকির মায়া উতলায়া। উঠছে। আইজ তুমিই আমার সানাল চান।” ফকিরের কথাগুলি যেন ফকিরনী সারা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছিল। এ যেন তারি মনের কথা ফকিরের মুখে প্রকাশ পাইল। কিন্তু এত সব তত্ত্ব-কথা বছির বুঝিতে পারে না। কেমন যেন লজ্জায় তার শ্যামল, মুখোনি রাঙা হইয়া ওঠে।

আরজান ফকিরের বাড়ি

৩৬.

আরজান ফকিরের বাড়ি আসিয়া বছির স্কুলে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। ভাসান চর হইতে আরও তিন চারজন ছাত্র স্কুলে যায়। তাহারা সকলে আসিয়া বছিরের আস্তানায় জড় হয়। তারপর দল বাধিয়া স্কুলের পথে রওয়ানা হয়। স্কুলে যাইবার সময় তাহারা খুব আনন্দেই যায় কিন্তু ফিরিবার পথে সকলেরই পেট ক্ষুধায় জ্বলিতে থাকে। পথের দুইধারে গাছে গাছে যে দিনের যে ফল তাহা তাহাদের নখদর্পণে। ফিরিবার পথে তাহারা। গাছের ডাঁসা কাঁচা যত ফল খাইয়া দারুণ ক্ষুধার কিঞ্চিত নিবৃত্তি করে। এত পথ আসা যাওয়া করিয়া যখন তাহারা বাড়ি ফেরে তখন অতিরিক্ত আহারের ফলে ঘুমে তাহারা জড়াইয়া পড়ে। তবু পাঠ্যবইগুলি সামনে মেলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ পড়িতে চেষ্টা করে। তারপর সাতরাজার ঘুম আসিয়া তাহাদিগকে পাইয়া বসে। তাই স্কুলের পরীক্ষায় তাহারা ভাল করিতে পারে না। কেহ কেহ একাদিক্রমে দুই তিনবার ফেল করে।

প্রথমে এখানে আসিয়া বছিরেরও সেই দশা হইল। সে বাড়ি আসিয়া খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। এই ভাবে সাত আটদিন যাওয়ার পরে সে ভাবিতে বসিল, এমন করিয়া ঘুমাইলে ত। তাহার চলিবে না! তার যে বড় হইতে হইবে। বড় হইয়া সে যে নিজ সমাজের অনেক। অনাচার দূর করিবে। বড়ুর কবরে বসিয়া সে যে নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বার বার সেই কথা সে মনে মনে আওড়ায়। নানা কিছুতেই তাহার ঘুমাইলে চলিবে না। সে একখণ্ড কাগজ লইয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিল, “ঘুম শত্রু”।

তারপর সেই কাগজখানা ঘরের বেড়ায় টানাইয়া রাখিল। তারই সামনে বসিয়া বইপত্র লইয়া বছির জোরে জোরে পড়ে। পড়িতে পড়িতে যখন চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয় তখন সে উঠিয়া চোখে মুখে পানির ছিটা দেয়। ঘরের বাহিরে যাইয়া খানিকটা দৌড়াইয়া আসে। ঘুম কাটিয়া গেলে সে আবার পড়িতে বসে। ঘুমের সময় অঙ্ক কষিলে ঘুম পায় না। পড়িতে পড়িতে সে ঘুম তাড়ানোর এই অভিজ্ঞতা আবিষ্কার করিয়াছে। সে যতক্ষণ পড়ে ফকিরনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জাগিয়া থাকে। বছিরের সঙ্গে সেও যেন পরীক্ষার পড়া তৈরী করিতেছে। বছির পরীক্ষায় পাশ করিবে। ফকিরনীর পরীক্ষা কোন দিনই শেষ হইবে না। যাহারা মমতার বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে, সর্বস্ব দিয়াও তাহাদের মনের অতৃপ্তি মেটে না।

ফকিরনীর পাশেই বছিরের শুইবার স্থান। পড়াশুনা করিয়া বছির ঘুমাইয়া পড়ে। পার্শ্বে বসিয়া ফকিরনী তাহাকে বাতাস করে। ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া বছিরের শ্যামল লাবণ্যভরা মুখোনির উপর পড়ে। ফকিরনী যেন বিছানার কাঁথার গায়ে এই কিশোর-দেবতাটিকে তুলি দিয়া আঁকিয়া লইতেছে। সে পাখার বাতাস করিতে করিতে স্বপ্ন দেখে, সন্ধ্যার রঙিন মেঘগুলি আসিয়া তাহাকে বলিল, “আমরা তোমার তুলিতে ভর করিব। আমাদের রঙ দিয়া তোমার কিশোর-দেবতাটিকে গড়িয়া লও।” ফকিরনী বলিল, “না, তোমরা ওইখানে দাঁড়াইয়া দেখ।” সাতনরি হার গলায় পরিয়া রামধনু আসিয়া তাহার সামনে আসিয়া বলিল, “কৌটা খুলিয়া আমি ডালায় জড়াইয়া আনিয়াছি সাতটি রঙ। আমাকে তুমি লও।”

ফকিরনী বলিল, “না, তোমাকেও আমি চাহি না। তুমি ওইখানে দাঁড়াইয়া দেখ।” চাঁদের কলসী কাখে লইয়া জোছনা ছড়াইতে ছড়াইতে কে একটি মেয়ে আসিয়া বলিল, “আমি দিব সোনালী স্বপনের ঝিকিমিকি। আমাকে তুমি লও।”

ফকিরনী বলিল, “না–না, তুমিও লও। তোমাকে আমি চাই না! তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া থাক।” আকাশের আঙিনায় নাচের নক্সা আঁকিতে আঁকিতে বিজলী আসিয়া বলিল, “আমি দিব রঙ আর গতি। তুমি আমাকে লও।” ফকিরনী বলিল, “না-না, তোমাকেও আমি চাহি না।”

তখন প্রথম আষাঢ়ের মেঘ তার কালো কাজল অঙ্গ বকের পাখা দিয়া মাজিতে মাজিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ফকিরনী বলিল, “তোমাকে আমি চাই। তোমার কালো কাজল রঙ আমাকে দাও। আমি এই কিশোর দেবতার অঙ্গে মাখিয়া দিব।” নানা বরনের সবুজ অঙ্গে পরিয়া কচি ধান খেত আসিয়া সামনে খাড়া হইল। ফকিরনী বলিল, “তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করিতেছি। তুমি কৃষাণের স্বপ্ন হইয়া সারা মাঠ ভরিয়া তোমার শ্যামল অঞ্চল বিছাইয়াছ। তুমি দাও তোমার সজীবতা আর নানা ছাদের সবুজ সুষমা! এইসব লইয়া নিপুণ তুলি ধরিয়া মনের মতন করিয়া ফকিরনী যেন তার কিশোর-দেবতাটিকে অঙ্কন করিল। তখন জগতের যত স্নেহাতুর মাতা তারা দল বাঁধিয়া আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ বাছনীদিগকে আদর করিতে যে চুম্বন দেয়, সেই চুম্বন যেন তারা একে একে সেই কিশোর বালকের গায়ে মুখে মাখিয়া দিয়া গেল। পাশে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার মেঘ, আকাশের রামধনু আর চাঁদ আর বিদ্যুৎ সমবেত কণ্ঠে গাহিল–সুন্দর–ওহে শ্যামল সুন্দর।

অশিক্ষিত গ্রামের মেয়ে ফকিরনী অত শত ভাবিতে পারে কিনা জানি না। হয়ত পারে! গ্রাম্যরচনাকারীদের ভাবে এবং রসে যে কথাকলি ফুটিয়া আছে হয়ত এর চাইতেও সুন্দর কথা তার মনে উদয় হয়।

কত কথাই ফকিরনী ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রায় শেষ হইয়া আসে। কোথাকার এক শূন্যতা আসিয়া যেন ফকিরনীর সমস্ত মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাহাকার করে। তার কেবলই ইচ্ছা করে ওই ঘুমন্ত শ্যামল মুখোনি যদি সে চুমায় চুমায় ভরিয়া দিতে পারিত তবে বুঝি তার মনের সকল হাহাকার মিটিত। বাছা আমার ঘুমাইয়া আছে! আহা! সে ঘুমাইয়া থাক!

শেষ রাত্রে বছির জাগিয়া উঠিয়া দেখে, ফকিরনী তখনও তার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। সে বলে, “একি ফকির-মা! তুমি ঘুমাও নাই?” এই মা ডাক শুনিয়া তার বুভুক্ষু অন্তর যেন জুড়াইয়া যায়।

সে তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়। তারই আলোকে বছির পড়িতে বসে।

ভাসানচরের ইয়াসীন, শামসু আর নবী ভালমত পড়াশুনা করিত না। নবী আর শামসু পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ইয়াসীন পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে। বছির তাহাদিগকে বলিয়া দিল, “ভাই! তোমরা রোজ সকালে আমার এহানে আইসা পড়াশুনা করবা আমি যতটা পারি, তোমাগো সাহায্য করব।”

দিনে দিনে ফকিরের বাড়িখানি যেন পড়ুয়াদের আড্ডায় পরিণত হইল।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিয়া পড়িল। সমস্ত চর পানিতে ডুবু ডুবু। এ-বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে নৌকা লাগে। বর্ষার জলধারায় পদ্মা নদী ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। আগে যে খেয়া-নৌকা দিয়া পার হইয়া বছির তাহার সঙ্গী-সাথীদের লইয়া স্কুলে যাইত তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা স্কুলে যাইবে কেমন করিয়া? ইয়াসীনের বাপ গ্রামের বর্ধিষ্ণু কৃষক। বছির তার ছেলেকে পড়াইতেছে দেখিয়া বছিরের প্রতি তাহার মনে খুব স্নেহ। ইয়াসীনের বাড়িতে দুই তিনখানা নৌকা। ইয়াসীনের বাপ তাহার একখানা ডিঙ্গি নৌকা তাহাদের পারাপারের জন্য ছাড়িয়া দিল। তিনজনের বই পুস্তক নৌকার পাটাতনের উপর। রাখিয়া তাহারা রোজ নৌকা বাহিয়া স্কুলে যায়। আলীপুরের মোড়ে নৌকা বাধিয়া রাখে। স্কুলের ছুটি হইলে আবার নৌকা বাহিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে। আগে হাঁটাপথে স্কুলে যাতায়াত করিতে হইত। তাহাতে স্কুলে পৌঁছিতে তাহাদের এত ঘন্টা লাগিল। এখন ধান খেতের পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাও দাঁড়া দিয়া নৌকা চালাইতে হয়। তাই দেড় ঘন্টার। আগে তাহারা স্কুলে পৌঁছিতে পারে না। যেদিন বৃষ্টি হয় একজন বসিয়া বুকের তলায় বই-পত্রগুলিকে কোন রকমে বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তিনজনেই ভিজিয়া কাকের ছাও হইয়া যায়। সেই ভিজা জামা কাপড় শুদ্ধই তাহারা স্কুলে যায়। স্কুলে যাইয়া গায়ের জামা খুলিয়া শুখাইতে দেয়। পরনের ভিজা কাপড় পরনেই থাকে।

ফিরিবার পথে নৌকায় উঠিয়া তাহাদের কতই যে ক্ষুধা লাগে। ইয়াসীন বছিরকে বলে, "বছির ভাই! আমাগো বাড়ি যদি শহরে থাকত তয় কত মজাই ঐত! এতক্ষণে বাড়ি যায় খায়া লয়া খেলাইতি যাইতাম।"

বছির বলে, "ভাই! একজন লোক কইছে, বড় হওয়া মানে অনেক অসুবিধার ভিতর দিয়া নিজেরে চালায়া নেওয়া–অভাবের আগুনের মদ্দি জ্বইলা পুইড়া নিজেরে সোনা করা। ভাই ইয়াসীন! দুঃখ আর অভাব একটা বড় রকমের পরীক্ষা হয়া আমাগো সামনে আইছে। এই পরীক্ষায় পাশ করতি অবি।"

ইয়াসীন বলে, "কিন্তুক বাই। এ পরীক্ষায় পাশের নম্বর আমাগো কেউ দিবি না।"

উত্তরে বছির বলে, "দিবি ভাই–একদিন দিবি, যদি আমরা বালমত পাশ করবার পারি, এই যে কত দুঃখ কষ্ট সইবার অভ্যাস আমাগো ঐল, এই অভ্যাস আমাগো কামে দিবি। জানস, আমাগো নবীজীরে কত দুস্কের মদ্দী দ্যা চলতি ঐছিল। সেই জন্যি ইত। তানি দুঃখী জনের বন্ধু।"

নৌকা বাহিতে বাহিতে তাহারা পদ্মানদী পার হইয়া আসিল। সামনে কলিমদ্দীর ধানের খেতের পাশ দিয়া নাও দাঁড়া। বামধারে মেছের সেখ ডুবিয়া পাট কাটিতেছে। এক এক ডুব দেয় আর পাট গাছের আগাগুলি নড়িয়া ওঠে। ধারালো কচির আঘাতে গুচ্ছ গুচ্ছ পাট কাটিয়া সে আঁটি বাধিতে থাকে। এক আঁটিগুলি পরে এক জায়গায় জড় করিয়া তবে জাগ দিবে। জাগের উপর কচুরিপানার ভারা দিবে; যাহাতে পাটের জাগ ভাসিয়া অন্যত্র চলিয়া না যায়। সেই পাটখেত ছাড়াইয়া তাহারা মিঞাজানের ধান খেতের পাশ দিয়া চলিল। কি সুন্দর গুচ্ছ গুচ্ছ পক্ষিরাজ ধান পাকিয়া আছে। কালো রঙের ধানগুলি। প্রত্যেক ধানের মুখে সাদা রেখা যেন পাখা মেলিয়া আছে। ধানের পাতাগুলি রৌদ্রে সোনালী রাঙালি রঙ ধরিয়াছে। বর্ষার পানির উপরে যেন একখানা পটে আঁকা ছবি। হাজার হাজার পাখি কোথায় যেন উড়িয়া চলিয়াছে। বাতাসের মৃদু ঢেউএ ধান গাছগুলি

দুলিতেছে। যেন পাখিগুলির পাখা নড়িতেছে। এই ধান সকল মানুষের আশা ভরসা। চাষীর মনের স্বপ্ন জীবন্ত হইয়া পানির উপর ভাসিতেছে। বছির বলে, "ভাই ইয়াসীন!–ভাই আজিম। তোমরা পরাণ ভইরা দেইখা লও। এই সুন্দর ছবি শহরের লোকেরা কুনু দিন দেহে নাই। আর শোন ভাই! এত পানি ঠেইলা এই ধান গাছগুলি উপরে মাথা উঠাইয়া ধানের ভরে হাসত্যাছে। আমরাও একদিন এমনি দুস্কের সঁতার পানি ঠেইলা জীবনের সুফল লয়া হাসপ।"

ইয়াসীন বলে, "কিন্তু ক ভাই! আমরা কি এই পানি ঠেইলা উঠতি পারব?"

বছির উত্তর করে, "আলবৎ পারব ভাই! আমার যা বিদ্যা বুদ্ধি আছে তাই দিয় তোমাগো পড়াব। আমরা সগলেই পইড়া বড় অব। দুঃখ দেইখা আমাগো ভয় পাইলি চলবি না।"

বছিরের কথা শুনিয়া তাহার সাথীদের মনে আশায় সঞ্চার হয়। তাহারা আরও জোরে। জোরে নৌকা চালায়।

.

৩৭.

মাঠের কাজ করিতে করিতে আজাহের ছেলের কথা ভাবে। ছেলে তাহার কি পড়িতেছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। হয়ত আকাশে যত তারা আছে–পাতালে যত বালু আছে সব সে গণিয়া কালি করিতে পারে। আরও কত কত বিষয় সে জানে! কিন্তু এ তার ভাবনার প্রধান লক্ষ্য নয়। সে যেমন খেতের একদিক হইতে লাঙলের ফোড় দিয়া অপর দিকে

যাইতেছে তেমনি তার ছেলে বড়লোক হওয়ার পথে আওগাইয়া যাইতেছে–ভদ্রলোক হইবার রাস্তায় হাঁটিয়া যাইতেছে। যে ভদ্রলোকেরা তাহাকে ঘৃণা করে–যে ভদ্রলোকেরা তাহাকে অবহেলা করে, তাহার ছেলে তাদেরই সামিল হইতে চলিয়াছে। গর্বে আজাহেরে বুক ফুলিয়া ওঠে। সে যেন মানসলোকে স্বপ্ন দেখিতেছে।

বাড়ি ফিরিয়া দুপুরের ভাত খাইতে খাইতে আজাহের বউ-এর সঙ্গে ছেলের বিষয়ে আলাপ করে। সে যেন গাজীর গানের দলের কোন অপরূপ কথাকার বনিয়াছে।

আজাহের বলে, "ছেলে আমার লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া আসিবে। আজ যাহারা আমাদিগকে গরীব বলিয়া অবহেলা করে, একদিন তাহারা আমাদিগকে মান্য করিবে-সম্মান দেখাইবে। বউ! তুমি আরও মনোযোগ দিয়া সংসারের কাজ কর। ছেলের বউ আসিবে ঘরে। নাতি নাতকুর হইবে। বাড়ির ওইধারে পেয়ারার গাছ লাগাও–এধারে মিঠা আমের গাছ। আমার নাতিরা গাছে উঠিয়া পাড়িয়া খাইবে। আমরা চাহিয়া চাহিয়া দেখিব। আর শোন কথা; এবারের পাট বেচিব না। ঘরে বসিয়া রশি পাকাইব। তুমি সুতলী পাকাইও। পাটের দামের চাইতে রশির দাম বেশী–সুতলীর দাম বেশী।"

রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া আজাহের ঝুড়ি বুনাইতে বসে। বউ পাশে সুতলী বুনায়। এই বুননীর পাকে পাকে ওরা যেন ছেলের ভবিষ্যৎ বুনাইয়া চলিয়াছে।

কোন কোনদিন গরীবুল্লা মাতবর আসে। পাড়ার তাহের আসে–ছমির আসে-কুতুবদী আসে। উঠানে বসিয়া তারা আজাহেরের কাছে তার ছেলের কাহিনী শোনে। সেই উকিল সাবের বাড়ি হইতে কি করিয়া বছির মসজিদে যাইয়া আস্তানা লইল, তারপর সেখান

হইতে চরকেষ্টপুর আরজান ফকিরের বাড়ি–এ-কাহিনী যেন রূপকথার কাহিনীর চাইতেও মধুর। কারণ এ যে তাহাদের নিজেদের কাহিনী। একই গল্প তাই শুনিবার জন্য তাহারা বার বার আসে। যে বিদ্বান হইয়া আসিতেছে সে ত শুধু আজাহেরের ছেলে নয়, সে যে তাহাদের সকল গ্রামবাসীর ছেলে। সে বড় হইয়া আসিলে তাহাদের গ্রামের সুনাম হইবে। গ্রামবাসীদের গৌরব বাড়িবে। তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে।

গরীবুল্লা মাতবর বলে, ”আজাহের! তোমার ছাওয়ালের বই-পুস্তক কিনার জন্যি আমি দিব পাঁচ টাহা। কও তো মিঞারা তুমরা কে কি দিবা?” ছমরুদ্দী দিবে দুই টাকা, তাহের দিবে তিন টাকা, তমু টাকা দিতে পারিবে না। সে ছেলের নাস্তা করিবার জন্য দশ সের চিড়া কুটিয়া দিবে। মিঞাজান দিবে এক হাঁড়ি খেজুরে-গুড়।

রবিবারে হাটের দিন এই সব লইয়া আজাহের ছেলের সঙ্গে দেখা করে। সমস্ত জিনিস নামাইয়া টাকাগুলি গণিয়া আজাহের তার গামছার খোট খুলিয়া কতকটা কাউনের ছাতু বাহির করে। “এ গুলান তোর মা পাঠাইছে। আমার সামনে বইসা খা। আর এক কথা,” গামছার আর এক কোণা খুলিয়া আজাহের দুইগাছি ডুমকুরের মালা বাহির করে। “আসপার সময় ফুলী দিয়া গ্যাছে। আর কইছে, বছির বাই যিনি এই ডুমকুরির মালা দুইগাছ গলায় পইরা একটা একটা কইরা ছিড়া খায়।”

আরজান ফকিরের ঘরের মেঝের বসিয়া আজাহের ছেলের সঙ্গে কথা কয়। তাম্বুলখানায় সমস্ত গ্রামের মায়া-মমতা সে যেন ছেলের কাছে লইয়া আসিয়াছে। “বাজান! তুমি কুনু চিন্তা কইর না। তুমার লেহনের বই-কাগজের জন্যি বাইব না। সগল গিরাম তোমার

পাছে খাড়ায়া আছে। আমি যেডা না দিতি পারব ওরা সেডা আইনা দিবি। বাজান! তুমি আরও মন দিয়া লেহাপড়া কর।"

বাপের কথা শুনিয়া বছিরের দুই চোখে পানি আসিতে চাহে। বছির শুধু একাই শত সহস্র অভাব অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে না। তাহার গ্রামবাসীরাও তাহার পিছনে থাকিয়া তাহার জন্য ছোট-খাট কত আত্মত্যাগ করিতেছে। এই সব

ছোট-খাট উপহার সামগ্রীর মধ্যে তাহাদের সকলের শুভ কামনা তাহার অন্তরকে আরও আশান্বিত করিয়া তোলে।

.

৩৮.

সেদিন কি একটা কারণে স্কুলের ছুটি ছিল। বছির চলিল তাহার সেই মসজিদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিতে। তারই মত ওরাও নানা অভাব-অভিযোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। ওদের কথা ভাবিতে ভাবিতে বছিরের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। মনের বল বাড়িয়া যায়।

বছিরকে দেখিয়া মজিদ দৌড়াইয়া আসিল, ইয়াসীন দৌড়াইয়া আসিল। তারপর তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া কত রকমের কথা। সে সব কথা সুখের কথা নয়। অভাব অনটনের কথা। অসুখ-বিসুখের কথা। মজিদের মায়ের খুব অসুখ। মজিদকে দেখিতে চাহিতেছে। কিন্তু সে যাইবে কেমন করিয়া? তাহার বাড়ি সেই মাদারীপুর ছাড়িয়া ত্রিশ

মাইল দূরের এক গ্রামে। সেখানে যাইতে আসিতে অন্ততঃ দশ টাকার প্রয়োজন। মজিদ কোথায় পাইবে এত টাকা? মাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছে না। খোদা না করুন, মা যদি মরিয়া যায় তবে ত জন্মের মত আর তার সঙ্গে দেখা হইবে না। রাত্রে শুইতে গেলে কান্নায় বালিশ ভিজিয়া যায়। অভাব অনটন শুধু তাহাকে অনাহারেই রাখে নাই। কঠিন শৃখলে বাধিয়া তাহার স্নেহ-মমতার পাত্রগুলি হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। ইয়াসীনের দিকে চাহিয়া বছির জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি করতাছাও বাই?” ইয়াসীন বলে, সে হাফেজে-কোরান হইয়া কারী হইবে তখন তাহাকে কোরান শরীফের অর্থ জানিতে হইবে।

এরূপ অনেক কথার পর বছির জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা ভাই! করিম কোথায় গ্যাল? তারে ত দেখতি পাইত্যাছি না।”

মজিদ বলিল, “করিমের একটু একটু জ্বর ঐছিল। ডাক্তার দেইখ্যা কইল, ওর যক্ষা! ঐছে। তহন উকিল সাহেব খবর পায়া ওরে এহান হাইনে তাড়ায়া দিল। যাইবার সময় করিম কানল! আমরা কি করব বাই? আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে কানলাম।”

বছির জিজ্ঞাসা করিল, “উকিল সাহেব ত ইচ্ছা করলি তারে হাসপাতালে বর্তি কইরা দিতি পারতেন। আইজ কাল যক্ষা রোগের কত বাল বাল চিকিৎসা ঐছে।”

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মজিদ বলিল, “কেডা কার জন্যি বাবেরে বাই? মানুষের জন্যি যদি মানুষ কানত, তয় কি দুইনায় এত দুক্ষু থাকত?”

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বছির জিজ্ঞাসা করিল, "করিম এহন কোথায় আছে। তোমরা কবার পার?"

মজিদ বলিল, "তা ত জানি না বাই। তার সঙ্গে দেখা করতি উকিল সাব আমাগো বারণ কইরা দিছেন। তয় হুনছি সে দিগম্বর সান্যালের ঘাটলার ফকির মিছকিনগো লগে থাহে। সে চইলা যাওয়ায় এহন আর আমরা কোথায় কার বাড়ি খাওয়া লওয়া ঐত্যাছে। তার খবর পাই না। কতদিন না খায়াই কাটাই। ও আমাগো কত উপকারে লাগত। আমরা উয়ার কোন উপকারেই আইলাম না।"

বছির বলিল, "বাই। একদিন আমাগো দিন আইব। গরীবের দিন, না খাওয়া ভুখাকা মানষির দিন আইব। তোমরা এখানে থাইকা ইসলামী শিক্ষা লও। আমি ইংরাজী শিহি। তারপর উপযুক্ত হয়া আমরা এমন সমাজ গঠন করব সেহানে দুঃখিত লোক থাকপি না। একজন ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং দিয়া খাবি আর হাজার হাজার লোক না খায়া মরবি এ সমাজ ব্যবস্থা আমরা বাঙব। এই সমাজরে ভাইঙ্গা চূর্ণ বিচূর্ণ কইরা নতুন মানুষের সমাজ গড়ব। তার জন্যি আমাগো তৈরী ঐতি অবি। আরও দুঃখ কষ্ট সহ্য কইরা লেহাপড়া শিখতি অবি।"

মসজিদের বন্ধুদের কাছে বিদায় লইয়া বছির চলিল দিগম্বর সান্যালের ঘাটলায়। চকবাজারের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে ঘাটলায়। ঘাটলার দুইপাশে কত দেশ বিদেশের নৌকা আসিয়া ভিড়িয়াছে। ঘাটলার স্বল্প পরিসর ঘরে নোংরা কাপড় পরা পাঁচ সাত জন ভিখারী পড়িয়া আছে। ও ধারে একজন সন্ন্যাসী তার কয়েক জন ভক্তকে লইয়া গাঁজায়। দম দিতেছে আর নিজের বুজুরকির কাহিনী বলিতেছে। কিন্তু কোনখানেই

ত করিমের দেখা মিলিল না। অনেক খোঁজাখুজির পর এক কোণে একটি লোককে দেখিতে পাইল। মানুষ না কয়খানা হাড়গোড় চিনিবার উপায় নাই!

সামনে যাইতেই লোকটি বলিয়া উঠিল, "ও কেডা বছির বাই নাহি? আমার একটা কথা হুইনা যাও।" বছির বিস্ময়ে লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমারে চিনবার পারলা না বছির বাই! আর চিনবা কেমন কইরা? আমার শরীলে কি আর বস্তু আছে? আমি করিম"।

"করিম! আইজ তুমার এমন অবস্থা ঐছে?" বছির কাছে যাইয়া বসিয়া দুইহাতে করিমের মুখ সাপটাইয়া দিল। সমবেদনার এই স্পর্শে করিমের দু'চোখ বহিয়া ফোঁটায়। ফোঁটায় জলধারা বহিতে লাগিল।

করিম বলিল, "তুমার সঙ্গে যে দেখা অবে তা কুনুদিনই বাবি নাই বছির বাই। দেখা যহন ঐল, তোমার কাছে কয়ডা কথা কব।"

বছির বলিল, "কথা পরে অবি বাই। তুমি বইস। তুমার জন্যি কিছু খাবার আনি।" এই বলিয়া বছির নিজের পকেট হাতড়াইয়া চারিটি পয়সা বাহির করিয়া সামনের দোকান হইতে একখানা রুটি কিনিয়া আনিল।

সেই রুটিখানা করিম এমনই গোগ্রাসে খাইতে লাগিল যে বছিরের ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে গলায় ঠেকিয়া মারা যায়। সে তাড়াতাড়ি তার টিনের কৌটার গ্লাসটায় পানি

লইয়া সামনে বসিয়া রহিল। রুটিখানার শেষ অংশটুকু খাইয়া করিম ঢক ঢক করিয়া টিনের গ্লাসের সবটুকু পানি খাইয়া ফেলিল।

"কতদিন খাই না বছির বাই। রুটিখানা খায়া শরীলে একটু বল পাইলাম। যহন চলতি পারতাম এহানে ওখানে মাইঙ্গা আইনা খাইতাম। আইজ কয়দিন সারা রাইত এমনি কাশি ওঠে যে দিনে আর চলবার পারি না।"

যে জায়গাটায় করিম শুইয়াছিল সেখানে আখের ছুবড়া,ছোবড়া কাগজ প্রভৃতির আবর্জনা জমিয়াছিল। বছির সে সব পরিষ্কার করিয়া তাহার ময়লা চাঁদরের বিছানাটি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সমান করিয়া দিল।

করিম জিজ্ঞাসা করিল, "বছির বাই! তুমি কি আমার মসজিদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করছিলা? কতদিন তাগো খবর পাই না। তারাও আমার খোঁজ লয় না। আর কি কইরাই বা খবর নিবি? উকিল সাব হুনলি তাগো ত আর মসজিদে রাখপি না।"

বছির আচ্ছা করিম! তুমি এখানে রইছ কেন? হুনছি তোমার মা আছে, দুইডা ভাই-বোন আছে। তাগো কাছে চইলা যাওনা কেন?

করিম উত্তর করিল, "তাগো কাছেই যাবার চাইছিলাম। কিন্তু উকিল সাব কইলেন আমার এ ব্যারাম ছোঁয়াইচা। আমি যদি বাড়ি যাই, আমার মার–আমার ভাই-বোনগো এই ব্যারাম ঐব। হেই জন্যিই বাড়ি যাই না। আমি ত বাঁচপই না। আমার মা, ভাই-বোনগো এই ব্যারাম দিয়া গেলি কে তাগো দেখাপ? আর হোন বাই! তুমি যে আমারে চুইলা, বাড়ি

যায়া সাবান পানি দ্যা গাও গতর পরিষ্কার কইরা নিও। বড় বুল। করছি বাই। কেন আমারে ‘বার সময় তোমারে বারণ করলাম না?”

“আমার জন্যি তুমি বাইব না করিম! আমি তোমারে ডাক্তার খানায় নিয়া বর্তী করায়া দিব।”

“ডাক্তারখানায় আমি গেছিলাম বছির ভাই। তারা এই ব্যারামের রোগীগো বর্তী করে না। হুনছি ডাহার শহরে এই ব্যারামের হাসপাতাল আছে। সেহানে বর্তী ঐতে অনেক টাহা পয়সা দিয়া ফটোক উঠায়া পাঠাইতি অয়। তা আমি হেই টাহা পয়সা কোথায় পাব? আমার জন্যি বাইব না বছির বাই। কালে যারে দরছে তারে কে উদ্ধার করবি।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া করিম বলিল, “আচ্ছা বছির বাই! আমার মসজিদের দোস্তগো লগে তোমার দেখা অয়?”

“আইজ তাগো ওহানে গেছিলাম। তারাই ত তোমার খবর কইল।”

“তারা সব বাল আছে? মজিদ, আরফান, আজিম, ওরা বাল আছে?”

“তারা সগলেই তোমার কথা মনে করে।”

“দেহ বাই! আমি এখানে পইড়া আছি। কোথায় কোথায় মেজবানী হয় তাগো খবর। দিবার পারি না। হয়ত ওরা কতদিন না খাইয়া থাহে। মজিদরে তুমি কইও বাই! ওরা যেন রোজ মাছের বাজারে আর দুধির বাজারে যায়। এ সগল জায়গায় একজন না

একজন অনেক মাছ কেনে–অনেক দুধ কেনে। তাগো বাড়িই মেজবানী হয়। বাজারের মদ্দিই তাগো ঠিক ঠিকানা জাইনা নিয়া তাগো বাড়ি গেলিই ঐল। ফুরকানিয়া মাদ্রাসার তালেম-এলেমগো কেউ না খাওয়ায়া ফিরায়া দিবি না। মজিদের সঙ্গে দেখা কইরা এই খবরডা তারে কইও।”

“তা কব বাই। করিম! তুমি এহন ঘুমাও। আমি বাড়ি যাই।”

“হ যাও বাই! যদি বাইচা থাহি আর একবার আইসা আমারে দেইখা যাইও! তোমারে কওনের আমার একটা কথা আছে।”

বাড়িতে ফিরিয়া ফকির-মার কাছে বছির করিমের সকল ঘটনা বলিল।

ফকির-মা বলিল, “বাবা! আমি একদিন যায়া ওরে দেইখা আসপ।”

সত্য সত্যই বছিরকে সঙ্গে লইয়া ফকির-মা একদিন করিমকে দেখিতে আসিল। সেদিন করিমের অবস্থা খুবই খারাপ। জ্ঞান আছে কি নাই। ফকির-মা তার আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ করিমকে বাতাস করিল। মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে করিমের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চক্ষু মেলিয়া করিম ডাকিল, “মা! মাগো!”

ফকির-মা বলিল, “এই যে গোপাল। আমি তোমার সামনে বইসা আছি।”

চক্ষু মেলিয়া করিম দেখিল, শিয়রে বসিয়া যে মেয়েটি তার চোখে মুখে হাত বুলাইতেছে সে তার নিজের মা নয়। কতই যেন নিরাশার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার

চক্ষু মুদ্রিত করিল। ফকির-মা সবই বুঝিতে পারিল। সে তাহার চুলের মধ্যে নখ বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “বাজান! মায়ের কোন জাতি নাই। সকল মায়ের মধ্যে তোমার সেই একই মা বিরাজ করত্যাছে। আমার ফকির কইছে,

নানান বরণ গাভীরে একই বরণ দুধ,
আমি জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

গোপাল! একবার চক্ষু মেলন কইরা চাও।”

করিম চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ফকির-মা গ্রাম হইতে একটু দুধ লইয়া আসিয়াছিল। তারা ধীরে ধীরে করিমের মুখে ঢালিয়া দিল। দুধটুকু পান করিয়া করিমের একটু আরাম বোধ। হইল। ফকির-মার হাতখানা বুকের উপর লইয়া করিম বলিল, “ফকির-মা! আমার ত দিন শেষ হয়া আইছে। কিন্তুক আমার ভড়ই ভয় করতাছে।”

ফকির-মা তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিল, “বাজানরে! আমার ফকির কইছে কোন কিছুতেই ভয় করতি নাই। মরণ যদিই বা আসে তারে গলার মালা কইরা নিবি। মরণ তো একদ্যাশ থইনে আর এক দ্যাশে যাওয়া। সে দ্যাশে হয়ত এমুন দুস্কু কষ্ট নাই। হয়ত সে দ্যাশে তোমার মায়ের চায়াও দরদী মা আছে–বন্ধুর চায়াও দরদী বন্ধু আছে। নতুন দ্যাশে যাইতি মানুষ কত আনন্দ করে। যদি সে দ্যাশে তোমার যাইতিই হয়, মুখ কালা কইরা যাইও না বাজান! খুশী মনে যাইও ।”

ফকির মায়ের হাতখানা আরও বুকের মধ্যে জড়াইয়া করিম বলিল, “ফকির-মা! তোমার কথা শুইনা বুকির মদ্দি বল পাইলাম। আমার মনে অনেক সাহস আইল।”

ফকির-মা বলিল, “বাজানরে! আমার ফকির যে আনন্দ ধামে বিরাজ করে। তাই যেহানে যাই, সেহানেই আমার ফকির আনন্দ আইনা দেয়। আমার ফকিরের দরবারে নিরাশা নাই বাজান!” এই বলিয়া ফকির-মা একটি গান ধরিল–

ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা
আমারে নিও তোমার নায়।
পদ্মা নদীর তুফান দেইখ্যা
প্রাণ করে হায় হায়,
ও মাঝি শক্ত কইরা হাইল ধরিও
আজকা আমার ভাঙা নায়।
আমি অফর বেলায় নাও ভাসাইলাম
অকুল দরিয়ায়;
কূলের কলঙ্ক হবে
যদি তরী ডুইবা যায়।
তুফানের বানাইছি বাদাম
মেঘের বানছি ছয়া,
ঢেউ-এর বৈঠা বায়া মাঝি
আমারে যাও লয়া।
ডুবুক ডুবুক ভাঙা তরী
ডুবুক বহু দূর,
ডুইবা দেখব কোথায় আছে

ডবুনিয়ারপুর।

গান গাহিতে গাহিতে ফকির-মার দুইচোখ জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গান শেষ হইলে করিম বছিরকে কাছে ডাকিয়া বলিল, “বছিরবাই! তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। সেদিন কইবার পারি নাই। আজ তোমারে কয়া যাই।”

আরও নিকটে আসিয়া বছির বলিল, “কও ত বাই! কি কথা?”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া করিম বলিল, “বছিরবাই! আমার দিন ত ফুরায়াই আইছে। মা বাপের লগে আর দেখা অবি না। তারা যদি হোনে আমি পথে পইড়া মরছি সে শোগ তারা পাশরতি পারবি না। তুমি তাগো কাছে কইও, আমি হাসপাতালে যায় মরছি। অনেক বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আমার চিকিচ্ছা করছে। আমার কোরান শরীফখানা আমার মা জননীরে দিও। এই কেতাবের মদ্দি অনেক সান্ত্বনার কথা আছে। কাউরে দিয়া পড়ায়া মা যেন তা শোনে। তাতে সে আমার যোগ কতকটা পাশরতি পারবি।” এই বলিয়া করিম হাঁপাইতে লাগিল।

বছির করিমের মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “ভাই করিম! তুমি অত কথা কইও না। দেখছাও না তুমি কেমন হাঁপায়া উঠছাও। একটু চুপ কইরা থাহ।”

করিম বলিল, “না বাই! আমারে চুপ করতি কইও না। আমার বেশী সময় নাই! আর একটা মাত্র কথা। আমার ঝুলির মদ্দি একগাছা রাঙা সূতা আছে। আমার ছোট বোনটিরে নিয়া দিও। তারে কইও, তার গরীব ভাইজানের ইয়ার চাইতে বাল কিছু দিবার শক্তি ছিল না।” বলিতে বলিতে করিমের কাশি উঠিল। সেই কাশিতে তার বুকখানা যেন

ফাটিয়া যাইবে । তারপর আস্তে আস্তে সে চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল। তার মুখখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফকির-মা আবার গান ধরিল–

চল যাইরে,
আমার দরদীর তালাশেরে
মন চল যাইরে।

.

৩৯.

দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চইলা যায়। বিহানের শিশির ধারা দুপুরে শুখায়। বারো জঙ্গ করে মদ্দ কিতাবে খবর, তের জঙ্গ লেখা যায়রে টঙ্গির শহর। জেলা স্কুল হইতে পাশ করিয়া বছির ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ হইতে জলপানি পাইয়া আই, এস, সি, পাশ করিয়া বিলাত চলিল জীবাণু বিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করিতে। এত পথ সে কি করিয়া পার হইবে? কোন-জাহাজের খালাসী হইয়া যাইবে। বিলাতে যাইয়া সে প্রথমে সিলেটিদের হোটেলে কাজ করিবে? তারপর সুযোগ মত পড়াশুনা করিবে।

তার জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনীর সঙ্গে কতক তার নিজের অক্লান্ত তপস্যা, কতক তার অভাব অনটনকে জয় করার অপরিসীম ক্ষমতা মিশিয়া রহিয়াছে। তাহার সঙ্গে আরও রহিয়াছে তাহার অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের শুভকামনা। তাই তাহার এই সাফল্যে সমস্ত গ্রাম গৌরবান্বিত।

রাত্রে গ্রামের সকল লোক আসিয়া জড় হইল তাহাদের উঠানে। গরীবুল্লা মাতবর, তাহের লেংড়া, মাকিম, তমু সকলের আগে আসিল।

গরীবুল্লা মাতবর বলিল, "তা বাবা বছির! তুমি আমাগো গিরামের নামডা আসমানে। উঠাইলা। বিদ্যাশে বিভূঁইয়ে চলছাও। আমাগো কথা মনে রাইখ।"

বছির উত্তর করিল, "চাচা! আমার জীবনের যত সুখ্যাতি তার পিছে রইছে আপনাগো দোয়া আর সাহায্য। আপনারা যদি আমারে সাহায্য না করতেন তয় আমি এতদূর যাইতি পারতাম না। ফইরাতপুরির ইস্কুলে পড়নের সময় যহন বাজান গামছায় বাইন্দা পাটালী গুড় নিয়া গ্যাছে আর আমারে কইছে, মাতবরের বউ দিছে তোরে খাইবার জন্যি; তহন আমার মনে যে কত কথার উদয় হইতে তা আপনাগো বুজাবার পারব না। গিরামের সবাই আমারে কিছু না কিছু সাহায্য করছে। আপনারা সগলে চান্দা তুইলা আমার পড়ার খরচ দিছেন। আপনাগো উপকারের পরিশোধ আমি কুনুদিন দিতি পারব না।"

গরীবুল্লা মাতবর বলিল, "বাজান! তোমার কুনু পরিশোধ দিতি অবি না। তুমি সগল। বিদ্যা শিখা বড় হয়া আইস, তাতেই আমাগো পরিশোধ হবি।"

আজাহের আওগাইয়া আসিয়া বলিল, "ওসব পরিশোধের কথা আমি বুজি না। আমাগো গিরামের লোক অর্ধেক হয়া গ্যাল ম্যালোয়ারী জ্বরে। তুই বিলাত গুণা ম্যালোয়ারী জ্বরের ওষুধ শিহা আসতি পারবি কিনা তাই সগলরে ক? এমুন দাওয়াই শিহা আসপি যা খাইলি কাউরও ম্যালোয়ারী অবি না।"

বছির উত্তর করিল, “আমি ত ম্যালোয়ারী জ্বরের উপর গবেষণা করতিই বিলাত যাইতাছি। আপনারা দোয়া করবেন, আমি যেন সগল কাম হাছিল কইরা আসতি পারি। দ্যাশে আইসা অনেক কাম করতি হবি। এই গিরামে একটা ইস্কুল অবি। একটা হাসপাতাল অবি। আর অবি একটা কৃষি বিদ্যালয়। আরো অনেক কিছু করতি অবি। তার। আগে আমার বড় ঐতি অবি। অনেক টাহা উপার্জন কইরা তবে এই সব কামে হাত দিতি। অবি।”

গরীবুল্লা মাতবর বলিল, “বাবা বছির! আমরা সগলে দোয়া করি তোমার মনের ইচ্ছা যেন হাসেল হয়।”

গ্রামের সকলে একে একে বিদায় হইয়া চলিয়া গেল। হুঁকো টানিতে টানিতে আজাহের ছেলেকে বলিল, “বাজান! আর কয়দিন পরে তোমার বিলাত যাইতি অবি?”

বছির উত্তর করিল, “আরও পনর দিন পরে আমাকে রওয়ানা ঐতি অবি।”

“বাজান! একটা কতা আমাগো মনের মদ্দি অনেকদিন দইরা আনাগোনা করতাছে। আইজ তোমারে কইবার চাই। মাতবরের ম্যায়া ফুলীরে ত তুমি জানই। আমাগো দুইজনের ইচ্ছা, ফুলীরে বউ কইরা গরে আনি। মাতবরেরও মনে বড় আশা।”

বছিরের মা সামনে বসিয়া বসিয়া সুতলী পাকাইতেছিল। সে কান পাতিয়া রহিল বছির কি উত্তর করে।

বছির বলিল, "বাজান! আমার জীবনডারে আগে গইড়া নিতি দ্যান। এহন আমি কাটার উপর দিয়া পথ চলতাছি। আপনারা জানেন না এই লেহাপড়া শিখতি আমারে কত দুস্কু কষ্ট সইতি ঐছে। আইজ আমার কাছে বিয়া করার কথা একটা হাসি-তামাসার মত মনে হয়।"

বছিরের মা বলিল, "বাবা বছির! তুই না করিস না। ফুলুরে গরে আইনা আমি .. আমার বড়র শোগ পাশরি। বড়র বড় আদরের সাথী ছিল ফুলু।"

বছির নত হইয়া উত্তর করিল, "মা! আমি যাইত্যাছি সাত সমুদ্র তের নদীর উপারে। বাজান যা কামাই করে তাতে তোমাগো দুইজনের খাওনই জোটে না। এর উপর আমার একটা বউ আইলে তারে তোমরা কেমন কইরা খাওন দিবা?"

আজাহের বলিল, "আমাগো কি খাওন দিবার শক্তি আছেরে বাজান? খাওন আল্লায় দিব।"

বছির উত্তর করিল, "না বাজান! আল্লায় খাওন দেয় না। মানুষের খাওন মানুষের জোগাড় কইরা নিতি অয়। তোমাগো পায়ে ধরি, তোমরা আর আমারে এ সগল কথা কইও না।"

আজাহের বুঝিল ছেলের এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াছে। বই পুস্তক পড়িয়া তার অনেক বুদ্ধি হইয়াছে। সে যাহা বুঝিয়াছে হয়ত তাহাই তাহার পক্ষে ভাল। তাই বউকে বলিল, "বছিরের মা! তুমি ওরে আর পীড়াপীড়ি কইর না। ও লেহাপড়া শিখ্যা মানুষ হয়া আসুক। তখন ওর বউ ও নিজেই বাইছা নিতি পারবি।"

রাত অনেক হইয়াছে। বছির শুইয়া পড়িল। মা বছিরের পাশে শুইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। ছেলে আর মাত্র পনরটা দিন তাহার কাছে থাকিবে। তারপর চলিয়া যাইবে সেই কত দূরের দেশে। সেখান হইতে কবে ফিরিতে পারিবে কে জানে? ছেলের ফেরার আগে যদি মায়ের মরণ হয়, তবে ত মরিবার আগে ছেলের মুখ দেখিতে পাইবে না! তবুও যাক–ওর জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া দেশে ফিরিয়া আসুক। ছেলেকে বাতাস করিতে করিতে মায়ের কত কথাই মনে পড়ে। ও যখন এতটুকু ছিল। শেষ রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া খেলা করিত। তারা স্বামী স্ত্রী দুইজন ছেলের দুই পাশে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। ভাঙা ঘরের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া ছেলের মুখে পড়িত। ভাবিতে ভাবিতে মা স্বপ্ন দেখে বছির যেন আবার এতটুক হইয়া গিয়াছে। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহার ঘরের মেঝেয় বসিয়া পিঠা খাইতেছে। তারপর সে বড় হইয়া শহরে গেল লেহাপড়া করিতে। কে যেন যাদুকর বছিরের বিগত জীবনের সমস্ত কাহিনী পুতুল নাচের ছবিতে ধরিয়া মায়ের চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে।

পরদিন সকালে ভোরের পাখির কলকাকলীতে বছিরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া বেড়াইতে বাহির হইবে এমন সময় ফুলী আসিয়া উপস্থিত। এতদিন সে ফুলীর চেহারার দিকে লক্ষ্য করে নাই। তার মৃত বোন বড়ুরই প্রতীক হইয়া সে তাহার মনের স্নেহধারায় সিঞ্চিত হইত। তাহা ছাড়া নানা অভাব-অভিযোগ, দৈন্য-অবহেলার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে। কোন মেয়েকে সুন্দর বলিয়া দেখিবার সময় তাহার কখনো হয় নাই। সেই ছোটবেলা হইতে ফুলীকে যেমনটি দেখিত, তাহার মনে হইত সে যেন তেমনটিই রহিয়াছে। কাল পিতার নিকট

ফুলীর সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া আজ ফুলীকে সে নতুন দৃষ্টি লইয়া দেখিল।

মরি! মরি! কি লাবণ্যই না ফুলীর সারা দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কে যেন দীঘির কলমী ফুলটি আনিয়া তাহার সুন্দর হাসিভরা মুখে ভরিয়া দিয়াছে। হলুদে আর লালে মেশান অল্প দামের শাড়ীখানা সে পরিয়া আসিয়াছে। সেই শাড়ীর আড়াল হইতে তার হলুদ রঙের বাহু দুইখানা যেন আকর্ষণের যুগল দুইখানা ধনু তাহার দিকে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। মুগ্ধ হইয়া বছির অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই চাঁদ হয়ত আকাশ ছাড়িয়া আজ তাহার আঙিনায় আসিয়া খেলা করিতেছে। হাত বাড়াইলেই তাহাকে ধরা যায়; তাহাকে বুকের অন্ধকার ঘরের প্রদীপ করা যায়; কিন্তু বিলম্ব করিলে এই চাঁদ যখন আকাশে চলিয়া যাইবে, তখন শত ডাকিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু বছির এ কি ভাবিতেছে! তার জীবনের সম্মুখে যে সুদীর্ঘ পথ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। সে পথে কত বিপদ, কত অভাব-অনটন, তার গতিধারা সে ত এখনও জানে না। সে জীবন পথের যোদ্ধা। সংগ্রাম শেষ না হইলে ত তাহার বিশ্রাম লইবার ফুরসত হইবে না।

এই সরলা গ্রাম্য-বালিকার মনে সে যদি আজ তার প্রতি এতটুকুও আকর্ষণের ফুল ফুটিবার সুযোগ দেয় তবে যে জাহান্নামেও তার স্থান হইবে না।

ফুলী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, “কি বছিরবাই! কথা কও না ক্যান? কাল । রাইতিই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবার আসত্যাছিলাম।”

বছির বলিল, "মা ওইখানে পাকের ঘরে আছে। যাও ফুলী। মার কাছে যাও।"

"তা তো যাবই বছিরবাই। কিন্তুক কাইল রাইতি আইলাম না ক্যান হেই কথাডা আগে কই। তোমার জন্যি আইজ ছয়মাস ধইরা একখানা কাঁথা সিলাই করত্যাছিলাম। আইজ সারা রাইত জাইগা এডারে শেষ করলাম। দেখত বছির বাই কেমন ঐছে?"

এই বলিয়া ফুলী তার আঁচলের তলা হইতে কাঁথাখানা মেলন করিয়া ধরিল। দেখিয়া বছির বড়ই মুগ্ধ হইল। কোন শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া এই গ্রাম্য মেয়েটি অঙ্কন পদ্ধতির সীমা-পরিসীমার (Proportion) জ্ঞান লাভ করে নাই। নানা রঙ সামনে লইয়া এ-রঙের সঙ্গে ওরঙ মিশাইয়া রঙের কোন নতুনত্বও সে দেখাইতে পারে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় হইতে লাল, নীল, হলুদ ও সাদা–মাত্র এই কয়টি রঙের সূতা উঠাইয়া সে এই নক্সাগুলি করিয়াছে। শিল্প-বিদ্যালয়ের সমালোচকেরা হয়ত ইহার মধ্যে অনেক ভুলত্রুটি ধরিতে পারিবেন কিন্তু তাহার সাধারণ সৌন্দর্য অনুভূতি লইয়াই সে বুঝিল এমন শিল্পকার্য সে আর কোথাও দেখে নাই। কাঁথার মধ্যে অনেক কিছু ফুলী আঁকে নাই। শুধু মাত্র একটি কিশোর-রাখাল বাঁশী বাজাইয়া পথে চলিয়াছে। আর একটি গ্রাম্য-মেয়ে কাঁখে কলসী লইয়া সেই বাঁশী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। পুকুরে কয়েকটি পদ্মফুল ভাসিতেছে। তাহাদের দলগুলির রঙে বংশীওয়ালার প্রতি সেই মেয়েটির অনুরাগই প্রকাশ পাইতেছে। বছির বুঝিল, তার জীবনের সুদীর্ঘ পথের কাহিনী বাঁশীর সুরে ভাসিয়া বহুকাল ধরিয়া ওই জল-ভরণ-উদ্যতা মেয়েটির অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তারই মনের আকুতি রূপ পাইয়াছে ওই চলন্ত মাছগুলির মধ্যে, ওই উড়ন্ত পাখিগুলির মধ্যে এই ক্ষুদ্র কাঁথার উপরে ফুলী এতগুলি নক্সা এবড়ো থেবড়ো ভাবে বুনোট করে নাই। যেখানে যে নকসাটি মানায়—যে রঙটি যে নকসায় শোভা করে সেই ভাবেই ফুলী কাঁথাখানি তৈরী

করিয়াছে। আর সবগুলি নকসই বাঙালীর যুগ যুগান্তরের রস-সৃষ্টির সঙ্গে যোগ–সংযোগ করিয়া হাসিতেছে। বছির অনেক বড় বড় কেতাবে সূচিকার্য রূপান্তরিত রাফেলের ভুবন বিখ্যাত ছবিগুলির প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছে। এখানে যাহারা সূচিকার্য করিয়াছে তাহারা বহু বৎসর সুদক্ষ শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। তাহাদের শিল্প কার্যে নিজস্ব কোন দান নাই। রাফেল যেমনটি আঁকিয়াছেন তাহারই অনুকৃতি করিয়াছে। কিন্তু এই অশিক্ষিতা পল্লী বালিকার নকসায় যে অপটু হাতের ভুলত্রুটি রহিয়াছে তাহারই গবাক্ষ পথ দিয়া মনকে শিল্পীর সৃজিত রসলোকে লইয়া যায়। সৃষ্টিকার্য মেয়েটি করিয়াছে শুধুমাত্র তাহারই জন্য। কতদিনের কত সুদীর্ঘ সকাল দুপুরে সূক্ষ শুই ধরিয়া একখানা মূক-কাপড়ের উপর সে তাহার অনুরাগের রঙ মাখাইয়া দিয়াছে। জীবনে বহু ভাগ্যের অধিকারী না হইলে এই। অপূর্ব দানের উপযুক্ত হওয়া যায় না। তবু এই দানকে তাহার প্রত্যাখান করিতে হইবে। এই সরলা পল্লী-বালিকার মনে তাহার প্রতি যে অনুরাগের রঙ লাগিয়াছে তাহা নিষ্ঠুর হাতে মুছিয়া যাইতে হইবে। নতুবা পরবর্তী জীবনে এই ভোরের কুসুমটি যে দুঃখের অগ্নিদাহনে জ্বলিবে, তাহার হাত হইতে কেহই তাহাকে নিস্তার করিতে পারিবে না।

ফুলী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,”বছির বাই! আমার কাঁথাখানা কেমন ঐছে কইলা না ত?”

বছির বলিল, “মন্দ হয় নাই। এখানা তুমি যত্তন কইরা রাইখ। একদিন কামে দিবি।”

এ কথা শুনিয়া ফুলীর মনটা কেমন করিয়া উঠিল। সে আশা করিয়াছিল বছির তাহার এত যত্নে তৈরী করা কথাখানা পাইয়া কতই না উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

সেবার একখানা রুমালের উপর মাত্র একটা ফুল তুলিয়া ফুলী তাহাকে দিয়াছিল। তাই পাইয়া বছিরের কত আনন্দ। সে শহরে যাইয়াও বন্ধু-বান্ধবদের তাহা দেখাইয়া বলিয়াছে, আমার বোন এই ফুলটি করিয়া দিয়াছে। সেই খবর আবার বছির বাড়ি আসিয়া তাহাকে শুনাইয়াছে। কিন্তু এতদিন ভরিয়া যে কথাখানা সে এত সুন্দর করিয়া তৈরী করিয়াছে, যাহা দেখিয়া পাড়ার সকলেই তাহাকে কত প্রশংসা করিয়াছে–সেই কথাখানা দেখিয়া বছির ভাই কিনা বলিল–মন্দ হয় নাই।

ম্লান হাসিয়া ফুলী বলিল, “আমি কেন তোমার কথাখানা যত্তন কইরা রাখতি যাব? তোমার জন্যি বানাইছি। তোমার যদি মনে দরে যা খুশী তাই কর এটা নিয়া।” বলিতে। বলিতে ফুলী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু বছিরকে আজ নিষ্ঠুর হইতেই হইবে। কিছুতেই সে তার মনের দৃঢ়তা হারাইবে না।

সে বলিল, “আমি ত কয়দিন পরে বিলাত চইলা যাব। তোমার কথা দিয়া করব কি? সে দ্যাশের লোক এটা দেখলি হাসপি ঠাট্টা করবি।”

ম্লান মুখে ফুলী কাঁথাখানা গোটাইয়া ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। বছিরের মা বলিল, “ও ফুলী! এহনই আইলি আর চইলা গেলি। আয়-আয় হুইনা যা।” ফুলী ফিরিয়াও চাহিল না।

ফুলীর চলিয়া-যাওয়া পথের দিকে বছির চাহিয়া রহিল। তাহার প্রতিটি পদাঘাতে সে যেন বছিরের মনে কোন অসহনীয় বিষাদের কাহিনী লিখিতে লিখিতে তাহার দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহা ছাড়া বছির আর কিইবা করিতে পারিত। তবু ফুলীর সুন্দর

মুখোনি কে যেন রঙিন তুলি দিয়া তার মনের পটে আঁকিয়া দেয়। সেই ছবি সে জোর করিয়া মুছিয়া ফেলে কিন্তু আরও উজ্জ্বল হইয়া–আরও জীবন্ত হইয়া সেই ছবি আবার তাহার মনের-পটে আঁকিয়া ওঠে। এ যেন কোন চিত্রকর জোর করিয়া তাহার মনের-পটে নানা চিত্র আঁকিতেছে। তাহাকে থামাইতে গেলেও থামে না।

কলমী ফুলের মত সুন্দর মেয়েটি ফুলী! গ্রামের গাছপালা লতা-পাতা তাদের গায়ের যত মায়া-মমতা সব দিয়া যেন তাহার সুন্দর দেহটিকে আরও পেলব করিয়া দিয়াছে। বনের পাখিরা দিনের পর দিন এ-ডালে ও-ডালে গান গাহিয়া তার কণ্ঠস্বরটিকে আরও মিষ্ট করিবার শিক্ষা দিয়াছে। তার সারা গায়ে রঙ মাখাইয়াছে সোনালতা। রঙিন শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে সেই রঙ যেন ঈষৎ বাহির হইয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া যায়। যে পথে দিয়া সে চলে সে পথে সেই রঙ ঝুমঝুমি হইয়া বাজিতে থাকে।

এই ফুলীকে সে যেন কোনদিনই দেখে নাই। ও যেন গাজীর গানের কোন মধুরতর সুরে রূপ পাইয়া তাহার সামনে আসিয়া উদয় হইয়াছিল। রহিমদ্দী চাচার সেই গানটি আজ বার বার বছিরের কণ্ঠ হইতে কোন সাত সাগরের কান্না হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল।

‘ও আমি স্বপ্নে দেখলাম
মধুমালার মুখহে।’

এই মধুমালাকে পাইবার জন্য সে সপ্তডিঙা মধুকোষ সাজাইয়া সাত সাগরে পাড়ি দিবে–কত পাহাড়-পর্বত ডিঙাইবে–কত বন-জঙ্গল পার হইবে। মধুমালা! মধুমালা! মধুমালা! যেমন করিয়াই হোক এই মধুমালাকে সে লাভ করিবেই করিবে। কিন্তু তার জীবনের যে

সুদীর্ঘ পথ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। দেবলোক হইতে অমৃত আনিয়া যে তাহার দেশবাসীকে অমর করিয়া তুলিতে হইবে। শত শত মূঢ় ম্লান মুক মুখে ভাষা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যুগে যুগে যাহারা বঞ্চিত হইয়াছে–নিপীড়িত হইয়াছে–শোষিত হইয়াছে, তাহারাই আজ মূর্ত হইয়া আছে তার পিতার মধ্যে, তার মায়ের মধ্যে, তার শত শত গ্রামবাসীদের মধ্যে। স্বর্গ হইতে বিদ্যার অমৃত আনিয়া যে তাহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে–পীড়নের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। তবু ফুলী! ফুলী! আমার সোনার ফুলী! তোমাকে বছির ভূলিতে পারে না। সরলা কিশোরী বালিকা। যৌবনের ইন্দ্রপুরী আজ তার সম্মুখে তোরণদ্বার সাজাইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মরি! মরি! কি সুন্দর রূপ! তার সুন্দর দেহের সারিন্দা হইতে কোন অশরীরী সুরকার দিন রজনীর দু'খানা পাত্র ভরিয়া কোন অনাহুত সুরের মদিরা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। ফুলী! ফুলী–আমার সুন্দর ফুলী! সরষে খেত রচনা করিব আমি তোমার গায়ের বর্ণ ফুটাইতে। পাকা পুই-এর রঙে তোমার অধরের লালিমা ধরিয়া রাখিব। কলমী ফুলের রঙিন পাত্রে তোমার হাসিখানি ভরিয়া দেখিব। ফুলী! ফুলী! তুমি আমার! তুমি আমার! আকাশের চঁাদ তুমি মাটির আঙিনায় নামিয়া আসিয়াছ। হাত বাড়াইলেই তোমাকে ধরিতে পারি। আর তোমাকে আকাশে ফিরিয়া যাইতে দিব না।

না–না–না, এ কি ভাবিতেছে বছির? জীবনের পথ যে আরও–আরও দুর-দুরান্তরে বাঁকাইয়া গিয়াছে? এ পথের শেষ অবধি যে তাহার্কে যাইতে হইবে? একটা মেয়ের মোহে ভুলিয়া সে তার জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিবে? তাই যদি হয় তবে এতদিন কষ্ট করিয়া অনাহারে থাকিয়া আধপেটা খাইয়া সে কেন এত তপস্যা করিয়াছে? বড়র কবরে বসিয়া সে যে তার দেশবাসীর কাছে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছে। সে কে? তার নিজস্ব বলিতে ত সে নিজের কিছুই রাখে নাই। আনন্দ বিশ্রামের সুখ, নিদ্রার স্বপ্ন

সবকিছু যে তার আদর্শবাদের কাছে উৎসর্গীত। তার সেই বিপদসঙ্কুল দুঃখ-দৈন্য অভাবময় জীবনের সঙ্গে এই সরলা গ্রাম্য বালাকে সে কিছুতেই যুক্ত করিয়া লইবে না।

তবু ফুলু-ফুলের মত ফুলুর মুখখানা বছিরের মনে ভাসিয়া ওঠে। না-না এ কখনো হইতে পারিবে না। যেমন করিয়া বছির অনাহার জয় করিয়াছে, নানা লোকের অপমান অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, তেমনি করিয়া সে আজ ফুলর চিন্তা তাহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিবে। বার বার বছির তার বিগত দিনগুলির কথা চিন্তা করে। তারা যেন শক্তি-উদ্দীপক মন্ত্র। সেই মন্ত্রের জোরে সে সম্মুখের ঘোর কূজাটি পথ অতিক্রম করিয়া। যাইবে।

পরদিন সকালে বছির বড়ুর কবরে আসিয়া দেখিল, কোন্ সময় আসিয়া ফুলু তাহার রঙিন কাঁথাখানা ঘরের উপর মেলিয়া দিয়া গিয়াছে। সে যেন তার মনের সকল কথা এই কথার উপর অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। এই পল্লী-বালার যে অনুরাগের নিদর্শন বছির গ্রহণ করে নাই তাই যেন সে কবরের তলায় তার ঘুমন্ত বোনটির কাছে জানাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেই মেয়েটির কাছে জানাইয়া গিয়াছে হাসি খেলায় যে তার সব সময়ের সঙ্গিনী ছিল, যার কাছে সে তার মনের সকল কথা বলিতে পারিত।

কাঁথাখানির দিকে চাহিয়া আবার ফুলুর সুন্দর মুখোনির কথা বছিরের মনে পড়িল। কিন্তু কিই বা সে করিতে পারে? তাহার জীবন-তরী যে কোন গাঙে যাইয়া কোথায়। ভিড়িবে সেই অনিশ্চিতের খবর সে নিজেও জানে না। সেঁতের শেহলার মত সে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেই সুদূর লণ্ডন শহরে যাইয়া সে নিজে উপার্জন করিয়া পড়াশুনার খরচ চালাইবে। সেখানে কত অভাব, কত দৈন্য, কত অনাহার তাহার জন্য অপেক্ষা

করিতেছে। এই জীবন সংগ্রামে সে টিকিয়া থাকিবেনা পথের মধ্যেই কোথাও শেষ হইয়া যাইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? আহা! এই সরলা গ্রাম বালিকা! একে সে তার সংগ্রাম-বহুল জীবনের সঙ্গে কিছুতেই জড়াইবে না। ফুল–আমার সোনার ফুল? তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। হয়ত তোমাকে ব্যথা দিয়া গেলাম, কিন্তু তোমার ব্যথার চাইতেও অনেক ব্যথা আমি আমার অন্তরে ভরিয়া লইয়া গেলাম।

ভাবিতে ভাবিতে বছিরের মনে ছবির পর ছবি উদয় হয়। কোন গ্রাম্য-কৃষাণের ঘরে যেন ফুলুর বিবাহ হইয়াছে। কলা পাতায় ঘেরা ছোট্ট বাড়িখানি। খড়ের দু'খানা ঘর। তাহার উপরে চালকুমড়ার লতা আঁকিয়া বাকিয়া তাহারই মনের খুশীর প্রতীক হইয়া যেন এদিক ওদিক বাহিয়া চলিতেছে! দুপুরে সুগন্ধি আউস ধানের আঁটি মাথায় করিয়া তাহার কৃষাণ স্বামী বাড়ি ফিরিবে। লেপা-পোছা আঙিনায় তাহার মাথার বোঝা নামাইয়া হাতে বোনা রঙিন পাখা দিয়া সে তাহাকে বাতাস করিবে। মরাই-ভরা ধান-গোয়াল-ভরা গরু। বারো মাসের বারো ফসল আসিয়া তাহার উঠানে গড়াগড়ি করিবে। সন্ধ্যাবেলা আঁকা বাঁকা গেঁয়ো পথ দিয়া কাখে কলস লইয়া সে নদীতে জল আনিতে যাইবে। ধানের ক্ষেতের ওধার দিয়া কোড়াকুড়ী ডাকিয়া দিগদিগন্ত মুখর করিবে। পাট ক্ষেতের মাঝখান দিয়া যাইতে সে ক্ষণেক পঁড়াইয়া একগুচ্ছ বৌটুনী ফুল তুলিয়া খোঁপায় গুজিবে। তারপর গাঙের ঘাটে যাইয়া ও-পাড়ার সম-বয়সিনী বউটির সঙ্গে দেখা হইবে। দুইজনের কারো কথা যেন ফুরাইতে চাহিবে না। হয়ত বিগত রাতের কোন সুখ স্বপ্নের কথাযা ভাষায় প্রকাশ করা। যায় না; আকারে ইঙ্গিতে একের কথা অপরে বুঝিতে পারে। তারপর ভরা কলস কাঁখে করিয়া ঘরে ফিরিতে পথের মধ্যে কোথাও কার্যরত তাহার কৃষাণ স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। চকিতে তাহাকে একটি চাহনী কুস উপহার দিয়া সে ত্বরিতে ঘরে ফিরিবে! আহা! এই স্বপ্ন যেন ফুলুর জীবনে নামিয়া আসে! এই সুখ-স্বর্গ হইতে বছির

কিছুতেই এই মেয়েটিকে নামাইয়া আনিয়া তাহার দুঃখময় জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিবে না। নানা-না, কিছুতেই না।

.

৪০.

আজ তিন চার দিন বছির বাড়ি আসিয়াছে। সেই যে সেদিন নিজের বোনা কথাখানা গোটাইয়া লইয়া ফুলী চলিয়া গিয়াছে আর সে ফিরিয়া আসিয়া বছিরের সঙ্গে দেখা করে নাই।

সেদিন বিকালে বছির কি একখানা বই খুলিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় ফুলী আসিয়া ঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইল। বই-এর মধ্যে বছির এমনই মশগুল, সে চাহিয়াও দেখিল না কে আসিয়াছে। বৃথাই ফুলী দুই হাতের কাঁচের চুড়িগুলি নাড়িল চাড়িল। পরনের আঁচলখানা মাথা হইতে খুলিয়া আবার যথাস্থানে বিন্যস্ত করিল। বছির ফিরিয়াও চাহিল না। তখন যেন নিরুপায় হইয়াই ফুলী ডাকিল, “বছিরবাই!”

বছির বই-এর মধ্যেই মুখ লইয়া বলিল, “ফুলী! তুমি মার সঙ্গে যায়া কথা কও। আমি এহন খুব দরকারি একখানা বই পড়ত্যাছি।”

ফুলীর ইচ্ছা করিতেছিল বলে, “বছিরবাই! তুমি এমন নিষ্ঠুর ঐলা ক্যান? এবার বাড়ি আইসা আমার সঙ্গে একটাও কথা কইলা না। কও ত আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করছি?” ভাবিতে ভাবিতে দুই চোখ পানিতে ভরিয়া আসে। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ

মুছিয়া ফুলী যেন মরিয়া হইয়াই বলিল, “বছিরবাই! চল তোমারে সঙ্গে কইরা বড়ুর কবরে যাই। তার কবরের উপর আমি যে কুলের গাছে সোনালী লতা দিছিলাম না? সমস্ত গাছ বাইয়া গ্যাছে সেই লতায়?”

বই-এর মধ্যে মুখ লুকাইয়া বছির উত্তর করিল, “নারে! আমার সময় নাই। তুই এখন যা। আমার একটা খুব জরুরী বই পড়তি ঐত্যাছে।”

ফুলী আবার বলিল, “মা তোমারে যাইবার কইছে। তুমি না ঢ্যাপের খই-এর মোয়া পছন্দ কর। তোমার জন্যি মা খাজুইর‍্যা মিঠাই দিয়া ঢ্যাপের মোয়া বাইন্দা রাখছে!”

বছির তেমনি বই-এর মধ্যে মুখ লইয়াই বলিল, “চাচীরে কইস, আমার সময় নাই। কাল-পরশু আমারে চইলা যাইতি অবি। আমার কত কাম পইড়া রইছে।”

বছিরের কথাগুলি যেন কঠিন ঢেলার মত ফুলীর হৃদয়ে আসিয়া আঘাতের পর আঘাত হানিল।

বহু কষ্টে কান্না থামাইয়া সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সামনের বনে যাইয়া প্রবেশ করিল। পাকা ডুমকুর খাইতে বছির খুব ভালবাসে। সেই ডুমকুর দিয়া একছড়া মালা গাথিয়া সে বছিরের জন্য আনিয়াছিল। তাহা সে ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া বনের মধ্যে ইতস্তত : ফেলিয়া দিল। আঁচলে বাধিয়া কয়েকটি পাকা পেয়ারা আনিয়াছিল। তাহা সে পা দিয়া চটকাইয়া ফেলিল।

আজ কত পরিপাটী করিয়া সে চুল বাধিয়া খোঁপায় একটি কুমড়ার ফুল খুঁজি। দিয়াছিল। তাহা সে খোঁপা হইতে খুলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে পাকা পুঁই দিয়া দুটি হাত রাঙা করিয়াছিল। এখন সেই হাতে চোখের পানি মুছিতে মুছিতে সে রঙ ধুইয়া গেল।

বার বার তার বালিকা-মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হইল!–কেন এমন হইল! কি করিয়াছে ফুলী যার জন্য তার এত আপনার বছিরভাই পাষাণ হইয়া গেল? কি অপরাধ করিয়াছে সে? কে তাহাকে এ কথার জবাব দিবে?

গ্রাম্য চাষী-মোড়লের ঘরের আদুরে মেয়েটি সে। ছোটকাল হইতেই অনাদর কাকে বলে জানে না। বছিরের এই অবহেলায় তার বালিকা-হৃদয়খানিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। তবু বছিরের কথা ভাবিতে কেন যেন লজ্জায় ফুলুর মুখোনি রাঙা হইয়া ওঠে। বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুভূতি জাগে। অলক্ষিতে সে যে বছিরকে ভালবাসিয়াছে এ কথা পোড়া মুখী নিজেও জানে না। তাহাদের পাড়ায় তারই সমবয়সিনী কত মেয়েকে সে দেখিয়াছে। বাপ মা যাহার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে, শাড়ী গহনা পরিয়া সে তাহারই ঘর করিতে গিয়াছে। ভালবাসা কাহাকে বলে তাহাদের গ্রামে কোন মেয়ে ইহা জানে না। কোন বিবাহিতা মেয়ের কাছেও সে ভালবাসার কথা শোনে নাই। এ-গায়ে ও-গায়ে কৃচিৎ দুএকটি মেয়ে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া অপরের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে সকলেই কুলটা বলিয়া গালি দিয়াছে। ভালবাসার কথা সে কোনদিন কাহারো মুখে শোনে নাই।

বছিরভাই তাহাকে অবহেলা করিয়াছে। তাহাতে তাহার কি আসে যায়? সেও আর বছিরভাইর নাম মুখে আনিবে না। কিন্তু এ কথা ভাবিতে কোথাকার সাত সাগরের কান্নায় তার বুক ভাসিয়া যায়। কি যেন তাহার সর্বনাশ হইয়াছে! কোথায় যেন তার কত বড় একটা ক্ষতি হইয়াছে! সে ক্ষতি হয়ত সারা জীবনেও আর পূরণ হইবে না! কিন্তু কিসের ক্ষতি হইয়াছে, কে সেই ক্ষতি করিয়াছে কিছুই সে বুঝে না। বন-হরিণীর মত বনের এ পথে সে পথে সে ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর বড়ুর কবরের পাশে আসিয়া কান্দিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই কবরের মাটির মতই সে মূক। তাহার বেদনার কথা পৃথিবীর কেহই কোনদিন জানিবে না। তাই এই কবরের মূক-মাটির উপর বসিয়া সে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু মূক-মাটি কথা কহে না। মাটির তলায় যে ঘুমাইয়া আছে সেও কথা কহে না।

বড়ু! তুই আর কত কাল ঘুমাইবি? তুই–শুধু তুই আমার কথা বুঝিতে পারিবি। মাটিতে মাথা ঘসিয়া ঘসিয়া ফুলী সমস্ত কপাল ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। এ মাটি কথা বলে না। তবু এই মাটির কবরের উপর বসিয়া কাদিতে তাহার ভাল লাগে। মাটি যেন তাহাকে চেনে। বড় শীতল এই মাটি। তার বুকে বুক মিশাইলে বুক জুড়াইতে চাহে।

“মাটি! তুই আমারে জায়গা দে। যেখানে বড়ু ঘুমাইয়া আছে তারই পাশে আমাকে স্থান দে। আমরা দুই বন্ধুতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বছিরভাইর স্বপ্ন দেখিব। হয়ত মাঝে মাঝে বছিরভাই এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে। আমার কথা মনে করিয়া আসিবে না। কিন্তু বড়ু! তোকে সে কোনদিন ভুলিবে না। তোর কথা মনে করিয়া সে যখন এখানে আসিয়া

দাঁড়াইবে, কবরের ঘুমে বসিয়া আমি তার চাঁদ মুখখানা দেখিতে পাইব। বড়–আমার পরানের সখি বড়–তুই আমারে সঙ্গে নে।”

.

৪১.

বছির এখনই লণ্ডনের পথে রওয়ানা হইবে! আজাহেরের উঠানে ভর্তী লোক। ভাসান চর হইতে আরজান ফকির আর তার স্ত্রী আসিয়াছে। আলীপুর হইতে রহিমুদ্দীন কারিকর আসিয়াছে। গরীবুল্লা মাতবর, মিঞাজান, তাহের, গ্রামের সকল লোক আসিয়া আজাহেরের উঠানখানা ভর্তী করিয়া ফেলিয়াছে। বছির সকলকে সালাম জানাইয়া বলিল, “আমি আইজ নিরুদ্দেশের পথে রওয়ানা ঐলাম। আপনারা দোয়া করবেন, ফিরা আইসা যেন আপনাগো খেদমত করতি পারি।”

গণশা আওগাইয়া আসিয়া বলিল, “ভাই-বছির! হেই কথা যিনি মনে থাহে। তুমি আইসা এমুন একটা স্কুল বানাইবা যেহানে মাষ্টারের মাইর থাকপি না।”

বছির বলিল, “গণেশভাই! তোমার কথা আমার মনে আছে। তুমি আমার পরথম গুরু। তুমি আমার মনে বড় হওয়ার আশা জাগাইয়া দিছিলা। আল্লায় যদি আমারে দ্যাশে ফিরাইয়া আনে, তোমার মনের মত একটা ইস্কুল আমি গইড়া তুলব।”

তারপর বছির আরজান ফকিরের পদধুলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ফকির সাহেব। তুমি ত আইজ আমারে কুনু কথা কইলা না?”

আরজান ফকির তাহাকে দোয়া করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "বাজানরে! মনের কথা কি মুহে কওন যায়? বুকের কথা বুকের মদ্দি ভইরা দিতি

অয়। এতদিন তোমারে আমার ঘরে রাইখা আমার যত কথা সারিন্দার সুরি সুরি তোমার বুকের মদ্দি ভইরা দিছি। সে কথার ফুল ফোটে–সে কথার ফল ধরে। সেই ফলের আশায়ই আমি বইসা থাকপ যতদিন তুমি ফিরা না আস।"

বছির বলিল, "বুঝতি পারলাম ফকিরসাব! এতদিন তোমার বাজনা আর গান শুইনা তোমার গায়ালী সব কিছুর উপর আমার মনের ভালবাসা জাগায়া দিছাও। আমি যদি শক্তিবান হয়া ফিরতি পারি, তখন এমন দিন ডাইকা আনব, যহন তোমার হাতের সারিন্দা আর কেউ ভাঙতি পারবি না। তোমার গায়ালী গান, নকসা যা কিছু গাওগেরামের বাল সেগুলাকে উপরে তুইলা ধরব।"

ফকির উত্তর করিল, "বাজান! গল্পে শুনছি অসুর কুলির এক ছেলে দেবতাগো দ্যাশে যায়া অমরত লয়া আইছিল। তেমনি তোমারে পাঠাইলাম সেই দূরদেশে। আমরা সব মইরা গেছি। সেইহানগুনা অমরত আইনা আমাগো সগলরে তুমি বাঁচাইবা। তুমি একা বড় ঐলে ত চলবি না বাজান! আমাগো সগলরে তোমার মত বড় বানাইতি অবি।"

গরীবুল্লা মাতবর বলিল, "বাবা বছির! তুমি যতদিন ফিরা না আইবা আমরা তোমার পথের দিগে চায়া থাকপ। আর মনে করব, তুমি ফিরা আইসা আমাগো সগল দুষ্ক দূর করবা। বাজানরে! আমরা বোবা। দুস্কের কথা কয়া বুঝাইতি পারি না। তাই আমাগো

জন্যি কেউ কান্দে না। তোমারে আমরা আমাগো কান্দার কান্দুইনা বানাবার চাই। এই গিরাম ঐল কাটার শয্যা। এই হানে আইসা তোমারে বেগুম রাইত কাটাইতি অবি। আমরা মরা। আমাগো বাঁচাইতি ঐলি তোমারে এহানে আইসা মরার আগে মরতি অবি। মান সম্মান ইজ্জত সব কিছু ছাইড়া আমাগো সাথে মাটির উপর আইসা বসতি অবি।”

সামনে ফকির-মা বসিয়াছিল। তাহার কাছে যাইয়া সালাম করিতে ফকির মার দুইটি চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল। বছির সকলকে দেখাইয়া বলিল, “এই আমার ফকির মা। পশ্চিমা যেমন ঠোঁটের আধার দিয়া বাচ্চাগো পালন করে তেমন কইরা নিজে না খায়া এই মা আমারে খাওয়াইছে।”

ফকির মা বলিল, “আমার গোপাল! আমার যাদুমণি! তুমি স্বর্গপুরী থইনা আমার ভাঙা ঘরে আইসা উদয় হৈছিলা। আজ মায়ের কোল ছাইড়া তুমি গোচারণ চইলা যাও। আমি পথের দিকে চায়া থাকপ কতক্ষণে আমার গোপাল ফিরা আসে।”

একে একে সকলেই বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বছিরের কেবলই ইচ্ছা করিতেছিল যাইবার আগে একবার ফুলুর রাঙা মুখোনি দেখিয়া যায়। সেই যে সেদিন ফুল চলিয়া গিয়াছে, অভিমানী মেয়ে আর ফিরিয়া আসে নাই। তাহার অবহেলা না জানি তাকে কতইনা আঘাত করিয়াছে। যাইবার আগে তাহাকে দুইটি মিষ্টি কথা বলিয়া গেলে হয় না? কাছে ডাকিয়া আগের মত বোনটি বলিয়া একটু আদর করিয়া গেলে চলে না? কিন্তু তা করিতে গেলে হয়ত তাহার বালিকা-মনে বছির যে আশঙ্কা করিতেছে, সেই ভালবাসার অঙ্কুর রোপণ করিয়া যাইতে হইবে। অভাগিনী ফুলুর সারাটি জীবন হয়ত তাহাতে ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বছির কি শুধু ইহাই ভাবিতেছিল? নিজের মনের দুর্বলতার কথা কি তাহার মনে পড়িতেছিল না? কলমী ফুলের মত লাল টুকটুকে মুখ ফুলীর! আবার যদি সে দেখে তার জীবনের সকল সঙ্কল্পের কথা সে ভুলিয়া যাইবে। না-না ইহা কখনো হইতে পারিবে না। কঠোর হইতে কঠোরতর তাহাকে হইতে হইবে।

কিন্তু এমন হইতে পারে না? তাহা দেশে আসিয়া ফুলুকে সঙ্গে করিয়া সে নতুন সংসার পাতিবে।....উঠানের উপর ফুল এ-কাজে ওকাজে ঘুরিবে; উঠান ভরিয়া কলমী ফুল ছড়াইয়া যাইবে। রান্নাঘরে পাটাপুতা লইয়া সে হলুদ বাটিবে। তাহার গায়ের রঙের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া পাটা ভরিয়া হলুদের রঙ ছড়াইবে। না–না–না। একি ভাবিতেছে। বছির? আজ সে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াইতেছে। তাহার জীবনের বড় হওয়ার ক্ষুধা এখনো মেটে নাই। এখনও তার অথই গাঙের তরী পাড়ের ঘাটে আসিয়া ভেড়ে নাই। এসব সুখের কথা তাহার ভাবিতে নাই। তবুও একবার যদি ফুলুর সঙ্গে দেখা হইত! সেই লাল নটে পাতার মত ডুগুডুগু মেয়েটিকে যদি আর একবার সে চোক্ষের দেখা দেখিয়া যাইতে পারিত; সেই স্বপ্ন চক্ষে পুরিয়া বছির তার ভবিষ্যতের অনিশ্চিত দিনগুলিকে রঙিন করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহা যে হইবার নয়।

যাইবার আগে বছির বড়ুর কবরের পাশে আসিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। ফুলু কবরের মাটিতে মাথা খুড়িয়া ফেঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

ধীরে ধীরে যাইয়া বছির ফুলুর হাত দুইখানা ধরিয়া তাহাকে উঠাইল। তারপর তাহার মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “ফুল! আমার সোনা বইন!

আমি জানি সেদিন তোমারে অবহেলা কইরা তোমার মনে আমি বড় ব্যথা দিছি। কিন্তুক একথা জাইন বইন। তোমার ভালর জন্যিই আমারে অমন করতি ঐছে। আমি দোয়া করি। তোমার জীবন যেন সুখের হয়। এই কথা মনে রাইখ, তোমারে যে দুস্ক, আমি দিয়া গেলাম তার চাইতে অনেক দুস্ক আমি আমার মনের মদ্দি ভইরা লয়া গেলাম।"

কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলু বলিল, "বছিরবাই! তোমার পায়ে পড়ি। আমার ভালর কথা তুমি আর কইও না। তুমি এহন যাও। আমারে মনের মত কইরা কানতি দাও। কবরে যে ঘুমায়া আছে সেই একজন ক্যাবল আমার কান্দন শুনতি পায়।"

এই বলিয়া ফুলী কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

অনেক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বছির সেখান হইতে চলিয়া গেল।

আহা! এই বনের হরিণী! ওকে কাঁদিতে দাও। বুকের বোবা কাহিনী যাহার কহিবার ভাষা নাই, সে যদি কাঁদিয়া কিছুটা সান্ত্বনা পায় তাহাকে কাঁদিতে দাও!

–সমাপ্ত–